

আমি চে গুয়েভারা

বেদুইন

॥ পরিবেশক ॥

আধুনিক ॥ ১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ সাল

দ্বিতীয় মুদ্রণ :
অগ্রহায়ণ ১৩৭৭ সাল

প্রকাশক :
দীপক দত্ত
ডি. জি. পাবলিশার্স
১১বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
বি. কে. সেনাপতি
অর্চনা প্রেস
১/১ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গণেশ বসু

দশ টাকা

"Our every action is a battle-cry against imperialism......Wherever death may surprise us, let it be welcome, provided that this, our battle-cry, may have reached some receptive ear and another hand may be extended to wield our weapons."

—Che

AMI CHE GUEVARA

Political assessment in Bengali

By BEDOWIN

Rupees Ten Only.

ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা ছিলেন কিউবা বিপ্লবে ফিদেল কাস্ত্রোর দক্ষিণহস্ত। ফিদেলের যে সাফল্য তার পেছনে ছিল চে-র অবদান সর্বাধিক। ফিদেল নিজেই স্বীকার করেছেন, তাঁর সাফল্যের যে গৌরব তার অধিকাংশই চে-র প্রাপ্য।

শ্রেণীহীন সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ব্রতে চে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। সমগ্র লাতিন আমেরিকার মার্কিন তাঁবেদার রাষ্ট্রসমূহে যে বর্ণ-বিদ্বেষ, দারিদ্রের প্রতি অত্যাচার ও শোষণ অব্যাহত রয়েছে, চে ছিল তার জীবন্ত প্রতিবাদ। কিউবায় তার সাফল্যের পর চে লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে ব্রতী হন। তিনি ইতিমধ্যে সমগ্র বিশ্ব-পরিক্রমা করে বিভিন্ন দেশে নির্যাতীত মানুষের কাছে সমাজতন্ত্রের বাণী পৌঁছে দিতে থাকেন। রাষ্ট্রসংঘে চে-র ঔদাত্ত ঘোষণা, শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চিরস্মরণীয়।

এই বীর বিপ্লবীকে বলিভিয়াতে জহ্লাদের হাতে প্রাণ দিতে হয়। সভ্য সমাজবিরুদ্ধ এই যে আচরণ তার পেছনে পশ্চিমী শক্তির সক্রিয় সহযোগিতা ছিল আর ছিল ক্ষমতালুব্ধ বলিভিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসের নিষ্ঠুর হঠকারিতা।

চে চিরকাল বিপ্লবীদের আদর্শ। ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, কর্মজীবনে, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায়, মনুষ্যধর্মে অবিচল এই মহান বীরের জীবন-কাহিনী এই গ্রন্থের উপজীব্য। সাধ্যমত বিভিন্ন সূত্র থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে চে-র কাহিনী পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। কতটা সফল হয়েছি এই দুরূহ কাজে তা পাঠকরাই বিবেচনা করবেন। গ্রন্থটি রচনাকালে প্রভূত পরিশ্রম করতে হয়েছে, তার ওপর কতকগুলো পারিবারিক বিপর্যয়ে কিছু

ভারসাম্যও হারাতে হয়েছিল। সেজন্য গল্পে ত্রুটি হয়তো কোথাও কোথাও থেকে গেছে। সে সব ত্রুটি ক্ষমার যোগ্য।

আমাদের দেশে বিপ্লবকে যারা সন্ত্রাসবাদী ও সমাজ-বিরোধীদের অসংযত অবৈজ্ঞানিক কর্মের অঙ্গ মনে করে, তাদের ভ্রান্ত ধারণা যাতে নিরসন হয় তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কোথায় আমাদের ভুল, কেন ভুল—এসব কূটতর্ক না করেও চে-র কর্মধারা থেকে আমরা যাতে শিক্ষা নিতে পারি তার জন্য যথেষ্ট ইঙ্গিতও রেখেছি।

যে বারিয়েনতোস প্রেসিডেন্ট পাজকে বিতাড়িত করেছিল জেনারেল ওভানদোর সহায়তায়, যে বারিয়েনতোস চে গুয়েভারা হত্যার নায়ক, তাকেও বলিভিয়ার গদী ছেড়ে পালাতে হয়েছে। আজ চে নেই, কিন্তু বারিয়েনতোস তার পাপের প্রতিদান পেয়েছে। চে ইতিহাসে নমস্য আর বারিয়েনতোস নিন্দার পাত্র।

বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে চে-র পরাজয় যেসব কারণে ঘটেছে সেই কারণগুলো বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশে যারা বিপ্লবে বিশ্বাসী তারা এই ভুল থেকে যেন দূরে থাকেন—এইটেই লেখকের নিবেদন।

এই গ্রন্থ প্রণয়নকালে বহু গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। সবগুলোই বিদেশী গ্রন্থ। যাদের লেখা এই সব গ্রন্থ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের চেয়ে স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে প্রকাশিত প্রামাণ্যগ্রন্থের অভাব। সেজন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। যাদের গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। কোথাও কোন ঘটনার বিরূপতা থাকলে পাঠকের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।

৩০। ১১। ৭০ —গ্রন্থকারস্য।

মৃত্যুর মাঝ দিয়ে যারা নবজীবনের উন্মেষ ঘটিয়েছে।

এই লেখকের ঃ

পথে প্রান্তরে (তৃতীয় মুদ্রণ)

হ্যানয় থেকে সায়গণ (তৃতীয় মুদ্রণ)

রাজনীতির নেপথ্যে

সাদা মানুষ কালো রক্ত

মন্ত্রীপতন (দ্বিতীয় মুদ্রণ)

নর্তকীর আত্মকথা

বিষুবরেখার দক্ষিণে। যেমন নদীনালা তেমনি শুকনো খট্‌খটে পাহাড়। কোথাও ঘনবনের নীলিমা, কোথাও যেন উগ্র প্রকৃতির অট্টহাসি। কোথাও সমতল, কোথাও অনুর্বর বন্ধ্যা ভূমি, কোথাও প্লাবন, কোথাও দুর্যোগ। ছোট এই দেশটার বিচিত্রগঠন। সেই পঞ্চদশ আর ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জলদস্যুরা আস্তানা করেছিল সমুদ্র-সৈকতে। ধীরে ধীরে পাশব শক্তি দিয়ে গৃহহারা করেছিল স্থানীয় লোকদের, ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়েছিল মহাদেশের মধ্যভূমিতে।

মধ্যভূমিতেই এই বিচিত্র দেশ। বিচিত্র অবস্থান। বিচিত্র সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা। গণতন্ত্রের নামে 'গণ' শোষণ।

পাহাড়ের বুক কেটে ছোট ছোট নদীগুলো নেমে এসেছে। বেশ খট্‌খটে নদীর বুক। হঠাৎ কোথাও নামল ঘোরতর বর্ষা। শুকনো নদীর বুক ফুলে ফেঁপে দু'কূল ভাসিয়ে দিল। অসতর্ক মানুষ-পশু বন্যার প্রচণ্ড বেগে ভেসে গেল অজানা স্থানে। বিশেষ করে নভেমবর থেকেই আকাশ যেন বিরাম নিতে চায় না বর্ষণ থেকে।

প্রকৃতির এই তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করে সবাই অধীর প্রতীক্ষা করে, আকাশে আবার কখন নীলিমা দেখবে। পথঘাট তৈরী হয়নি এমন কিছু, যাতে চলাচলের সুবিধা হয় অধিবাসীদের। সামান্য বর্ষায় পথ হয় কর্দমাক্ত, চলাচলের অনুপযুক্ত।

সাম্রাজ্যবাদী স্প্যানিশদের উত্তরপুরুষ অধিকাংশই। যারা সাম্রাজ্যবাদের প্রহরী তারা স্বাতন্ত্র্যবাদী হলেও দরিদ্র মানুষদের কথা যেন ভুলে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

শুকনো পাহাড়গুলোর মতই হাড় জিরজিরে দেশের সাধারণ অধিবাসীরা। ছোট ছোট শুকনো নদীতে যেমন প্লাবন নামে তেমনি প্লাবন আসে দুঃখের। দুমরে-মুচরে দেয় তাদের জীবনধারা,

কেমন অসহায় ভাব ফুটে ওঠে তাদের চেহারায়। একে অপরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, গোপনে অভিশাপ দেয় শাসককে, করাঘাত করে অদৃষ্টকে। কখনও কখনও ভজনালয়ে গিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে অশরীরী পরমাত্মার করুণা প্রার্থনা করে।

এমনি দুর্ভাগ্য নিয়ে লড়াই করছিল একটি চাষী পরিবার আরও অনেক পরিবারের মত। পরিবারের কর্তা কিন্তু আশাহীন নয়। সন্তান সন্ততিদের মানুষ করতে পারলে নিশ্চিত সুদিন আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে। ছেলেরা বিদ্যালয়ে যায়, পড়াশোনা করে। মানুষ হবে নিশ্চয়ই, মানুষ হলে তার দুর্গতির অবসানও ঘটবে।

মা বলতেন, তোর ওপরই আমার ভবিষ্যত।

বাবা বলতেন, তোকে বড় করতে পারলে আমার কর্তব্য শেষ।

কিশোর সন্তান বুঝত পিতামাতার বেদনা। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করত, ওদের অত আছে আমাদের নেই কেন?

কপাল। কপাল রে বাপধন। ঈশ্বর যাকে দেন তাকে হাতের মুঠো ভর্তি দেন, আর যাকে বিমুখ করেন, তার ভাগ্যে পোড়া রুটিও জোটে না।

কিশোর পুত্রের মনে প্রশ্ন, তা হলে কেন এই কম বেশী, কেন এই তারতম্য।

কর্মফল। ইহকালের পরকালের।

সকাল বেলায় খেতে বসে শুকনো পোড়ারুটি চিবুতে চিবুতে কিশোর পুত্র বলল, আজ স্যুপ নেই মা?

কোথায় পাব। জানিস তো, এবছর ফসল ভেসে গেছে বন্যায়। সামান্য কিছু যব পেয়েছি, তাই দিয়ে কোন রকমে পেট ভরাতে হচ্ছে, বেশি কিছু তো নেই। কাঁচা সবজী বলতে যে শাকপাতা তাও তো কিনতে হয়। পয়সা কোথায়!

কিশোর পুত্র মুখ তুলে দেখল। নীরবে খেয়ে বই হাতে করে বেরিয়ে গেল পাঠশালার পথে।

কোথায় যেন ছন্দ হারিয়ে গেছে জীবনের, সে কথা প্রথম ভাবতে শিখল সেইদিন। সেইদিনেই কিশোর মনে আঁচড় কাটল।

কৈশোরেই কেমন ভাবগম্ভীর তার চেহারা। হঠাৎ তাকিয়ে দেখলে মনে হবে, এমন সুন্দর চেহারার কিশোরের মনের কোণায় বয়োজ্যেষ্ঠের গাম্ভীর্য কি করে এল, কেনই বা এল। অনেকটা শঙ্কা নিয়ে কথা বলত তার চেয়েও যারা বয়সে বড়। বিচিত্র দেশের এক বিচিত্র কিশোর।

বয়স বাড়তেই পড়াশোনায় ইতি টেনে শহরের পথ ধরতে হল তাকে। সোজা পথে হেঁটে এসে হাজির হল রাজধানী লা-পাজে। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখতে থাকে শহরের জাঁকজমক। তরুণ কর্মপ্রার্থী ভাবতেও পারছিল না এত ঐশ্বর্য কোথা থেকে এসে সঞ্চিত হয়েছে শহরের বুকে! এত বড় বড় বাড়ি, এত সুন্দর করে সাজানো পার্ক, বাজার, এত দামী দামী গাড়ি, গাড়ির মালিকদের অপরূপ মূল্যবান পোষাক। কোথা থেকে এল এ সব!

সবই অভিনব ও সুন্দর মনে হয়েছে তার।

কিন্তু এই কি সব!

এই বিশাল শহরের চাকচিক্যের মাঝে তার স্থান কোথায়? কোথায় পাবে সে মাথা গুঁজবার মত একটু স্থান।

স্থান তাকে পেতেই হবে। কিন্তু কোথায়? ঐ বড় বড় বাড়ির মালিকরা তাকে আশ্রয় দেবে কি?

একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবল কিছুক্ষণ। দরজায় আঘাত করল কয়েকবার।

রুদ্রমূর্তিতে দরজা খুলে গৃহিণী বলল, দরজায় ধাক্কা দিচ্ছ কেন? কলিং বেল টিপতে পার না।

কলিং বেল, সে আবার কি! বিস্ময়ভরা তরুণের প্রশ্ন।

তুমি একটা গর্দভ। শহরে থাক, অথচ শহরের হালচাল জান না! গাঁয়ে গিয়ে ভেড়া চরাও, এখানে এসেছ কেন?

গাঁ থেকেই এসেছি মা ঠাকরুণ। শহরের আদব কায়দা মোটেই জানি না। আজই এসেছি।

সেটা তোমার বেশভূষা দেখেই বুঝেছি। তা আমার বাড়িতে কেন মরতে এসেছ?

একটু আশ্রয় খুঁজতে।

আমার বাড়িটা যে ধর্মশালা তা তোমাকে কে বলল। নিশ্চয় ঐ হতভাগা পিন্টো পাঠিয়েছে। বুড়োর ভীমরতি ধরেছে। কারও ভাল সহ্য করতে পারে না। আসুক কর্তা, আজ বুঝাপড়া করছি।

না মা ঠাকরুণ, কেউ বলেনি। আমি নিজেই এসেছি।

তা হতেই পারে না। ঐ বুড়ো পিন্টোর কাজ।

আমি বুড়ো পিন্টোকে জীবনে কখনও দেখিনি।

দেখিনি বললেই হল। শয়তান বুড়োটা যত ভিখিরীকে আমার দরজায় পাঠিয়ে দিয়ে মজা দেখে। আজ একটা বুঝাপড়া করতেই হবে। রোজ রোজ ভিখিরী তাড়াতে তাড়াতে হয়রান হয়ে পড়েছি।

ভিখিরী!

তা বই কি। তুমি কি বাছা রাজার ছেলে। আমাকে রাজত্ব দিতে এসেছ কি? ভিখিরীদের কত যে ভড়ং আছে তা আমি জানি। ঝাঁটা হাতে নিয়ে প্রত্যহ সকাল বিকাল আমাকে মেহনত করতে হয় ভিখিরী বিদায় করতে। আমি জানব না তো জানবে তুমি?

তরুণের সব বক্তব্য শেষ। বলার মত ভাষাও নেই, সাহসও নেই। ধীরে ধীরে রাস্তার দিকে পা বাড়াতেই গৃহিণী চিৎকার করে বলল, কেন এসেছ তা তো বললে না বাপু?

আজ্ঞে।

আজ্ঞে কি?

একটু আশ্রয় চাইতে এসেছিলাম।

তা দিতে পারব না। শহরে কত চোর গুণ্ডা বদমায়েস ঘুরছে,

অজানা অচেনা লোককে আশ্রয় দিতে পারব না। আর কিছু বলার আছে ?

আজ্ঞে না। বলেই তরুণ ত্বরিত পদে রাস্তায় নেমে পড়ল।

গৃহিণী তার দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বলতে লাগল, বাবুর রাগ আছে ষোল আনা। ভিখিরীর রাগ, হাসি পায়। খেতে না পেলে কি হবে, রাগের বহর দেখছি কম নয়। বাঁচা গেল।

দরাম করে দরজা বন্ধ করে দিল গৃহিণী।

তরুণ একাই চলছে। ভাবছে, এই যে ইট-পাথর-কাঠ দিয়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে শহরের মানুষ, এর কারণ কি ? শহরের কদর্যতাকে ঢেকে রাখতেই বোধহয় এত অপ্রাকৃত সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল শহরবাসীর। আরও কদর্যতা নিশ্চয়ই আছে শহরের অলিতে-গলিতে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে। অপেক্ষা করতে হবে, আরও দেখতে হবে, কিন্তু তার আগে প্রয়োজন একটু আশ্রয়। রাতের বেলায় মাথা গোঁজবার স্থান চাই।

সারিবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তার কিনারায় গাড়োয়ানরা বেশ মনের মত আস্তানা করেছে। ভাড়ার গাড়ি। শহরের বাইরে যেতে ছোট ছোট ট্রিপ দেয়। যে সব রাস্তায় মোটর চলে না সে সব রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি হল সবচেয়ে সুবিধাজনক যান। পথের দুর্গমতা বাঁচিয়ে রেখেছে আদি কালের এই অশ্বযান। বাল্যকাল থেকেই ঘোড়া ও তার গাড়ির সঙ্গে পরিচয় আছে। তাদের গ্রামের পিকোখুড়োর একটা ঘোড়া ছিল, আর নড়বড়ে একটা গাড়িও ছিল। পিকোখুড়ো চাষের পর ঐ গাড়ি বোঝাই করে যবের শীষ নিয়ে আসত মাঠ থেকে। তরুণ তার বাল্যকালে চুপি চুপি পিকোখুড়োর সেই গাড়ির পেছন পেছন ছুটত, কখনও কখনও চেপেও বসত পিকোখুড়োর হুকুম নিয়ে। পিকোখুড়োর গাড়োয়ান এলির সঙ্গেও খুব ভাব ছিল তার।

এলির বয়স হয়েছে। কাজ না থাকলে রোদে পিঠ দিয়ে চুরুট

টানত। তাকে দেখলেই সেদিনের সেই শিশু গিয়ে দাঁড়াত তার কাছে। এলি তাকে দেখলেই চুরুট টানা বন্ধ করে বলত, কি গো খোকা, কোথায় যাচ্ছ, পাঠশালায় ?

শিশু বলত, না খুড়ো, ঘোড়া দেখতে এসেছি।

ঘোড়া কি দেখার মত জিনিস ? ও তো সব সময় দেখতে পাও। শহরে গেলে ঘোড়া দেখতে দেখতে চোখ পচে যাবে।

শহরে অনেক ঘোড়া, তাই বুঝি খুড়ো !

হাঁরে হাঁ, তাগড়া ইয়া বড় বড় ঘোড়া। যেমন ছুটতে পারে, তেমনি তাদের কদর। আমাদের দেশের পাহাড়ে পাহাড়ে যাওয়া আসা করতে ঘোড়াই হল সুবিধা। তাই ঘোড়ার কদর খুব বেশি। তুমি যখন বড় হবে, তখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যেও।

আমাদের তো ঘোড়া নেই।

বড় হলে চাকরি করবে, পয়সা জমাবে, তাই দিয়ে ঘোড়া কিনবে, কেমন ?

শিশু খুশীতে মাথা নাড়তে নাড়তে বুড়ো গাড়োয়ান এলির পাশে বসে বলত, তুমি চুরুট খাও কেন খুড়ো ?

কি খাব ?

প্রশ্নটা শুনে শিশু যেন বোকা হয়ে গেল। তবুও জোর করে বলত, আমার মত রুটি-সুপ সবজী খাবে।

তাও তো খাই।

তা হলে এটা খাও কেন ?

গরীব মানুষের পেট ভড়াতে হলে অনেক কিছু খেতে হয় খোকা। ভালমন্দ না খেলে বাঁচব কি করে ?

ইস্। আমরা বুঝি বেঁচে নেই। আচ্ছা খুড়ো, তুমি সেদিন ভাঁড়ে করে কি যেন খাচ্ছিলে, টক্‌টক্ গন্ধ ?

ওসব কথা জানতে নেই খোকা। তোর খুড়িমা মরবার সময় ওসব কথা বলতে নিষেধ করে গেছে। যা এবার, বাড়ি যা।

কাল যখন খামার থেকে মাঠে যাব তখন আসিস, তোকে গাড়িতে চড়াব।

কি মজা, কি মজা। ঠিক চড়াবে?

ঠিক, আসিস কিন্তু।

এলি চুরুটে জোরে একটা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল। শিশু ততক্ষণে লাফাতে লাফাতে ছুটল বাড়ির দিকে। এই সুসংবাদটা তার মাকে জানাতে।

বাল্যের সেই শিশু তরুণ বয়সে শহরে এসে সারিবদ্ধ ঘোড়ার গাড়ি দেখে উৎফুল্ল হতে পারল না। মনে মনে খুঁজতে থাকে বুড়ো এলির মত একজন গাড়োয়ানকে। মনে হল, এলি যদি থাকত আজ তা হলে কত না ভাল হত। এই তো কয়েক বছর আগে এলি দেহরক্ষা করেছে। তার প্রভু পিকোখুড়ো তখনও জীবিত। এলি মারা যেতেই চার্চের পুরুতকে ডেকে এনে কি সব বিড়বিড় করে শোনাল সবাইকে। এলির কানের কাছে মুখ দিয়ে কি সব বলল। প্রাণহীন দেহটা সত্যিই যে কিছুই শোনেনি, সবাই তা জেনেও কেমন মন্তব্য করল, এইবার এলির আত্মা মুক্ত হবে।

এলির নিজস্ব কিছু ছিল না। একটা টিনের থালায় সে খেত, আর একটা ভাঁড়ে দেশী বিয়ার রাখত পিপাসা মেটাতে। যে ঘরটায় এলি শুতো, সেটার কোন জানালা ছিল না। ছাদের নীচে কটা ফোকর ছিল, তা দিয়ে আলো বাতাস যা কিছু আসত। তার মৃত্যুর পর ঘর ঝাঁট দিয়ে পাওয়া গেল এক গোছা কাঁচা তামাক পাতা আর অনেকগুলো পোড়া চুরুটের টুকরো।

এলিকে যখন কবরে শোয়ানো হল, সেই কিশোর চাষার ছেলেটা তাকিয়ে দেখছিল শীর্ণ মুখখানা। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে, কাঁচাপাকা দাড়িতে মুখ ভর্তি, মাথায় একরাশ উসকো খুসকো চুল, হাত দুটো শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে, মেদ বলতে দেহে কিছুই নেই। মোটা মোটা শিরা-উপশিরাগুলো বিদ্রোহ

করে চামড়া ফুটে যেন বের হতে চাইছে। কি ভয়ঙ্কর কষ্টজনক সে দৃশ্য।

কবরে শুইয়ে দেবার পর মাটি চাপা দেওয়া হল। পিকোখুড়োর খামার বাড়ির পেছনে বেওয়ারিশ পাথুরে টিলার একাংশ খুঁড়ে এলিকে সমাধিস্থ করে শববাহীরা ফিরে গেল। কাউকে দেখতে পেল না এক ফোঁটা অশ্রুপাত করতে। মানুষটা একা নিঃশব্দে যেমন এসেছিল এই পৃথিবীতে, তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল। না অশ্রুপাত, না আপশোষ। সারা জীবনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল এলি। তার ঘুম বোধহয় ভেঙে যাবে এই আশঙ্কায় আর্তনাদ করেনি কেউ-ই। এলি রয়ে গেল অজ্ঞাত। মানুষ ভুলে গেল তাকে।

সেই এলির কথা মনে হতেই বুকের ভেতর যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা অনুভব করল তরুণ। গাড়োয়ানদের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিল তাদের কাজকর্ম। ঠিক এলির মত একজনকেও খুঁজে পেল না। এলির মত সরলতা মাখানো মুখ নেই কারও।

কি চাই হে ছোকরা? জিজ্ঞেস করল মাঝবয়েসী একটা গাড়োয়ান।

আরেক জন জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে, এদিকে এস? আমার ঘোড়া জেটের মত ছুটবে।

কোথাও যাব না। মৃদুস্বরে উত্তর দিল তরুণ।

যাবে না! তা হলে কি খুঁজছ?

এলি। এলিকে চেন তোমরা?

মাথা নাড়তে নাড়তে একজন বলল, উঁহু। এলি নামে কোন কোচম্যান নেই এই আড্ডায়।

এখনে নেই তা জানি। সে তো মরে গেছে।

মরা মানুষকে খুঁজতে এসেছে! হি-হি করে হাসল একজন। আরেক জনকে ডেকে বলল, ছোকরা ভারী রসিক। মরা এলিকে খুঁজতে এসেছে। যাও ঐ চার্চের মাঠে। দেখবে অনেক এলি

শুয়ে আছে। খুঁজে পেতে মনের মত একটা এলিকে ডেকে তুলে নিও।

আরেক জন হাসতে হাসতে বলল, মেয়ে না পুরুষ ?

তরুণের বাহ্যজ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে যাবার অবস্থা। তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে যেন বাঁচে। মুখ ফিরিয়ে উল্টো পথ ধরল। কানে ভেসে আসতে থাকে গাড়োয়ানদের হাসি।

বার বার এলির কথা মনে পড়তে থাকে। এলি কেমন শান্ত ভদ্র ছিল, কেমন মিষ্টি তার কথা, আর শহুরে গাড়োয়ানগুলো কেমন যেন অভদ্র। এমন লজ্জায় তাকে কখনও পড়তে হয়নি।

বেলা যে গড়িয়ে এল।

আশ্রয় তো চাই।

শহরে আশ্রয়ের অভাব কি, যদি পকেটে পয়সা থাকে। হোটেলে তো অনেক খাবার আছে, পানীয় আছে, রাতের আশ্রয়ও আছে, কিন্তু তার জন্য কতটা আছে তা জানে না সে। কারণ পকেটে যে কয়েকটা গোনাগুনতি পয়সা তা দরকার হবে কাজ না পাওয়া অবধি পেট ভর্তি করতে।

সদর রাস্তা ছেড়ে গলি পথ ধরল।

নর্দমা ভর্তি ময়লা। গন্ধে বমি হবার মতন অবস্থা। সদর রাস্তায় বিরাট বিরাট প্রাসাদের পেছনে ঢাকা পড়ে রয়েছে এই সব স্লাম্। এখানে যারা বাস করছে তাদের চেহারা, বেশভূষা যেন আলাদা। তাদের সঙ্গে সেই বড় বাড়ির গৃহিনীর আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবাক হয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠতেই হুঁস ফিরে পেল। খেয়াল হল কোথায় এসেছে ঠিক নেই। তখন খুঁজতে লাগল কোন খাবারের দোকান। রাতের খাবার হাঙ্গামাটা মেটাতে হবে বলেই যত গরজ।

তারই মত পোষাক-পরিচ্ছদধারী কতকগুলো লোক ভীড়

করেছে একটা হোটেলের সামনে। নোংরা লম্বা উঁচু বেঞ্চের সামনে বসবার বেঞ্চ পাতা। তাতে বসবার জায়গা নেই, তাই ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে খদ্দেররা। যারা খেতে বসেছে তাদের সামনে এনামেল করা কাঁধ উঁচু রং চটা থালায় ঘন জল ঢেলে দিল একবাটি করে। দু হাতে থালা ধরে চোঁ-চোঁ করে চুমুক দিয়ে খেতে থাকে খদ্দেররা।

খেতে খেতে একজন বলল, ওহে ক্যাটার্ড, আজকের স্যুপটা তেমন ভাল হয়নি।

পরিবেশক ক্যাটার্ড বলল, হাতের পাঁচটা আঙ্গুল কি সমান হয় হে মুরুব্বি। রুটি দেব কটা তাই বল।

কিসের রুটি আছে ?

যা চাও। যবের আছে, মকাইয়ের আছে, মাইলোর আছে। কোনটা চাই।

আজ মকাইয়ের দাও। অনেকদিন গমের রুটি খাবার ইচ্ছে। যা দাম নিচ্ছো আজকাল, ভরসা করে চাইতেও পারি না। দাও দাও মকাইয়ের রুটি।

আরেকজন বলল, আরেক পট্ স্যুপ্ আর মাইলোর রুটি চার পিস দিও। স্যুপে আজকাল লার্ড (শুকরের চর্বি) দেওয়া বন্ধ করেছ দেখছি।

পরিবেশক ক্যাটার্ড বলল, কি যে বলছ ! তাহলে স্যুপ অমন সুন্দর খেতে হয় কখনও।

হয় হে হয়। আজকাল পেট্রোল থেকে নাকি চর্বি তৈরী হচ্ছে। তাই বোধহয় দিচ্ছ।

তরুণও ক্ষুধার্ত। সে দেখছিল, শুনছিল, সুযোগ খুঁজছিল, কত তাড়াতাড়ি একটা জায়গা খালি হলে সে বসতে পাবে।

একদল জায়গা ছেড়ে উঠতেই আরেকদল ঠেলাঠেলি করে বসতে গেল। তার সঙ্গে তরুণটিও জায়গা করে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল

থালা পেতে। নোংরা টেবিলের নোংরা পরিষ্কার না করেই তার ওপরে রাখল এনামেল করা থালা। আবার বালতি বোঝাই স্যুপ নিয়ে হাজির হল পরিবেশক। এক পট্ করে স্যুপ দিয়ে জানতে চাইল কিসের রুটি দরকার।

তরুণ বলল, সবজী কিছু আছে পরিবেশক মশায় ?

কি সবজী চাই ?

যে কোন স্যালাড।

আচ্ছা।

স্যুপে চুমুক দিয়ে তার পেটের নাড়ীভূঁড়ি যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। তার মনে হল, ঘোড়ার পচা মাংস আর পেঁয়াজ নুন দিয়ে সেদ্ধ করে কিছু বিন দেওয়া হয়েছে তাতে। লার্ড-এর বদলে এমন কিছু চর্বি দেওয়া হয়েছে যার গন্ধে বমি ঠেলে ওঠে। তার অসুবিধা হলেও সঙ্গী ভোজনকারীরা বেশ পরিতোষ সহকারে কালো কালো মকাই অথবা মাইলোর রুটি স্যুপে ভিজিয়ে খাচ্ছিল। এতক্ষণে তার খেয়াল হল, এই সঙ্গী ভোজনকারীরা কারা। ভাল করে তাকিয়ে দেখে এবার স্পষ্ট বুঝতে পারল, এরা শহরের মুটে মজুর। সারাদিন মেহনত করে রাতের খাবার খেতে এসেছে। অতি সস্তার হোটেল, তাই ভিড় বেশি। এদের রুচি অরুচি না থাকাই স্বাভাবিক। গ্রামের মত টাটকা শাকসবজী মাছ মাংস শহরে পাওয়া গেলেও ওরা তা সংগ্রহ করতে পারে না। হোটেলওয়ালাও ওদের মুরোদ জানে, তাই বাজারের নিকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করে কম মূল্যে। তাই দিয়ে স্যুপ তৈরী করে। মকাই মাইলোর মূল্যও কম। বিশেষ করে ঘোড়ার খাদ্য এগুলো। ঘোড়ার খাবার উদ্বৃত্ত হয় বলেই মানুষের জন্য তা নিয়ে আসে হোটেলওয়ালারা। কম মূল্যে জীবনধারণের এর চেয়ে ভাল উপকরণ আর কোথায় পাবে।

কোন রকম খাওয়া শেষ করে হোটেলওয়ালাকে মূল্য বুঝিয়ে দিয়ে তরুণ বের হল পথে। তখন রাত হয়েছে। রাস্তাগুলো

আলোয় ঝলমল করছে। তাকে খুঁজতে হবে রাতের আশ্রয়। সব চেয়ে সুবিধা মনে হল এই লোকগুলোর পিছু পিছু যাওয়া। ওদের আস্তানার কাছাকাছি কোথাও শুয়ে থাকার ব্যবস্থা করা।

প্রথমে যে দলটার পেছন পেছন চলছিল, তারা প্রবেশ করল একটা মদের দোকানে। কতক্ষণে যে তারা বের হবে তার স্থিরতা নেই। সেজন্য আরেকটা দলের পিছু নিতে হল। স্লামের একটা নোংরা এলাকায় একখানা ঘরের দরজা খুলে প্রবেশ করল ক'জন, দাঁড়িয়ে রইল বাকি সবাই। ঘর খুলে একটা করে ছেঁড়া চট হাতে করে সবাই বেরিয়ে এসে রাস্তার ওপর বিছিয়ে দিল। তার ওপর বসে গান করতে করতে তাতেই শুয়ে পড়ল। তরুণও তার সঙ্গে যে ছেঁড়া চাদরটা ছিল তা বিছিয়ে নিল কিছুটা দূরে। সেও শুয়ে পড়ল। তাই তো! আশ্রয়! এই তো ভাল আশ্রয়। খোলা আকাশের তলায় এমন সুন্দর আশ্রয় থাকতে সে কেন গেল লোকের দরজায় আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। পাশের এই মানুষগুলোকে সে চেনে না, জানেও না। অথচ তাদের সঙ্গে কেমন আত্মিক সম্পর্ক আজ সে অনুভব করছিল।

রাত কাটছে জেগে জেগে। পাশের মানুষগুলোকে আরও কাছে পেতে কেমন যেন আগ্রহ। ওরা কি তার মতই শহরে এসেছিল কর্মের সন্ধানে। কর্মলাভ ঘটেছে নিশ্চয়ই। ওকি ওরা দুজন আস্তে আস্তে জায়গা ছেড়ে উঠল কেন? কেন হামাগুড়ি দেবার মত করে ওরা গলির দিকে এগোচ্ছে? মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

আরে, এ আবার কে? এও যে উল্টো দিকের গলির দিকে এগোচ্ছে।

লোকটা থামল কেন? কার সঙ্গে কথা বলছে? মেয়ে মানুষের গলা! মাথা উঁচু করে তাকিয়ে দেখল। হোটেলের সামনে যে মেয়েটা থালা হাতে করে ভিক্ষে করছিল, এতো সেই মেয়েটা। দুজনে কি যেন কথা বলাবলি করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

সব চুপচাপ।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল লোকটা। এসে চুপ করে শুয়ে পড়ল নিজের জায়গায়। প্রথম যে তুজন গেল তারা এখন তো এল না।

কি যেন একটা হট্টগোল শোনা গেল। লোক তুটো ছুটতে ছুটতে এসে শুয়ে পড়ল নিজেদের জায়গায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল লোক 'চোর চোর' চিৎকার করতে করতে এগিয়ে আসতেই সবাই ধরমর করে উঠে বসল। আগের লোক তুটোও চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল।

কোথায় চোর? চোর কোথায়?

এই দিক দিয়ে পালিয়েছে।

কোন দিকে?

হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল।

সবাই ছুটল সেদিকে। যারা সবেমাত্র ছুটে এসে শুয়েছিল তারাও ছুটল চোর ধরতে। নিস্ফলভাবেই ফিরে এল সবাই। গৃহস্থরাও ফিরে গেল নিজের নিজের ঘরে। যে যার মত শুয়ে পড়ল বিছানায়।

সেই লোক তুটো তখনও ঘুমোয়নি।

একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, খুব বাঁচা গেছে। শালারা বন্দুক আনতে না গেলে ঠিকই ধরা পড়তাম। রাস্তায় বাঁক ছিল ভাগ্যি, নইলে গুলী করত।

তোর বোকামীর জন্য। পেলাম না কিছু, শুধুশুধু হয়রানিতে একটা রাত নষ্ট হল। পকেট যে খালি তা খেয়াল আছে কি? কাল কি খাবি?

বাজার খুললে ম্যানেজ হয়ে যাবে। পেট যখন আছে তা ভর্তি করতেই হবে।

ব্যস্। তারপর চুপচাপ।

আরেক জন শুনছিল তাদের কথা। সেই লোকটা। ওদের

কথা শেষ হতেই সেই লোকটা বলল, তোদের না সকালেই বলেছিলাম, ওখানে গিয়ে কাজ নেই পিটার। না শুনলে অমন ধারাই হয়। তার চেয়ে ছুঁড়িটা এসেছিল।

পিটার ফিসফিস করে বলল, ছুঁড়ি? ছোঃ। একটা বুড়ী।

তোর মায়ের বয়েসী মোটেই নয়। কত আর হবে, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ।

আমার মায়ের বয়স হবে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। তা তুই তো গিয়েছিলি?

তা বলতে। তোরা চলে যেতেই আমি আর থাকতে পারলাম না। ছুঁড়িটাও কেশে ইসারা দিল। সুর সুর করে আমিও এগিয়ে গেলাম।

যাক কাল দেখা যাবে। কত নিলে? দশ সেন্ট। দামটা বড় কম। দশ সেন্টে ওর পেট ভরবে কেন?

সে ও নিজে বুঝবে। আমার যা মুরোদ তাই দিয়েছি।

আবার চুপচাপ।

রাত শেষ হল। পূবের আকাশে আলো দেখা দিল। যারা ঘুমিয়ে ছিল তাদের ঘুম ভাঙার লক্ষণ দেখা গেল। যারা জেগে ছিল তারা উঠে বসল। ব্যস্ততা দেখা দিল সবার মাঝে। সবাই ছুটল কাজের সন্ধানে। দিন মজুরের কাজ। কেউ দক্ষ, কেউ অদক্ষ, কিন্তু কারও কোন নির্দিষ্ট কাজ নেই। কাজ খুঁজতে হয় নিত্য। যেদিন কাজ থাকে না, সেদিন অর্ধাহার অনাহারকে সাথী করে দিন গুজরান করতে হয়।

একটা রাতের ব্যবধানে গ্রামের সেই সরল তরুণটি অনেক কিছু যেন জানতে পেরেছে।

আজ তাকেও একটা কাজ খুঁজতে হবে। স্থায়ী না হলেও অস্থায়ী কাজ চাই শুধু পেট ভর্তির রসদ সংগ্রহ করতে। গ্রামের আর শহরের পার্থক্য চোখের সামনে ফুটে উঠছে বার বার। গ্রামে

কাজ নেই, শহরে মাঝে মাঝে কাজ পাওয়া যায়, এই হল একটা মস্ত বড় পার্থক্য। ঐ লোকদের পিছু ছাড়বে না। ওদের পিছু পিছু গেলে দৈহিক মেহনতের কোন কাজ নিশ্চয়ই সে পাবে।

দ্বিধা রয়েছে মনে।

দু'জন চোর আর একজন লম্পট রয়েছে দলে। কিন্তু আজ সকালের আচার আচরণ থেকে মনেই হল না গত রাতে দুজন চুরি করতে গিয়েছিল আর একজন গিয়েছিল নারী সঙ্গলাভে। সবাই জোয়ান। সবাই কাজের নেশায় ছুটছে, কাজ পাওয়াটা তাদের ভাগ্য। এদের সঙ্গে মিশে গেল তরুণটি।

সারাদিন ঘুরে ফিরে পঁচিশ সেণ্ট উপার্জনও হয়েছিল। আর হয়েছিল তাদের সঙ্গে কিছু পরিচয়। সবাই সে দেশের বাসিন্দা নয়। কেউ এসেছে পেরু থেকে, কেউ এসেছে ভেনিজুয়েলা থেকে, কেউ এসেছে প্যারাগুয়ে থেকে, কেউ ল্যাটিন আমেরিকার অন্য দেশ থেকে। এ যেন বিশ্বমানবের সমাবেশ।

তোমাদের দেশে কাজ নেই?

কাজ আছে, তবে আমাদের জন্য কাজ নেই। নইলে কেউ ঘর ছেড়ে বাইরে আসে।

তা ঠিক। কিন্তু এখানেও তো পেট ভর্তি খেতে পাচ্ছ না রোজ।

যা পাই তাতেই খুশী। দেশে যে একেবারে পেতাম না। এখানে খাবার সস্তা। সমুদ্র নেই, দেশের খাবার বাইরে চালান যায় না। তাই এ দেশের লোক দু এক মুঠো খেতে পায় মাঝে মাঝে।

তরুণটি শুধু অবাক হয়ে শুনছিল তাদের কথা। অবশেষে প্রশ্ন করল, যদি এ দেশে থাকতে না দেয় তা হলে কি করবে?

তুমি একটা আস্ত পাগল। থাকতে না দিলে কোথায় পাঠাবে? আমাদের দেশে? ভাল কথা। কিন্তু পথের কি অভাব আছে, আবার যে কোন ভাবে এসে হাজির হব লা-পাজে। আবার রুজি রোজগারের ধান্দায় ঘুরব এই শহরের পথে পথে।

চমৎকার !

তোমার বাড়ি কোথায় ?

এই দেশেই।

হিংসা হচ্ছে।

মোটেই না। কেউ যদি তুটো খেতে পায় তাতে হিংসা বোধ করে যারা, তারা মানুষ নয়, অমানুষ। তাদের জন্য আমাদের প্রচুর মমতা। কিন্তু আমি নিজেই তো খেতে পাই না। লেখাপড়াও তো কিছু শিখেছি, কিন্তু কাজ কি করে সংগ্রহ করব তাও জানি না। এসেছি কাজের খোঁজে।

হেঁ, তুমি লেখাপড়া জান? আমাদের মত কোন রকমে নাম লিখতে শেখনি তো? বেশ, এক কাজ কর। কাল সোজা সদর রাস্তা ধরে চলে গিয়ে দেখতে পাবে মস্ত বড় একটা জেনারেল প্রভিশনের দোকান। দোকানের সামনে যে গলি তাতে একটা অফিস আছে। আমাদের যখন কিছুতেই কাজ জোটে না তখন ওখানে যাই কাজের চেষ্টায়। তুমিও যেতে পার।

ওটা কি কাজ দেবার অফিস ?

পাগল। কাজ কেউ কি দেয়। কাজ আদায় করতে হয়। আর কাজ আদায় করতে ওরা জানে বলেই আমাদের মত হতভাগার দল ওখানে যায়। ওরা কাজ না দিলেও পথ বাৎলে দেয়।

পিটারকে তুমি চেন ?

কোন্ পিটার? চোর পিটার, না মিস্ত্রি পিটার ?

তাতো জানি না। কাল রাতে বোধহয় চুরি করতেই গিয়েছিল। লম্বা, মুখটা চ্যাপ্টা, কালো চুল।

চিনি। তার কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?

পিটার বলছিল তার হাতে কাজ আছে।

হাসতে হাসতে নতুন পরিচিত লোকটি বলল, পিটারকে আমার কথা বলবে। বলবে গন্‌জালেস কাজ দিতে চেয়েছে। তা হলে

আর এগোবে না। আমার হাতের কয়েক ঘা খেয়ে বেশ সিধে ছিল এতকাল। গরীব মানুষ পেলেই তাদের দলে টেনে চুরি করতে শেখায়। ভাগ নেয় চুরির। বেচারা কিরো আর শ্যান্টু এখনও জেলে পচছে ঐ শালা পিটারের জন্য। মেহনত কর, দুটো খাওয়া জুটবেই। তা নয়, চুরি করে খেতে হবে। কেন? আর সবাইকে চোর তৈরী করতে হবে। ভাল মজা। দিলাম একবার লম্বা ধোলাই। সেই থেকে সামলে চলছিল। আবার শালা নিজের রূপ ধরেছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

না না, গোলমালে দরকার নেই। আমি গাঁয়ের মানুষ গাঁয়েই ফিরে যাব গন্‌জালেস। তোমাদের এই শহরের মানুষগুলোকে বড়ই ভয় করছে।

একগাল হেসে গন্‌জালেস বলল, ভয় পেলেই ভয়। গ্রামেই থাক আর শহরেই থাক, দুটো জিনিস চাই। একটা হোল পেটের রুটি। এটা একদিন না হলেই নয়। আরেকটা হল মেয়েমানুষ— তাও দুদিন সবুর করতে পারে। প্রথমটা যখন চাই তখন আমরা গরীব গুবরো মানুষ, আমাদের কাছে শহর গ্রাম দু-ই সমান। ভয় পেও না ভাই। সাবধানে চলবে, দেখবে সব সহ্য হয়ে গেছে।

আমার যে রাতের বেলায় মাথা গোঁজার মত জায়গাও নেই। কাল রাতে রাস্তায় শুয়েছিলাম। আকাশকে তো বিশ্বাস নেই। কখন বৃষ্টি আসে তারই ঠিক কি। তারপর চোর বদমাসদের সঙ্গে রাত কাটালে হয়ত কোন সময় পুলিশ আমাকেও টানতে টানতে নিয়ে যাবে।

গন্‌জালেস কিছুক্ষণ ভেবে বলল, আচ্ছা, তার একটা ব্যবস্থা হবে। আমি তোমাকে জায়গা করে দেব। কিন্তু ভাড়া দিতে হবে।

কত?

তা সপ্তাহে দশ থেকে পনেরো সেন্ট। দিতেই হবে যদি থাকতে চাও। এর চেয়ে কম ভাড়ায় থাকতে চাও তা হলে ভাগে ভাড়া

নিতে হবে। দু তিন জন এক সঙ্গে থাকতে পারলে ভাড়াটা কম পড়বে। তবে যাদের সঙ্গে থাকবে, তারা যদি ভাল মানুষ না হয় তা হলেই বিপদ। তার চেয়ে রাস্তায় শোয়া অনেক ভাল। কেন ভাড়া দিতে পারবে না? জোয়ান ছেলে, মেহনত করলে রোজই তোমার পঞ্চাশ ষাট সেণ্ট উপায় হবেই। দেখি, কাজ যদি পাই তাও বলব।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল গন্‌জালেসের সহযোগিতা পেয়ে। ধন্যবাদ জানাল তাকে।

গন্‌জালেসের সঙ্গে একদিন তরুণটি গেল সেই দপ্তরে। দপ্তরের দরজায় বড় ভীড়। কর্মপ্রার্থীর দল ভীড় করেছে। লাইন দিয়ে দাঁড়ালো দুজনেই।

সময় এগিয়ে চলেছে।

সূর্য মাথার ওপর হেলে পড়তেই খেয়াল হল, দুজনের পেটে তখনও কিছু পড়েনি। কাজ পাবার আশায় তবুও দাঁড়িয়ে থাকতে হল।

অবশেষে দেখা হল কর্মকর্তাদের সঙ্গে।

খনিতে যেতে পারবে? প্রথম প্রশ্ন করল কর্মকর্তাদের একজন।

গন্‌জালেস বলল, কতদূর?

সে অনেক দূর।

এই শহরে কাজ পেতে চাই।

বাহিরে যেতে এত আপত্তি কেন? এই উঁচু পাহাড়ী শহরে লোকের দম বন্ধ হবার উপক্রম হয়, আর তোমরা কিনা এখানেই থাকতে চাও। তার চেয়ে খনি অঞ্চলে যেতে কি আপত্তি? সেখানে সুখেই থাকবে। থাকবার বাড়ি পাবে, মজুরী পাবে। তার চেয়ে এখানে কি বেশি সুখ?

আমরা কাজ জানি না।

সবাই কি কাজ জানে। শিখে নিতে হবে। রাজি।

কাল আসব মশায়। ভাবতে হবে।

বেশ। আচ্ছা যাও।

দুজনেই বেরিয়ে এল কর্মসংস্থান কেন্দ্র থেকে। বাইরে এসে অনেকের মুখেই শুনল খনির কাজ বড়ই কষ্টদায়ক। টিনের খনি। বার মাস কাজ নেই, বর্ষা নামলেই কাজ বন্ধ। প্রত্যেক বছর নতুন নতুন কুলী পাঠায়। তাদের শতকরা দশজন আর ফিরে আসে না। পুরানো লোক কেউ আর যেতে চায় না কাজে। তাই নতুন মানুষদের লোভ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

তারপর !

যারা কোন রকমে ধুঁকতে ধুঁকতে ঘরে ফেরে, তাদের আর জীবনীশক্তি থাকে না। মেহনত করে খাবার উপায় থাকে না বলেই ওরা ফিরে যেতে চায় না খনির কাজে। মাটির তলার বিষাক্ত গ্যাসে জর্জরিত হয়ে কেউ কেউ দম বন্ধ হয়েই মরে। তাদের স্বজন যদি কেউ থাকে, তারা জানতেও পারে না কোথায় কোন মাটির তলায় মারা গেছে তাদের প্রিয়জন।

একদিন ভাগ্য অন্বেষণ করতে এসেছিল স্পেনীয় দস্যুরা। এসে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ স্থাপন করেছিল সমগ্র লাতিন আমেরিকায়। স্পেনীয় শাসন শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার সংগ্রাম শুরু করেছিল স্পেনীয় তথা অন্যান্য ইউরোপীয়দের বংশধররা। স্বদেশীয়দের সঙ্গে নতুন সংমিশ্রনে দেখা দিয়েছিল নতুন একটি শ্রেণী। তারাই বিদ্রোহ করল স্পেনের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের সূচনা হয় ভেনেজুয়েলাতে। এর নেতৃত্বে এগিয়ে আসে মিরান্দা। ভেনেজুয়েলাতে রাজধানী কারাকাসে জন্ম এই কুশলী যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদের।

কিন্তু মিরান্দা সাফল্যলাভ করতে পারেননি। তিন-চার বছর ধরে সংগ্রাম চালিয়ে লাতিন আমেরিকার শোষিত মানুষকে মুক্ত করতে না পারলেও মুক্তি পথের সন্ধান তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর

অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্ত করতে এগিয়ে এসেছিল এক ধনীর সন্তান। নাম তার বলিভার।

বলিভার ছিলেন অশ্বপ্রিয়। খাটতে পারতেন অসুরের মত। ঘোড়ার পিঠে চেপে দিনের পর দিন চলতে পারতেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন স্পেনের হাত থেকে লাতিন আমেরিকা তথা তার দেশকে উদ্ধার করতে না পারবেন, ততদিন নিজের জীবনের প্রতি কোন মমতা তার থাকবে না! ব্যর্থ হবে তার জন্ম। তাই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সংগ্রাম করবেন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্পেনের বিরুদ্ধে। অবশ্য দেশীয় সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে।

বলিভারের প্রথম লক্ষ্যস্থল ভেনেজুয়েলা।

রাজকীয় স্পেনীয় বাহিনী শক্তিতে বলিভারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু স্বাধীনতাকামী ত্যাগে উদ্বুদ্ধ বলিভারের সৈন্যবাহিনীর সামনে দাঁড়াতে পারেনি সরকারী সৈন্য। পরপর পাঁচটি যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদীর সৈন্যরা।

ভেনেজুয়েলাই তো লাতিন আমেরিকা নয়। আরও রয়ে গেছে অনেক দেশ যার রাজা হল স্পেনের রাজা। বলিভার প্রতিজ্ঞা করেছে নির্মূল করবে স্পেনের সাম্রাজ্য। দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনীয় শাসন ব্যবস্থার চিহ্নও রাখবে না।

কলম্বিয়া।

ইকোয়াডোর।

সর্বত্র জয়ের তিলক কপালে এঁকে এগিয়ে চলেছে বলিভার।

ওদিকে আরেক বীর সার মার্টিন চিলিতে যুদ্ধ করেছে স্পেনের বিরুদ্ধে। কিন্তু বলিভারের মত নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল না মার্টিনের। তার সংগ্রাম সাফল্যের দিকে অগ্রসর হতে পারছিল না কোন ক্রমেই। বলিভার পত্র পাঠাল, তোমাকে সাহায্য করব বন্ধু। চাও কি আমার সাহায্য ?

মার্টিন যেন হাতে পেল আকাশের চাঁদ।

তুজনে মিলিত হল চিলিতে।

মাইপুর যুদ্ধে স্পেন হল ক্ষতবিক্ষত। এই যুদ্ধের পর সবার নজর পড়ল আলতো পেরুতে।

সাম্রাজ্যবাদের শেষ শেকল ছিঁড়তে বলিভার ঝাঁপিয়ে পড়ল আলতো পেরুর ওপর। স্পেনের শেষ চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেল লাতিন আমেরিকার বুক থেকে। আলতো পেরুর সাধারণ মানুষ সাদরে অভ্যর্থনা জানাল বলিভারকে। দেশের নাম বদলে নতুন নাম দিল বলিভিয়া। বলিভারও এই দেশকে প্রজাতন্ত্ররূপে ঘোষণা করল। সেই প্রজাতন্ত্রের পরিচালক হল, দেশের কায়েমী স্বার্থের উ চুতলার মানুষ।

তারপর শতাব্দী গড়িয়ে গেছে।

সেদিন সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পেতে যে রক্তপাত, যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল বলিভিয়ার সাধারণ মানুষ, সে ত্যাগের বিনিময়ে যে নতুন সাম্রাজ্যবাদের শাসন আর কঠিন দারিদ্র সহ্য করতে হবে তা জানত না সে দিনের মানুষ। উত্তরপুরুষকে ধীরে ধীরে যে অসহনীয় জীবন যাপন করতে হবে আর তার মেহনত লব্ধ ফল ভোগ করবে নয়া উপনিবেশবাদী ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদ তা জানা থাকলে সে দিনের রক্তপাতের সঙ্গে নতুন কিছুর জন্ম হত এদেশে। গণতন্ত্রের নামে অত্যাচার অবিচার শোষণ যেভাবে অব্যাহত রয়েছে, তার বিরুদ্ধে বলার সাহসও নেই কারও।

গন্‌জালিস ঐ নিপীড়িত মানুষদেরই একজন।

তার সম্মুখে প্রাচুর্যের স্রোত, অথচ তার ক্ষমতা নেই তা ভোগ করার! পেটের দায়ে খনিতে যেতে হবে। আপত্তি নেই, কিন্তু খনির জীবন যে কত ভয়ঙ্কর তাও সে জানে। জানে বলেই এক কথায় রাজি হতে পারেনি।

তরুণ বন্ধুটিকেও সে কোন মতেই খনিতে যেতে উৎসাহ দিল না।

রাতের বেলায় গনজালিসের ঘরেই থাকতে হল তাকে।

গন্‌জালিস নানাভাবে আলোচনা করছিল তার দুর্ভাগ্যের কথা। বলল, বন্ধু, তোমার নাম তো বললে না।

আমার নাম প্যাপীও।

বন্ধু প্যাপীও, তুমি লেখাপড়া শিখেছ। তুমি কাজ করতে পারবে কোন অফিসে বা সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে। খনিতে গেলেও অফিসের ছোটখাট কোন কাজ পাবে তুমি। কিন্তু আমি তো দিন মজুর।

প্যাপীও বলল, আমি তার চেয়ে বড় কিছু নই, আমিও চাষা।

গন্‌জালিস নিজের মনেই বলল, চাষা আর মজুর। বেশ মিলেছে। ক'দিন আগে শুনলাম, চাষা মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য একটা কমিটি হয়েছে। সেখানে একবার দেখা করলে কেমন হয়।

মন্দ কি। কালই চল সেখানে। কিন্তু ভরসা বিশেষ কিছু নেই বলেই মনে হয়।

নাই বা হল কাজ, তবুও জানতে পারব তো।

তা ঠিক বলেছ।

রাত কাটল ঘুমিয়ে। গতরাতে প্যাপীওর ভাল ঘুম হয়নি। আজ অঘোরে ঘুমোল। সকাল হতেই গন্‌জালিসের ঘুম ভাঙলো আগে। ডেকে তুলল প্যাপীওকে।

চল, মুখটুক ধুয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

চোখ মুছতে মুছতে প্যাপীও বলল, আজকের প্রোগ্রাম কি ?

প্রথমে কাজ খোঁজা, তারপর সেই কমিটির কাছে যাওয়া।

প্যাপীও এবং গন্‌জালিস কমিটির অফিসে যখন এল, তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি দুজনে সেই চিপ হোটেলে রাতের খাওয়া শেষ করেই এসেছিল।

বেশ সরগরম কমিটির অফিস।

সবার মুখে পাজের নাম।

সবাই বলছে পাজের পতনঅবশ্যম্ভাবী।

পাজ বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট, জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি। কেন হবে তার পতন ?

সে সব অনেক কথা।

পাজ বিতাড়িত করেছিল আগের প্রেসিডেন্ট হেরনান সিলেস জুয়াজোকে দেশ থেকে। তখন থেকে আশ্রয়প্রার্থী সেজে জুয়াজো বাস করছে উরুগুয়েতে। সেখান থেকেই সে চক্রান্ত চালাচ্ছে পাজকে দেশ থেকে বিদায় করার। পাজের অপর প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়ান লিচিন আত্মগোপন করে দেশেই থেকে গেছে। বলিভিয়ার দুর্গম খনি অঞ্চলে সে বেছে নিয়েছে তার কার্যক্ষেত্র। সেখান থেকেই সে চালিয়ে যাচ্ছে পাজ-বিরোধী প্রচার। শ্রমিকদের ও কৃষকদের উত্তেজিত করছে পাজের বিরুদ্ধে।

বলিভিয়ার আসল সমস্যা খাদ্য। দেশকে সোনার দেশ বলা যায়। খনিজদ্রব্যে পরিপূর্ণ দেশ কিন্তু চাষের জমি নেই। যা আছে তায় উৎপাদিত শস্য বলিভিয়ার মানুষের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই বলিভিয়ার শাসকরা তাকিয়ে থাকে মার্কিন খাদ্যভাণ্ডারের দিকে। মার্কিন খাদ্য আসছে প্রচুর, সেই সঙ্গে আসছে মার্কিনের প্রভাব। প্রলোভন জয় করার ক্ষমতা নেই পাজের। মার্কিণ ডলারে আত্ম-বিক্রয় করে পাজ মার্কিণ তাঁবেদারে পরিণত হয়েছে অচিরেই।

পাজ না পেরেছে খাদ্য সমস্যা মেটাতে, না পেরেছে বেকার সমস্যা ঘোচাতে, না পেরেছে দেশের সম্পদকে কাজে লাগাতে। যার ফলে সর্বত্র অশান্তি।

আজ এদের মুখে একটি কথা।

পাজের পতন অনিবার্য।

এ রকম প্রতিক্রিয়াশীল প্রেসিডেন্ট থাকলে দেশের আরও অবনতি ঘটবে।

প্যাপীও এবং গন্‌জালিস শুনছিল তাদের কথা। লোকগুলোকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছিল, বিশেষ করে ছাত্ররাই যেন মারমুখী।

তাদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারছিল না একজন মধ্যবয়সী সুদর্শন ভদ্রলোক।

প্যাপীও জিজ্ঞেস করল, কে লোকটা ?

নাম শুনেছি মনজে। এই কমিটি সেক্রেটারী।

এই কমিটির কি কাজ ?

গরীবের দুঃখ মোচন।

প্যাপীও বলল, ওঃ। আমাদের দুঃখ মোচনের কোন আশা এখানে নেই বন্ধু। চল, অন্য কোথাও কাজের চেষ্টা করব। এরা পাজকে নিয়েই ব্যস্ত। এক পাজ যাবে, আরেক পাজ গদীতে বসবে। ততদিনে আমাদের বুক আর পিঠ সমান হয়ে যাবে। আমাদের কথা শোনার কোন অবসর নেই।

গন্‌জালিস বলল, তাই চল। রাতও অনেক হয়েছে।

দু জনেই ফিরে চলল।

বেশি দূর এগোতে পারল না। তাদের বাসস্থান পৌছাতে অনেক বিলম্ব। তাকিয়ে দেখল, দূরে একটা সুদৃশ্য বাড়ির সামনে ভীড় জমেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা গেল গোলমাল। এগিয়ে গেল দুজনেই। দেখল, তাদের বস্তির অনেক লোক সমবেত হয়েছে সেখানে। একজন যুবক হাত নেড়ে বক্তৃতা করছে, বলছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে আমাদের দেশ থেকে চির বিদায় দিতে হবে। আপনারা এগিয়ে আসুন। এই যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুদ্র ঘাঁটি, এটাকে উচ্ছেদ করুন। মার্কিনী তাঁবেদারী করে আমরা ধ্বংসের পথে নেমে চলেছি। তার প্রতিকার করুন।

বলা মাত্র কোথা থেকে একদল লোক হাতুড়ী ডাণ্ডা নিয়ে এগিয়ে এসে সেই সুন্দর বাড়িটার দরজা ভাঙতে আরম্ভ করল। তিন তলার জানালায় দেখা গেল ক'জনকে। তাদের হাতে রাইফেল। তারা কোন সাবধান বাণী না জানিয়ে অনবরত গুলী করতে লাগল। এদিকে জনতার মাঝ থেকেও বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। শুরু

হল বন্ধুকের লড়াই। ইতিমধ্যে দরজা ভেঙে কিছু লোক ঢুকে পড়েছে ভেতরে। সামনা সামনি লড়াই। জনতা অস্ত্রে সুসজ্জিত নয়। তারা আক্রমণ বন্ধ করে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে পালাতে লাগল। রাস্তায় পড়ে রইল কয়েকটি হত ও আহত ব্যক্তি।

ঘণ্টা ধ্বনি শোনা গেল।

ছুটে এল ফায়ার বিগ্রেড।

সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে ছুটে এল সামরিক বাহিনী।

ততক্ষণে রাস্তা খালি।

প্যাপীও এবং গন্‌জালিস বিপদ বুঝে গলিপথে আত্মগোপন করল।

সারা রাত বেশ শান্তিতেই কাটল।

পরের দিন।

দশটা বাজতে সামান্য দেরী। গন্‌জালিস ও প্যাপীও কাজের আশায় আজও পথে বেরিয়েছে। আজও এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত তারা। চিপ হোটেলে বসে পেট ভরে খেয়ে নিল। তারপর গিয়ে বসল রাস্তার ধারে খোলা একটা পাহাড়ী টীলায়।

আজও চমকে উঠল বন্দুক কামানের শব্দে। আজও বুঝি আবার আরম্ভ হল হাঙ্গামা। কোথায়, কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় যুদ্ধ। মার্কিন বিরোধী ছাত্রদের শায়েস্তা করতে সামরিক বাহিনী ছুটে এসেছে।

দু পক্ষেই গুলী বিনিময়। দু পক্ষই রাইফেল মেশিনগান ব্যবহার করছে।

লোক ছুটাছুটি করছে। দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেছে। শহরের রাস্তা দেখতে দেখতে জনশূন্য। সবাই প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে নিরাপদ আশ্রয়ে।

প্রেসিডেন্ট পাজ তখন ক্ষিপ্তপ্রায়।

সংবাদ এসেছে, খনি অঞ্চলেও সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে শ্রমিকরা। জুয়ান লিচিনের নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করেছে। মার্কিন মহল বেশ বুঝতে পারল, এ কম্যুনিষ্টদের কীর্তি। লাতিন আমেরিকাকে স্বাধীন বিশ্বের স্নেহচ্ছায়া থেকে লালদস্যুরা টেনে বের করতে চায়।

পাজ অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হল। তার মার্কিন উপদেষ্টার দল যা বুঝিয়ে ছিল তাতেই সে মেতেছে। সমানে নিপীড়ন চলছে বিক্ষুব্ধকারীদের বিরুদ্ধে। সরকারী সমগ্র যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে অশান্তি দমন করতে।

অলক্ষ্যে আরেকজন পাজের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করে নিজের প্রভুত্ব বিস্তারে তখন আগ্রহী। ওদিকে কম্যুনিষ্টদেরও দমন করিতে হবে। এই চক্রান্তকারীর মূলনীতি হল, উভয় পক্ষকে কায়দায় আনতে হলে সামরিক বাহিনীকে হাতে রাখা বিধেয়। পাজকে বিদায় দিলে সাময়িকভাবে কম্যুনিষ্ট দৌরাত্ম থামানো যাবে। তাদের বুঝিয়ে দেওয়া যাবে, প্রগতিশীল সরকার গঠন তার উদ্দেশ্য। আর সামরিক বাহিনী হাতে না থাকলে পাজকেও বিতাড়িত করা অসম্ভব। মধ্যবর্তী সময়ে কম্যুনিষ্ট দমন খুব কঠিন।

এই চক্রান্তের যে নেতা, সে হল ভাইস প্রেসিডেন্ট রেণী বারিয়েনতোস।

এই ব্যক্তিটিই আট বছর আগে যে সামরিক অভ্যুত্থান হয়, তাতে মদত জুগিয়েছে পাজের স্বপক্ষে। পাজকে আর্জেনটিনা থেকে নিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের পদে বসিয়েছে বারিয়েনতোস। সেই দিন বলিভিয়ার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ভিল্লোরোলকে ল্যাম্প পোষ্টে ঝুলিয়ে হত্যা করতে হয়েছিল পাজের স্বার্থে, আর তাতে মূখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল বারিয়েনতোস স্বয়ং।

এই সব কাযের নায়ক এই বারিয়েনতোস একসময় ছিল পাজের দোস্ত, বর্তমানে দুশমন।

বারিয়েনতোস দেখল, লা পাজে বসে চক্রান্ত কার্যকরী করা সম্ভব নয়। পাজের প্রভাব রয়েছে সৈন্যবাহিনীর ওপর। তার চেয়ে সৈন্যবাহিনীর জেনারেল ওভানদোর সঙ্গে পরামর্শ করে বারিয়েনতোস ফিরে গেল নিজের এলাকা কোচাকামবায়! সেখানে পাজের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল জনসাধারণকে।

নেপথ্য থেকে এগিয়ে এল জেনারেল ওভানদোর।

সামরিক ক্যু দেখা দিল, সসম্মানে বিদায় দিল পাজকে।

পাজ দেশ ছেড়ে পেরুতে পালিয়ে গেল। শাসন ক্ষমতা পেল জেনারেল ওভানদোর। তখনও জনসাধারণ ভাবতে পারে নি, কি চক্রান্ত রয়েছে এই সব কাজের পেছনে। শ্রমিক, কৃষক যারা বিদ্রোহ করেছিল, তারাও থামল সাময়িকভাবে, শহরের অশান্তিও থামল সঙ্গে সঙ্গে। সবাই মনে করল, গরীবের দুঃখ লাঘব হবে এইবার।

বারিয়েনতোস ফিরে এল লা পাজে।

সেই দিন থেকে বারিয়েনতোস দখল করল বলিভিয়ার গদী।

তারপরই চলল কূটবুদ্ধির খেলা।

বারিয়েনতোস অস্ত্র সাহায্য চাইল আমেরিকার কাছে।

লোককে বলল, দেশকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন। দুর্বল দেশের বাঁচার অধিকার নেই। যারা দেশপ্রেমী, তাদের উচিত শক্তিশালী বলিভিয়া গড়তে এগিয়ে আসা।

কিন্তু কেন?

প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ হবার তো কোন লক্ষণ নেই।

সত্যিই ছিল না।

কিন্তু দেশ তথা গদী রক্ষা করতে হলে কম্যুনিষ্ট দমন প্রয়োজন প্রকাশ্যে এই কথা বলতে না পারলেও বলল, গণতন্ত্র রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের রয়েছে। গণতন্ত্রী বলিভিয়াকে ধ্বংস করতে

আভ্যন্তরীন শত্রুর অভাব নেই। তাই সতর্ক ও শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন আছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞ দল এল বলিভিয়ার অবস্থা সরজমিনে তদন্ত করতে। লাতিন আমেরিকা থেকে মার্কিনকে উৎখাত করতে কম্যুনিষ্টরা যে ভাবে এগিয়েছে, তাতে আশঙ্কার কারণ রয়েছে। বলিভিয়াকে শক্তিশালী করে তুলতে পারলে মধ্য আমেরিকা কম্যুনিষ্ট প্রভাবমুক্ত হবে নিশ্চিত।

অতএব পাঠাও মারণাস্ত্র।

এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল গন্‌জালিস ও প্যাপীওর সামনে। তারা দর্শকমাত্র। মাত্র একদিন তারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল এই অভ্যুত্থানে।

পাজের প্রাসাদ যেদিন লুট হচ্ছিল, সেদিন তারাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। হাতের কাছে আটটি রূপোর মোমবাতির স্ট্যাণ্ড পেয়েছিল। সেই আটটি নিয়ে তারা পরের দিন লা পাজ পরিত্যাগ করে খনি অঞ্চলের দিকে চলতে শুরু করেছিল।

রাজধানী যে নিরাপদ নয় তা তারা বুঝেছিল। তাই ছুটে ছিল নিরাপদে বাস করার মত স্থানে। আরও ভয় ছিল, রূপার স্ট্যাণ্ডগুলো সমেত ধরা পড়লে তাদের জেল অনিবার্য। অথচ বাহিরে কোথাও গিয়ে বিক্রী করতে পারলে তা দিয়ে বেশ কয়েক মাস তাদের চলবে। সেই সময়ের মধ্যে কোন কাজও তারা খুঁজে নিতে পারবে।

বলিভিয়া থেকে অনেকদূরে ছোট্ট একটা দ্বীপে অখন ঠিক এইভাবেই জেগে উটেছিল দেশের মানুষ। সেদিন তাদের বিপথে পরিচালনা করার মত প্রতারক ছিল না। সেদিন সেখানে ছিল একদল ত্যাগী মানুষ, যারা মার্কিদ ডলারে বিক্রি বাতিস্তাকে দেশ ছাড়া করতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল কাস্ত্রো।

কাস্ত্রোর সাফল্য নির্ভর করছিল তিন জনের ওপর। এই তিন জন যে কোথা থেকে এসে তার সঙ্গে একীভূত হয়েছিল তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।

গুয়েতেমালার জঙ্গল।

জঙ্গলের মাঝে পাহাড়ে খাঁজে সুরঙ্গ করে বাস করছে পৃথিবীর ভাবী নেতারা। সুরঙ্গের মুখ বন্ধ। বাহির থেকে বুঝা যায় না যে ওটা সুড়ঙ্গ মুখ। গাছপালা পাথর দিয়ে প্রকৃতির রূপের সঙ্গে রূপ মিশিয়ে দিয়েছে ওই সুরঙ্গের বাসিন্দারা।

অনেক রাত।

বাঘের গলার শব্দ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। হায়নার চিৎকারে নিস্তব্ধ বাতাস কেঁপে উঠছে। সুরঙ্গের অধিবাসীরা নিদ্রিত দরজায় পাহারা দিচ্ছে একজন শান্ত্রী।

হাত ঘড়িতে শান্ত্রী দেখল রাত দুটো বেজেছে।

কার যেন পায়ের শব্দ।

বন্য জন্তুর নয়। মানুষের পায়ের শব্দের মতো।

শান্ত্রী সতর্ক হল। মাঠের ওপর বুক পেতে শুয়ে পড়ল। সঙ্গীদের ঘুম ভাঙ্গাবে কিনা ভাবছিল। আধা আলো আধা আঁধারে দেখল জনসংখ্যা মাত্র এক। তা হলে ভয়ের কিছু নেই। একাই পারবে কাবু করতে।

আগন্তুক দাঁড়াল। চুরুট ধরাল।

তারপর চাপা গলায় কাশতে কাশতে এগিয়ে এল সুরঙ্গের দিকে।

মাত্র দশ গজ।

শান্ত্রী সজাগ হল, চিৎকার করে বলল, দাঁড়াও। এগোলেই গুলী করব।

দাঁড়াল আগন্তুক।

শান্ত্রীর চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেছে সঙ্গীদের। উঠে বসেই হাতিয়ার নিয়ে তারাও প্রস্তুত।

আবার প্রশ্ন করল, বন্ধু না শত্রু ?

উত্তর এল, বন্ধু।

তুমি কে ?

ততক্ষণ দল বেঁধে সবাই প্রস্তুত হয়েছে রাইফেল হাতে নিয়ে।

আমি ডাক্তার মেজর আরনেস্তো চে গুয়েভারা।

চমকে উঠল সবাই।

তাদের সর্বাধিনায়ক, অথচ…

আমার চিঠি তোমরা পাও নি ?

টর্চ জ্বালল একজন। আলো গিয়ে পড়ল চে'র মুখে। ঠিক !

আজকেয় ডাক সন্ধ্যার পর এসেছে। পড়া হয় নি।

অন্যায় করেছ। সংবাদ সংগ্রহ ও সরবরাহ বড় কাজ। তোমরা যদি গুলী করতে তা হলে আমার মৃত্যু হত নিশ্চিত। অথচ তোমরা কোন খবর রাখ না। ভুল হলে তা সংশোধন করা কত কঠিন তাতো জানো।

কথা নেই কারও মুখে।

চে ধীরে ধীরে প্রবেশ করল সুরঙ্গে।

চুরুটে কয়েক টান দিয়ে চে বার বার কাশতে থাকে। কোন রকমে কাশির ধাক্কা সামলে শান্ত্রীর পিছু পিছু সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

ডাকল, মারকোস।

বলুন কমরেড।

আমাদের কর্মক্ষেত্র এখানে থেকে উঠিয়ে নিতে হবে। যেতে হবে অনেক দূরে।

কোথায় ?

কিউবাতে।

লাতিন আমেরিকায় তা হলে আমাদের তৎপরতা বন্ধ থাকবে।

না। যারা গুয়েতেমালার লোক তারা থাকবে, তারা কাজ করবে। আমাদের বেশি কাজ রয়েছে কিউবাতে। কিউবা থেকে ফিদেল ডেকে পাঠিয়েছে।

ইতঃস্তত করে মারকোস বলল, এখানকার কাজ অসমাপ্ত থাকবে কি ?

না। তুমি তো জান মারকোস, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, লাতিন আমেরিকা থেকে ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদকে নিশ্চিহ্ন করব। যদি তা না পারি, জীবন দিয়ে দেশের ঋণ শোধ করব। লাতিন আমেরিকার প্রতিটি দেশই আমার মাতৃভূমি। আমি কাউকে বাদ দিতে পারব না। কিন্তু আমরা যে কাজই করতে চাই না কেন, আমাদের পায়ের তলায় কিছুটা নিরাপদ ভূমি দরকার, কিছুটা নিজস্ব ভূমি দরকার, সেই নিরাপদ নিজস্ব ভূমি আমরা পাব কিউবাতে। সেখানে যদি সাফল্যলাভ করি তা হলে ধীরে ধীরে আরও এগিয়ে যেতে পারব। কিউবার বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই আমি ছুটে এসেছি কিউবা থেকে আরও শক্তি সংগ্রহ করে ধনতন্ত্রের দাস ইয়াঙ্কীর গোলাম বাতিস্তাকে ধ্বংস করতে আরও শক্তি সংগ্রহ করতে। তোমরা যারা কিউবান, আর যারা স্বেচ্ছায় যেতে চাও, তারা প্রস্তুত হও।

সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসল চে।

আমাদের প্রমাণ করতে হবে, ফ্যাসীবাদ মারণাস্ত্রে যতই শক্তিশালী হোক, জনতার ইস্পাতের মত দৃঢ় সংকল্পের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ। আমাদের দেখাতে হবে দুনিয়াকে, জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের স্পৃহাকে কোন অত্যাচারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা নেই দমন করে রাখবার।

মারকোস বলল, আমাদের সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে কমরেড।

চে জোরের সঙ্গে বলল, না। সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হলে একশ' বছরেও সুযোগ আসবে না। জন সংগঠন যতটুকু দরকার ততটুকুই আমরা করব। আমাদের অতি সামান্য শক্তিকে সংহত করতে পারলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ব। যারা সুযোগের অপেক্ষা করে তারা বিপ্লবের প্রতিবন্ধক। অনেক সময় দেখা গেছে তারা প্রতিবিপ্লবী। তাই আমাদের আক্রমণ চালিয়ে চলতে হবে সব রকম অবস্থার মাঝেই। সে অবস্থা আমাদের অনুকূল হোক আর প্রতিকূল হোক, আমরা বিলম্ব করে বিপ্লবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে দেব না।

মারকোস তবু বলল, আমরা কি শহরে আমাদের কর্মক্ষেত্র গড়ে তুলব ?

না। আমাদের কর্মক্ষেত্র হবে গ্রামে। গ্রাম থেকেই এগোতে হবে শহরে।

মারকোস আরও একবার সুযোগের কথা বলতেই চে কঠিন ভাবে বলল, পরাজিতের মনোভাব লক্ষ্য করছি তোমার কথায়। যারা বিপ্লবের নামাবলী গায়ে দিয়ে কম্যুনিজমের বুলি আওড়ে জনসাধারণের স্বার্থহানি ঘটিয়ে বেশ মোলায়েম ভাষায় ও পোষাকে বিপ্লব তথা সমাজতন্ত্রের সর্বনাশ করে তারাই সুযোগের কথা বলে। আমরা তা নই। কাজ দিয়ে আমরা প্রমান করব, সুযোগটা হল ছেঁদো কথা। ভীরু ও শোধনবাদীর আত্মতুষ্টি ও অপরকে প্রতারণা করার কৌশল মাত্র। তোমরা প্রস্তুত হয়।

চে আবার চুরুট ধরাল। চুরুটের ধুঁয়োতে সুরঙ্গ মেতে উঠল। মাঝে মাঝে কাশতে থাকে চে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আমাদের সর্বনিম্ন কিছু থাকা দরকার। নইলে সশস্ত্র সংঘর্ষের দ্বারা অত্যাচারী ফ্যাসীবাদকে নির্মূল করা যাবে না। মনে রেখ, গণতন্ত্রের নামে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যারা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় তারা হল সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু।

গণতন্ত্রের নামে যখন অত্যাচার চলতে থাকে, তখন মানুষের মনে যে ক্ষোভ জমা হয় তাই ফেটে পড়ে বিপ্লবের আকারে। বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে কায়েমী স্বার্থবাহকদের অত্যাচার। মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে, অন্তত আমরা যারা সহকর্মী, আমাদের সবাই এ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন না থাকলে আমাদের কর্মক্ষমতা ও বিপ্লবসাধনা ব্যর্থ হবে। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে লক্ষ্য রাখা দরকার, যতক্ষণ শান্তিপূর্ণ আন্দোলন এগোতে এগোতে থেমে না যাবে, অর্থাৎ আন্দোলন ব্যর্থ না হবে, ততক্ষণ সশস্ত্র বিপ্লব বিঘ্নিত হবে। জনসাধারণের মনে মোহ থাকে। গণতন্ত্রের সেই মোহভঙ্গের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়, কিন্তু তাও সাময়িক। সে অবস্থা কাটিয়ে আমাদের উঠতেই হবে।

কথা শেষ করে গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবতে থাকে চে।

উরবানো বসেছিল পাশে। মারকোসকে বলল, জল গরম করে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে। মারকোস জল গরম করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন রাত শেষ হতে অনেক বাকি।

উরবানো জিজ্ঞেস করল, কি ভাবছ কমরেড ?

ভাবছি আরজেনটিনার কথা।

হঠাৎ আরজেনটিনার কথা মনে পড়ল কেন ?

লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে আমরা সব কিছু ত্যাগ করেছি। আমরা উত্তর থেকে আরম্ভ করেছি, আমাদের পৌঁছতে হবে দক্ষিণে। সেই দক্ষিণের দেশ আরজেনটিনা আমার জন্মভূমি। আরজেনটিনা অবধি পৌঁছতে কত বছর দরকার হবে তাই ভাবছিলাম।

আরজেনটিনা তোমার জন্মভূমি !

হাঁ। বুয়েনস আয়ার মানে আরজেনটিনার রাজধানীতেই জন্মেছিলাম আঠাশ সালে। বাবা ছিলেন নামজাদা স্থপতি। কিন্তু বড়ই রোগা ছিলাম ছোটবেলায়। ছোটবেলায় রুগ্ন ছিলাম বলে মা-বাবার কত চিন্তা। ভবিষ্যতে যাতে আমি কষ্ট না পাই তার

জন্যই তারা স্থির করেছিলেন, আমাকে ডাক্তারী পড়াবেন। চিকিৎসার জন্য, স্বাস্থ্য মজবুত রাখার জন্য যাতে কারও আশ্রয় নিতে না হয়, সেজন্যই আমাকে ডাক্তারী পড়তে দিয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবা ছিলেন বড়ই দৃঢ়চেতা। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন। তার বড় ভাবনা ছিল আমার স্বাস্থ্য নিয়ে। যখন ডাক্তারী পাশ করে কলেজ থেকে এলাম, তখন বাবা বললেন, এবার আমি নিশ্চিন্ত। তোর নিজের রোগের জন্য তুই হবি বড় চিকিৎসক।

আবার থামল চে গুয়েভারা।

আনমনে চুরুট টানতে টানতে আবার কেশে উঠল।

এই কাশি, বুঝলে কমরেড, এই কাশি আমার বাল্যকাল থেকে। শেষ রাতে যখন কাশিতে দম বন্ধ হবার উপক্রম হত, বাবা পাশের ঘর থেকে ছুটে এসে আমার বুকে পিঠে অলিভ অয়েল মালিশ করে দিতেন। বড়ই ভালবাসতেন আমাকে। ছোটবেলার অনেক কথাই মনে পড়ে বন্ধু। আমার সেই জন্মভূমি আরজেনটিনা অনেক দূর। সেখানে কবে পৌঁছব তাই ভাবি মাঝে মাঝে। থাক ওসব কথা। এবার প্রস্তুত হও। আমাদের যেতে হবে কিউবাতে।

সকাল হতে না হতেই ক্যাম্প ভেঙে সবাই প্রস্তুত হল কিউবা যেতে।

কিউবা পৌঁছনো খুব সহজ কাজ নয়।

বনজঙ্গল ভেঙে আত্মগোপন করে হঙুরাশের মাঝ দিয়ে সমুদ্র-তীরে সবাই উপস্থিত হল। সেখানে ছিল স্পীডবোট। ক'জন জড়াজড়ি করে কোন রকমে স্থান করে নিল বোটে। তারপর উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গে লাফাতে লাফাতে বোট ছুটল কিউবার দিকে। কিউবা ঘিরে রয়েছে মার্কিন নৌবহর। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের পৌঁছতে হবে।

বোটে বসে চে আলোচনায় মেতে উঠল সঙ্গীদের সঙ্গে।

তোমরা মনে কর শহর থেকে বিপ্লবী কর্মধারা পরিচালনা সহজ। তা নয়। শহর কেন্দ্রিক হলেই আমরা ভুল করব। গ্রামই আসল প্রাণকেন্দ্র দেশের। গ্রামের জনসংখ্যাই বেশি। বিশেষ করে যে সব দেশ অনগ্রসর, সে সব দেশে কৃষি নির্ভরশীল লোক বেশি। আর এই কৃষি নির্ভরশীল জনসংখ্যার শতকরা নব্বই জন হল সর্বাধিক দরিদ্র। এই দরিদ্র শোষিত মানুষই আমাদের কাজে বেশি সাহায্য করতে পারে। তবে শহরের শ্রমিকদের ছোট করে দেখলে চলবে না। বিপ্লবে তাদের ভূমিকা কম নয়। কিন্তু বে-আইনী শ্রমিক আন্দোলন থেকে নানাপ্রকার বিপদের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিপন্ন হবার সম্ভাবনাই বেশি। তারা গোপনে কাজ করবে কিন্তু অস্ত্র নিয়ে নয়। শহরে যত সত্বর প্রতিক্রিয়াশীলরা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, গ্রামে তা পারে না। গ্রামে কাজ করা সেজন্য সব চেয়ে সুবিধাজনক, দুর্গম গ্রাম অঞ্চলে সব সময় শোষকের দালালরা পৌঁছতে পারে না। কোন সময় যদি পৌঁছতেও পারে তা বিলম্বিত হয়। দালালদের হাত থেকে আমরা গ্রাম তথা গ্রামবাসীদের রক্ষা করতে পারি গোরিলা যুদ্ধ করে।

ওরা বলছে আমাদের গোরিলাযুদ্ধ আর ডাকাতি একই কথা।

চে হাসতে হাসতে বলল, ওরা তাই বলবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট করে দেখাতে পারলে জনমনে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উদ্রেক করা যায়। প্রতারক সৃষ্টি করা যায়। আদর্শহীন মুক্তিযোদ্ধাদের সহজেই বশ করা যায়। এইসব নানা কারণে ওরা ওসব প্রচার করে জনতাকে বিভ্রান্ত করে। গোরিলাযুদ্ধও কতকগুলো বৈজ্ঞানিক নিয়মের অধীনে। সে নিয়ম মেনে চলে না, অথবা সে নিয়ম জানে না ডাকাতরা। তাই তাদের কাজ হল ব্যক্তিস্বার্থে পরস্ব ছিনিয়ে নেওয়া, শেষপর্যন্ত তারা সাফল্যলাভ

করে না। ব্যক্তিস্বার্থ যেখানে প্রবল, সেখানে থাকে ভাগ বাঁটোয়ারার প্রশ্ন। যখন কোন পক্ষ অংশলাভে বঞ্চিত হয় অথবা কম লভ্যাংশ পায়, তখন তারা অপর পক্ষকে ঘায়েল করতে প্রতারণা করে। কিন্তু যারা দেশের মুক্তিযোদ্ধা, তাদের ত্যাগ শুধু অপরিসীম নয়। ব্যক্তিস্বার্থ বলে কোন বিবেচনা তাদের থাকে না, তারা যা কিছু করে সমষ্টির স্বার্থে। এখানেই মুক্তিযোদ্ধা গোরিলাদের আর সাধারণ দস্যুর প্রথম পার্থক্য। দ্বিতীয়ত, আদর্শহীন দস্যুতা আর রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধাকে যারা এক পর্যায়ের মনে করে, তারা অতি হীন ও নীচ। তাদের উদ্দেশ্য হল দেশে ফ্যাসীবাদকে কায়েমী রাখতে নানা রকম মিষ্টি কথা লোককে শোনানো। মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন আইন মেনে চলা। শৃঙ্খলাবোধ, সততা, বীরত্ব, ত্যাগ—এ সবের সঙ্গে কাজ করবে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তবেই সাফল্য আসবে মুক্তিযুদ্ধের। আমাদের বিবেচনা করতে হবে দেশের ভৌগলিক অবস্থান, সামাজিক গঠন, জনতার মানসিক বিবর্তন। জনতার আস্থালাভ না করলে আমাদের গতি স্তব্ধ হতে বাধ্য। এই সব বিবেচনা করে তবেই এগোতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজের রুটিন তৈরী করতে হবে।

বাধা দিয়ে উরবানো দূরবীণ থেকে চোখ নামিয়ে বলল, উত্তরে কটা প্লেন দেখা যাচ্ছে।

ব্যস্ততার সঙ্গে দূরবীণটা চোখে তুলে নিয়ে চে দেখতে লাগল নীল আকাশকে। অনেকক্ষণ দেখে বলল, হাঁ। কিন্তু মনে হচ্ছে ও দুটোর গতিপথ এদিকে নয়।

দূরবীণ থেকে চোখ নামিয়ে চে বলল, ভয় তো সর্বত্র। তার জন্য আমাদের কাজ বন্ধ থাকবে কি? তা তো হতে পারে না :বন্ধুগণ। আমরা যা আলোচনা করছিলাম তাতেই ফিরে যেতে চাই। আমাদের যাত্রাপথ বিঘ্নহীন নয়। তা জেনেই আমরা এগিয়েছি ও এগোচ্ছি। ভয় পাবার মত কিছু নেই।

উরবানো বলল, আমাদের সাফল্যের মূল হল অস্ত্র। অস্ত্র-শক্তিতে যদি আমরা সফল হতে না পারি তা হলে লড়াই করা কি সম্ভব? আমরা দুর্বল হলে শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারব কেন?

আমাদের শক্তির মূল হল জন-সমর্থন। আগেই তোমাদের বলেছি, ডাকাত আর মুক্তিযোদ্ধাদের পার্থক্য কোথায়। জন-সমর্থন যদি থাকত, তা হলে ডাকাতকে কেউ কি ডাকাত বলত? জন-সমর্থন নেই বলেই ডাকাত সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের প্রতি কারও কোন সহানুভূতি থাকে না। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা আলাদা জাতের মানুষ। আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধের দুটি পক্ষ রয়েছে। একপক্ষে রয়েছে ফ্যাসীবাদীদের দালাল, অত্যাচারী আমলা ও পেশাদারী সৈন্য। পেশাদারী সৈন্যদের অস্ত্র জোগাচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা। শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে অত্যাচার করছে ওরা দরিদ্র জনসাধারণের ওপর। অপর পক্ষে রয়েছে জনসাধারণ। গোরিলাদের মুক্তিযুদ্ধ হল জনসাধারণের যুদ্ধ। এদের শক্তি হল জনতা। জনতার সমর্থন রয়েছে বলেই শিক্ষিত পেশাদারী সৈন্যদের মোকাবিলা আমরা করতে পারি। জন-সমর্থন থাকলে পৃথিবীর সব দেশেই তা পারবে। পাশবিক শক্তির সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করে জয়লাভ করা সহজ নয়। সেই কঠিন কাজে আমরা ব্রতী হয়েছি। পেশাদারী সৈন্যদের পঙ্গু করে দেশকে মুক্ত করতে হলে প্রয়োজন মুক্তিযোদ্ধাদের গোরিলা যুদ্ধ।

কিন্তু আমরা তো শান্তিপূর্ণ উপায়েও জনতার মুক্তি আনতে পারি।

না, তা পারি না। মুক্তিযোদ্ধারা মূলত সমাজ-সংস্কারক। জনতার ক্রোধ ফেটে পড়ে বিক্ষোভের মাঝ দিয়ে। অত্যাচারীর অত্যাচার রোধ করতে হলে তখন প্রয়োজন হয় অস্ত্র ধারণের। আত্মরক্ষার অধিকার পৃথিবীর সর্বসম্মত অধিকার। সে অধিকার

রক্ষা করতে নিষ্ক্রিয় আন্দোলন মোটেই কার্যকরী নয়। বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের ক্ষমতা এত বেশি যে তারা অর্ধশিক্ষিত দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের মনে বিপ্লব সম্বন্ধে প্রতিকূল অভিমত সৃষ্টি করতে পারে যে কোন সময়। সে সুযোগ তাদের দেওয়া উচিত নয়। শত্রুরা গণতন্ত্রের কথা বলবে, রাষ্ট্রীয়করণের কথা বলবে। আসল উদ্দেশ্য তাদের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করা। শান্তি যদি সমষ্টির না হয় তা হলে কার শান্তির প্রয়োজন? সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা শান্তিতে শোষণ অব্যাহত রাখতে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের কথা বলে। সে হল কল্পনা, বাস্তব আরও রূঢ়।

টিন ভর্তি খাবার এনে সামনে রাখল সঙ্গীরা।

চে চুরুট ধরিয়ে নিবিষ্ট মনে আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল।

তুমি খাবে না ডাক্তার?

তোমাদের খাওয়া হয়েছে তো?

হাঁ। তোমার খাওয়া শুধু বাকি।

জল কতটা আছে?

আরও দু-তিন দিন চলবে।

সতর্ক হয়ে জল খরচ করবে বন্ধুগণ। হয়ত তিনদিনের জায়গায় পাঁচদিন দরকার হতে পারে কিউবা পৌঁছতে। জল ফুরিয়ে গেলে প্রচণ্ড এই রোদের তাপে আমরা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাব। আমাদের শুকনো মৃতদেহগুলো পৌঁছবে কিউবার উপকূলে। যাতে জীবিত অবস্থায় পৌঁছতে পারি তার জন্য সতর্ক থাকা উচিত।

চে দু-তিন টুকরো রুটি আর হ্যাম খেয়ে এক পেয়ালা জল খেল।

আবার চুরুট ধরিয়ে বলল, আমাদের সর্বাগ্রে জানতে হবে কিউবার পথঘাট। কোন পথে আমরা প্রবেশ করতে পারি, কোন পথে পালাতে পারি, কোথায় আত্মগোপন করতে পারি, এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকলে আমাদের কাজও এগোবে না বরং

মৃত্যুকে ইচ্ছে করে নিজের কাছে ডেকে আনব। আমরা চাই ভূমির মালিকানা বর্তাবে চাষীর, শ্রমে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য ভোগ করার অধিকার পাবে শ্রমিক, দেশের পশুসম্পদ হবে জনসাধারণের সম্পদ। শত শত বৎসর ধরে মানুষ যা পেতে চেয়েছে অথচ লোকে যা থেকে তাদের বঞ্চিত করেছে, সেই সব বস্তু পৌঁছে দিতে হবে মানুষের কাছে, তাতে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমাদের কাজ শুধু যুদ্ধ নয়, আমাদের কাজ হল জনতার হাতে তুলে দেওয়া তাদের বাঁচার মত বস্তুর প্রতি অধিকার।

তোমার কথা হল চাষীদের মাঝে বসে কাজ করার, কিন্তু শ্রমিকদেরও তো কিছু করার আছে।

নিশ্চয় আছে। কিন্তু শ্রমিক সাধারণ এমন এলাকায় বাস করে, সেখানে শাসকের পেশাদারী সৈন্য যে কোন সময় আঘাত করতে পারে। এ বিষয় নিয়ে পরীক্ষা করেছেন মাও সে-তুং। তিনি শ্রমিক বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন সাংহাইতে। এই বিদ্রোহ অকিঞ্চিৎকর নয়, তার ফলাফলও হয়ত সুদূরপ্রসারী ছিল, কিন্তু চিয়াং-এর সৈন্য এই বিদ্রোহকে ধ্বংস করেছিল। যারা এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল তাদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল। মাও ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি কর্মধারাকে বদলে ফেলতে বাধ্য হন। ইনান থেকে যে ছয় হাজার মাইল তার লঙ্ মার্চ, সেটা ছিল চাষীদের। মাও কৃষি বিপ্লবকে সামনে তুলে ধরেছিলেন। কৃষকদের সমস্যার দিকে বেশি নজর দিয়ে চাষীদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সেই লঙ্ মার্চ হল মাওয়ের সাফল্যের গোড়ার কথা, আর তা সম্ভব হয়েছিল মাওয়ের দূরদর্শিতায়। চাষীদের নিয়ে তিনি যে মুক্তিযুদ্ধে নেমেছিলেন, সেটাই হল তাঁর সাফল্যের সোপান ও একটি মাত্র সোপান। তোমরা তাকিয়ে দেখ হো-চি-মিনের দিকে। হো বুঝেছিলেন, শহরের শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবীদের চেয়ে গ্রামের চাষীরা বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। ফরাসীদের সঙ্গে যখন হো

যুদ্ধে নামলেন, তখন তার একমাত্র সহায় ছিল গ্রামের চাষীরা। শক্তি সামান্য, অথচ উপনিবেশবাদী ফরাসী শক্তিকে যেভাবে পর্যুদস্ত করেছিল তার এই বিপ্লবী কৃষক কমরেডরা, তা অসামান্য। আমাদেরও কর্মক্ষেত্র হবে গ্রামে এবং আমাদের প্রধান সহায় হবে কৃষক। শ্রমিকরা আসবে আমাদের পাশে কিন্তু সাফল্যকে ত্বরান্বিত না করলে শ্রমিক আস্থাশীল হবে না। আর শহরে শ্রমজীবীরা চাষীদের তুলনায় অনেক বেশি আরামে থাকে। সেজন্য সর্বহারার প্রথম সারিতে স্থান পাবে কৃষক ও খেতের দিনমজুররা, তার পরের সারিতে থাকবে শ্রমিক, তার পরের সারিতে বুদ্ধিজীবীর দল। এইভাবে যদি আমাদের কার্যবিন্যাস করতে পারি তা হলে আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

কথা শেষ করে চুরুটে আবার আগুন দিল চে। আবার কাশতে লাগল। তাড়াতাড়ি একটা বড়ি বের করে মুখে ফেলে দিয়ে আরেক পেয়ালা জল খেল।

হাঁপানীটা বড়ই উৎপাত করছে।

চিকিৎসার দরকার।

আমি নিজে ডাক্তার হয়েও এই কঠিন রোগে ভুগছি। চিকিৎসা-শাস্ত্রে নিরাময়ের মত ওষুধ আজও আবিষ্কার হয়নি বন্ধুগণ। যদি তা হত, তা হলে আমি নিশ্চয়ই কোন কষ্ট সহ্য করতাম না। কিন্তু উপায় নেই। সাময়িক উপশম ভিন্ন আর কি করতে পারি। শুধু কর্মক্ষম হয়ে বেঁচে থাকতে চাই আর বিশটা বছর। তা হলে আমাদের এই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত দেশ লাতিন আমেরিকাকে নিশ্চয়ই অত্যাচারী বুর্জোয়া ফ্যাসীবাদীদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারতাম। দেখি, দেহ আর মন সমানে কাজ করতে পারে কিনা।

রাত্রি এগিয়ে আসছে।

চে বলল, ইনজিন বন্ধ করে দাও। কম্পাস ঠিক রেখ।

হাল শক্ত করে ধর। ভাসতে ভাসতে যতটা পারি এগিয়ে যেতে চাই।

রাতের বেলায় বোট যদি চলে তা হলে আমরা এগিয়ে যেতে, এমন কি পৌঁছেও যেতে পারি।

আজ নয় বন্ধু। আজ আমরা অনেক দূরে আছি। আমরা রাতের বেলায় অন্ধকার কূলে ভিড়তে চাই। আজ রাতে তা হবে না। নৌকা এগিয়ে নিয়ে কম করেও পঞ্চাশ মাইল দূরে কাল সন্ধ্যার সময় পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকা দরকার। দিনের বেলায় কিউবার জমিতে পা দেব না। মাঝ রাতে পঞ্চাশ মাইল দাঁড় টেনে আমরা গিয়ে নামব কিউবাতে।

যুক্তি মেনে নিয়ে সবাই দাঁড়ে হাত দিয়ে বসল।

আকাশে হঠাৎ মেঘের আনাগোনা শুরু হল। সমুদ্র স্তব্ধ। বাতাস নেই। তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র হঠাৎ শান্ত হতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ঝড় আসছে ডাক্তার।

তাই তো মনে হচ্ছে। বোটকে রক্ষা করার সব ব্যবস্থা করা দরকার।

সে সবের কোন চিন্তা নেই।

কথা শেষ হবার আগেই শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেল। সবাই বলল, তুফান আসছে।

বাতাসের ধাক্কাটা মাইল খানেক দূর দিয়ে বয়ে গেল। তার সামান্য ধাক্কা লাগল বোটে। সমুদ্রের জল তখন ফেঁপে উঠেছে। ঢেউয়ের ওপর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বোট একবার ঢেউয়ের ওপর উঠছে, আবার ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে আসছে।

উরবানোর চোখ রয়েছে কম্পাসে। দুজনে হাল ধরে বোটকে স্থির রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত।

চে কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানছে। তার হাতে একখানা বই।

মাঝে মাঝে জলের ঝাপটা এসে লাগছে। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ রেখে ধ্যানস্থ। একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, আর আধঘণ্টা।

কি আধঘণ্টা ?

আধঘণ্টা লড়াই করতে পারলে প্রকৃতিও হার মানবে। ঝড় থামবে। বৃষ্টি নামবে। আমাদের জলের অভাব পূরণ হবে।

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

সত্যিই ঝড় থামল দশ পনের মিনিটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি নামল। সবাই তখন বৃষ্টির জল ধরতে ব্যস্ত। সবাই ভুলে গেল কিছুক্ষণ আগে তারা লড়াই করেছে প্রকৃতির সঙ্গে। কেউ কেউ মুখ খুলে বৃষ্টির জলে গলা ভেজাতে থাকে। কেউ গায়ের জামা খুলে ভাল করে স্নান করে নিল ঐ প্রবল বর্ষণে।

রাত এগিয়ে চলেছে।

ডাক্তার খাবে না ? জানতে এল একজন সহকর্মী।

তোমাদের খাওয়া হয়েছে ?

সবাই এক সঙ্গেই খাব।

না। তোমাদের খাওয়া শেষ হলে তারপর আমি খাব।

সবার খাওয়া শেষ হলে ডাক্তার কয়েক টুকরো রুটি আর কিছু হ্যাম খেয়ে এক গেলাস জল খেল।

আজ রাতে কতটা এগোলাম তার হিসাব রেখ। সামনেই মার্কিনের নৌ-বহর, তাদের গোয়েন্দা বোট। সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে আমাদের নামতে হবে। খুব সতর্ক থাকতে হবে।

উরবানো অনেক দূরে লক্ষ্য করে বলল, ঐ আলোটা কিসের ?

বোধহয় জাহাজের। আরও এগিয়ে না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না, হয়ত বাতিঘর। চোখটা ওদিকেই রেখ। যদি জাহাজ হয় তা হলে বোটের গতিমুখ বদল করতে হবে।

শুধু শোনা গেল 'আচ্ছা'। তারপর সব চুপচাপ।

রাত শেষ হতে চলল।

দাঁড়িরা বিশ্রাম নিতে গেল। তাদের জায়গায় এসে বসল আরেক দল। হাল ধরবার লোকও বদল হল। তখনও জেগে রয়েছে চে। তার দৃষ্টি বহু দূরে। উরবানো লক্ষ্য করছিল সেই আলোটা। সে-ও ঘুমে ঝিমিয়ে পড়েছে। কখন যে সে ঘুমিয়েছে তা জানা যায়নি। তার নাকের ডাকে টের পাওয়া গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে একটা তক্তায় হেলান দিয়ে। চে একবার তাকিয়ে দেখে হাসল। এদের ত্যাগ তার নিজস্ব ত্যাগের চেয়ে মোটেই কম নয়। জীবনের সব কিছু পরিত্যাগ করে দেশের জন্য এইভাবে সংঘাত চালিয়ে যারা এগিয়ে চলেছে তাদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ রয়েছে ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারার। মৃত্যুর সঙ্গে পান্‌জা লড়তে যারা সব সময়েই প্রস্তুত, তারা কিন্তু মানুষের কোন অবস্থা থেকে মোটেই আলাদা নয়। তারাও রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে নিজেদের আচ্ছন্ন করেছে, কখনও মানবতাবোধ থেকে দূরে সরে যায়নি।

চে তাকিয়ে দেখল, আকাশে আর মেঘ নেই।

শেষ রাতের চাঁদ উঠেছে। খোলা সমুদ্রের বুকে আলোর ঝলমলানি। কোথাও মানুষের কোন চিহ্ন নেই। কোথাও নেই কোন জাহাজ অথবা জাহাজী মানুষ। আকাশে কোন বিমানও নেই। এমন সুন্দর রাত্রি বোধহয় অনেকদিন দেখেনি চে। কেমন একটা উদাস মনোভাব নিয়ে চুপ করে বসে চুরুট টানতে লাগল।

আবার সকাল হল। আবার ইনজিন চালু হল।

তেল কতটা আছে ?

তা আটশ' মাইল চলার মত তেল এখনও আছে।

কত নট্‌ চলছি ঘণ্টায় ?

তা দশ থেকে বার।

আজ রাতে কিউবার উপকূলে পৌঁছতে পারব মনে হচ্ছে।

রেডিওটা খুলে দাও। কিউবার সংবাদ পেতে পারব মার্কিন স্টেশন থেকে। খবর দেবার সময় বোধহয় হয়েছে।

রেডিও খুলে দিল।

সংবাদ সামান্য।

ফিদেল কাস্ত্রোর গোরিলাবাহিনী পর্যুদস্ত করতে বাতিস্তার সেনাবাহিনী সর্বাত্মক তৎপরতা আরম্ভ করেছে। দস্যুদের অনুসন্ধান করতে প্রতিটি গ্রামে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সরকারী ফৌজ। দস্যুদলের অন্যতম কামিলো অস্ত্রশস্ত্র ফেলে রেখে পালিয়েছে। পেছনে পড়ে রয়েছে একদল দস্যুর মৃতদেহ।

মিথ্যা, সব মিথ্যা। বলে উঠল উরবানো।

চে চুরুটে টান দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, প্রচার। প্রচার মগজ ধোলাই করে। যত বেশি প্রচার চালাবে, তত বেশি জনমনে ওদের প্রতি আস্থা জন্মাবে। এই বিশ্বাস নিয়েই ওরা মিথ্যা প্রচার করে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেকেই সেনাপতি। একক সংগ্রামেও যেমন তার অস্ত্র ও বুদ্ধিমত্তা কাজ করে, তেমনি সংঘবদ্ধ আক্রমণেও। যুদ্ধে যেমন জয়লাভের জন্য সর্বপ্রকার কৌশল ব্যবহার করা হয়, আমাদের এই যুদ্ধেও তেমনি সর্বপ্রকার কৌশল ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে শত্রুর দুর্বল স্থানগুলো। বিশেষ করে সংবাদ সংগ্রহে আমাদের বিশেষ তৎপর হতে হবে। প্রত্যেকটি পুরুষ ও নারীকে এই কাজ করতে হবে। বিশেষ করে নারীরা সংবাদ সংগ্রহে বেশি সক্ষম। তাদেরই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের রক্ষা করতে হবে গোপনীয়তা। দরকার হলে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হবে। হঠাৎ আক্রমণ করে লণ্ডভণ্ড করে দিতে হবে শত্রুদের। ওদের মিথ্যা প্রচারকে আমরা মূল্য দিই না। কিন্তু শত্রু যেন আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে মোটেই সজাগ না থাকে। আমরা প্রত্যেকে এক একটি বাহিনী। আমাদের রসদ নিয়ে চলতে হবে না, আমাদের ছুটতে হবে না অপরের সাহায্য নিতে। আমরা

নিজেকে নিজে সাহায্য করব। সুযোগমত আঘাত হানব শত্রুকে। চারিদিক থেকে আমরা যদি তাদের পঙ্গু করে দিতে পারি তা হলে বৃহত্তর সংঘর্ষের দিকে সাফল্যজনকভাবে অগ্রসর হতে পারব।

কথা বলতে বলতে চে উত্তেজিতভাবে বলল, ইনজিন বন্ধ কর। ভাল করে দেখতো, দূরে ভূমিরেখা দেখা যাচ্ছে বোধহয়।

সবাই দূরবীণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বলল, হাঁ।

কম্পাস দেখ। আমরা ঠিক পথে এসেছি কিনা ভাল করে দেখে নাও।

হাঁ। আমরা কিউবার কাছে এসেছি। মনে হয় বিশ-পঁচিশ মাইলের মধ্যেই আছি।

এখানে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সারাদিন। রাতের বেলায় চুপিচুপি দাঁড় বেয়ে আমরা উপকূলে নামবার জন্য চেষ্টা করব।

রাত একটা।

চারিদিক নিস্তব্ধ। উপকূলের কোথাও কোন আলোর চিহ্নও নেই। আকাশে ভাঙা-ভাঙা মেঘ। বোট চুপিচুপি জমির গায়ে আলতোভাবে গা দিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বোট খালি।

যে যার মত নিজের পথ ধরল। বাইরের কোন লোক দেখলে বুঝতেও পারবে না যে, এরা একই দলভুক্ত লোক। যেন কেউ কাউকে চেনে না। এমনি তাদের হাবভাব, আচরণ। অন্ধকারে পাইনের ঝোপে মিলিয়ে গেল সবাই।

উপকূল থেকে সাত আট মাইল ভেতরে একটা কুটিরের দরজায় মৃদু আঘাত করল একজন।

প্রহরী সজাগ।

পেছনে রাইফেল উঁচিয়ে প্রহরী।

প্রশ্ন করল, কে তুমি ?

আমি চে গুয়েভারা।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে আলো জ্বেলে দেখে নিল আগন্তুকের মুখ। বলল, লাল সেলাম। তারপর পথ ছেড়ে সসম্মানে যেতে দিল ভেতরে।

তাহলে তোমার দলবল নিয়ে এসে গেছ ? প্রশ্ন করল কামিলো।

হাঁ।

পনরটা দিন কি উৎকণ্ঠায় যে ছিলাম ! রোজই ভাবি তুমি আসবে। এখানের কাজ এখনও অসমাপ্ত। তবে বাতিস্তার আর দেরী নেই। মনে হয়, মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হবে না। কয়েক সপ্তাহ মাত্র। তা শরীর কেমন ?

হাঁপানীটা বড়ই উৎপাত করছে। নইলে ভালই আছি। হাঁপানীর দাপটে মাঝে মাঝে বেশ কাবু করে। তখন মনে হয় কোন কাজ না করেই বুঝি মরতে হবে। তাও যদি শত্রুর গুলীতে মরতাম তাতে দুঃখ হত না। এ যে কি ব্যাধি ! ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা এই ব্যাধির লক্ষণ দেখে বেশ চিন্তিত হয়েছিলেন। তাই তো ডাক্তারী পড়তে দিয়েছিলেন। কিন্তু অপরের রোগ যে নিরাময় করতে পারে না, তার পক্ষে নিজের রোগ নিরাময় করা বেশ তামাসার ব্যাপার। কটা ইনটার ভেনাস ইনজেকসন দিলে বেশ কিছুকাল ভাল থাকি, আর কিছু বড়ি তো থাকেই আমার পকেটে। যখনই কষ্ট অনুভব করি, তখনই একটা গালে ফেলে দিই। বড়ই বিষাক্ত ওষুধ। জীবনীশক্তি বেশ নষ্ট করে দেয়। তা তোমার খবর কি ?

কাজ চলছে। তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে না ?

চে মৃদু হেসে বলল, য়্যালাইদার সঙ্গে দেখা করা আমার নৈতিক ধর্ম।

কামিলো দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আহা বেচারী !

তুমি এ কথা বলছ কেন কামিলো ? তোমার মত ত্যাগী যোদ্ধার মুখে এ কথা সাজে না।

জানি। আমাদের মত লোকের সঙ্গে যারা বিয়ে করে তারা সত্যিই দুর্ভাগা।

না। আমরা যাদের বিয়ে করেছি, তাদের তো শুধু যৌন অভিলাষ পূরণ করতে অথবা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে দেবার জন্য বিয়ে করিনি। আমাদের যারা বিয়ে করেছে, তাদের সঙ্গে মতবাদে আমরা এক ও অভিন্ন। আমাদের সুখ তাদের সুখ, আমাদের দুঃখ তাদের দুঃখ। আমাদের জীবনসঙ্গিনী যে আমাদের কর্মসঙ্গিনী, সে কথা ভুলছ কেন ? আমাদের যে বিরহ তা আমরা হাসি মুখে সহ্য করতে পারি। বিরহ ও মিলন উভয়ই আমাদের গা-সহা দুটো ঘটনা মাত্র। এর কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যা আমাদের কাছে নেই, কোন কাব্যময় অভিব্যক্তিও নেই।

কামিলো বলল, তোমার কথা স্বীকার করি, কিন্তু মেয়েদের নিজস্ব একটা ধর্ম আছে।

নিশ্চয় আছে। কিন্তু পরাধীন দেশে মেয়েদের স্বামীর মুক্তি-যুদ্ধের সহচরী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম নেই। যে দিন দেশ থেকে অর্থাৎ গোটা লাতিন আমেরিকা থেকে অত্যাচারীদের নির্মূল করতে পারব, সেদিন মেয়েরা তাদের অন্য ধর্ম পালন করবে। সেদিন বহু দূরে নয়।

তোমার বড় ছেলে বেশ দৌড়াদৌড়ি করতে পারে। ছোটটা অবশ্য এখনও মায়ের বুকে মুখ গুঁজেই থাকে, কিন্তু বড়টা যেন তোমার প্রতিচ্ছবি, প্রাণ চঞ্চল।

দু একদিনের মধ্যে সময় করে একবার দেখা করব।

কয়েক দিন বিশ্রামও তো করতে পার ?

এখন কি বিশ্রাম করার সময় ?

ন্যায়ত সময় নয়, তবুও সে তোমার পথ চেয়ে তো থাকে।

ছ'সাত মাস তোমার সঙ্গে তার দেখাই হয়নি। আবার কবে দেখা হবে তা কে বলতে পারে!

আমার বিষয় তো শেষ, এবার তোমার কথা বল। এই পনের-বিশ দিন কতটা অগ্রসর হতে পেরেছ, সেটা আমার জানা দরকার।

ফিদেল আশা করছে, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাতিস্তার পতন ঘটবে।

কি করে বুঝলে?

কামিলো হাসতে হাসতে বলল, রাত শেষ হবার উপক্রম। একটু গরম চা কিম্বা কফি, কিম্বা কোকোর ব্যবস্থা করি। তারপর টানা ঘুম দাও কয়েক ঘণ্টা। ঘুম ভাঙলে কথা হবে। ভয় নেই, এই বাড়িটা মোটামুটি নিরাপদ। একশত বর্গ মাইলে বাতিস্তার কোন অস্তিত্ব নেই।

খুব ভাল কথা।

কামিলো উঠে স্টোভ ধরিয়ে জল গরম করে কোকো আর শুকনো দুধ গুলে এক গেলাস এনে দিল চে-কে। গেলাসটার দিকে তাকিয়ে থেকে চে বলল, এত খাবার পাচ্ছ কোথায়?

ঠিক পাচ্ছি না। আজই পেয়েছি। একজন কমরেড দিয়ে গেছে। দেখলাম দশ-পনর দিন বেশ চলে যাবে দশ-পনর জনের। সেই খাবারগুলো জমা আছে, এই প্রথম তোমাদের জন্য ব্যবহার করলাম।

কোকোর গেলাস শেষ করে চে চুরুট ধরিয়ে কামিলোর পাশে শুয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। কামিলোও ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ দরজায় আওয়াজ হতেই লাফিয়ে উঠল কামিলো। মাথার কাছে রাইফেল ছিল। উঠে বসেই রাইফেল তুলে নিয়ে কান খাড়া করে বসে রইল।

আবার আওয়াজ শোনা গেল।

বাইরে প্রহরীর গলা।

ফিদেলের পত্র।

প্রহরী প্রবেশ করল ঘরে। পত্রখানা এগিয়ে দিল।

পত্রখানা পাঠ করে উৎফুল্ল হল কামিলো।

তখনও সকাল হয়নি। জিপ অপেক্ষা করছে দূরে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিল কামিলো। চে তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তাকে ডাকবার প্রয়োজন ছিল না। প্রহরীকে বলল, হাভানার উপকণ্ঠে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। চে যেন তার কাজে এগিয়ে যায়, আমার জন্য অপেক্ষা না করে।

সকালের আলো ফুটবার আগেই কামিলোর জিপ ছুটল।

হাভানার উপকণ্ঠে যেখানে এসে পৌঁছুল, সেখানে গভীর জঙ্গল। জনমানবের কোন চিহ্ন নেই। কদিন আগে বেশ লড়াই হয়ে গেছে সেখানে। তার চিহ্ন তখনও কিছু কিছু বর্তমান।

জিপ ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে চলল কামিলো।

সামনেই বিরাট একটি গর্তে উল্টে পড়ে আছে একটা ট্যাঙ্ক। চোরা রাস্তায় মুক্তিফৌজের সঙ্গে লড়তে এসে ট্যাঙ্ক ঘায়েল হয়েছে, এ তারই চিহ্ন।

আরো এগিয়ে চলল কামিলো।

মেয়েদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

শব্দ লক্ষ্য করে এগোতে থাকে কামিলো। বনে ঢাকা পড়েছে আকাশের আলো। নিজের পায়ের শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ বিশেষ নেই। এগোতে এগোতে থামল একটা গাছতলায়। কিছু নিশানা দেখে চুপ করে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে ডাকল, ফিদেল।

কোন আওয়াজ শোনা গেল না। জবাব দিল না কেউ-ই।

আবার ডাকল, ফিদেল, আমি কামিলো, আমি কামিলো সিয়েনফুয়েগস।

শুকনো পাতার ওপর শব্দ হল মানুষ চলাচলের।

কামিলো গাছে পিঠ দিয়ে রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

অলক্ষ্যে তার সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাদাম জুয়ান। বলল, এস কমরেড।

প্রশ্ন না করে মহিলার পেছন পেছন কামিলো বনপথ ধরে ধীরে ধীরে হাজির হল একটা সুরঙ্গমুখে। কামিলোকে দেখেই ফিদেল এগিয়ে এসে জাপটে ধরল বুকের সঙ্গে। অনেক দিন পর দুই বন্ধুতে দেখা। পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করতেই ডেকে এনেছে তাকে।

তোমার কথা বল। নতুন খবর কিছু আছে ?

ডাক্তার আরসেনতো চে গুয়েভারা কাল রাতে গুয়েতেমালা থেকে এসেছে।

তাকে আনলে না কেন ?

ইচ্ছা ছিল। ছ'দিন বোটে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে খুবই ক্লান্ত মনে হল তাকে। ক'দিন ঘুমোয়নি। তাই তাকে একটু বিশ্রাম করতে দিলাম। দরকার হলে এখনি জিপ পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিম্বা চল, আমরা দুজনেই সেখানে যাই। আমাদের শলাপরামর্শ করার মত ঐটেই হল নিরাপদ স্থান।

তাই চল কামিলো। কিছু খেয়ে নাও। পেড্রো বন্ধু, ম্যাদাম জুয়ান, কিছু খাবার দিতে পার আমাদের দুজনকে। হাঁ। পেট্রল আছে তো ? ঠিক আছে, তা হলে খেয়ে নেওয়া যাক।

দখল করতে হবে একটি বিমানঘাঁটি। বিমান না হলে এগোন যাবে না তাড়াতাড়ি। এই আক্রমণে শত্রুর বিমানসংখ্যা কমবে, বিমানঘাঁটিও নষ্ট হবে। শত্রু এই বিমানঘাঁটি থেকে আমাদের আর আক্রমণ করতে পারবে না। তারপর সুযোগমত দু'চারটে বিমান দখল করে আমাদের ঘাঁটিতে নিতে পারলে শত্রুর গতিবিধি জানার পক্ষে খুব সাহায্যও হবে।

একটা বিমানঘাঁটি দখল করলেই তো হল না বন্ধু, বলল চে।

একটা একটা করেই দখল করতে হবে।

দখল করার কথা ভুলে যাও এখন। এখন একই সঙ্গে তিন-চারটে বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে তা অকেজো করে দিতে চাই। যত বেশি ওদের বিমানঘাঁটি নষ্ট হবে, ততই আমাদের কাজের সুবিধা। ওদের বিমান যতই থাকুক, ঘাঁটি না থাকলেই কাবু।

এতে বহু প্রাণহানি হবার সম্ভাবনা।

মোটেই নয়। প্ল্যান ঠিক থাকলে মোটেই প্রাণহানি ঘটবে না। শত্রুরা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে না। তাই ওদের লক্ষ্য অব্যর্থ হবে না, আমাদের লক্ষ্য হবে অব্যর্থ।

কামিলো সমর্থন করল।

ফিদেলও সমর্থন করল।

তিনটি দলের তিনজন দায়িত্ব নিল।

সপ্তাহ পার হয়নি।

পৃথিবীর সকল সংবাদপত্রে এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের সংবাদ বের হল। বাতিস্তার সব চেয়ে শক্তিশালী তিনটি বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে অকেজো করে দিয়েছে গোরিলাবাহিনী।

সংবাদ গোপন করার সব চেষ্টা করেছিল বাতিস্তার মুরুব্বী মার্কিন সরকার, কিন্তু তা পারেনি। বিদেশী সংবাদদাতারা সংবাদ ছড়িয়েছে অবশ্য অতি সতর্কতার সঙ্গে। যার গণিতার্থ হল, বাতিস্তার শক্তিহানি ঘটেছে প্রভূত।

ফিদেলের প্রধান কার্যালয়ে সেদিন হিসাব-নিকাশ করছিল তিন বন্ধুতে। চে বেশ জোর দিয়েই বলল, কত প্রাণহানি হয়েছে?

এক।

জখম?

ছয়।

তা হলে আমার হিসাব ঠিক। আর শত্রুর ক্ষতি হয়েছে তিন

স্কোয়াড্রন বিমান, আর তার চালকসহ বোমাবর্ষণকারী যুদ্ধবাজ কয়েক শত। এই সাফল্যের গৌরব কামিলোর।

কেন? জিজ্ঞেস করল কামিলো।

কারণ তুমি সর্বাধিক কঠিন স্থানটি আক্রমণ করেছিলে এবং অতি অল্প সময়ে তাতে আঘাত করতে পেরেছ। এর জন্য আমাদের সব অভিনন্দন তোমার প্রাপ্য।

না, সবারই সমান প্রাপ্য। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেকটি সেনাবাহিনীর সমান অধিকার আছে এই গৌরব লাভের। মাত্র আটজনের এক একটি বাহিনীর পক্ষে এই জয়লাভ হল গোরিলা ষ্ট্রাটেজির বিরাট সাফল্য। কিউবার মানুষ চিরকাল স্মরণ করবে এই কীর্তিকে।

তোমার বিশ্রাম দরকার চে। বলল ফিদেল কাস্ত্রো।

বিশ্রামের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না বন্ধু। পরবর্তী প্ল্যানকে কার্যকরী করার দিকে নজর দিতে হবে। যতদিন লাতিন আমেরিকার মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন বিশ্রাম হল পাপ।

চে চুরুট ধরিয়ে ম্যাপের ওপর নজর রাখল।

কিন্তু তাকে কয়েকদিনের জন্য ফিরে যেতে হল তার সাময়িক আস্তানায়। গৃহে ফিরে দেখে গৃহ খালি। য়্যালাইদা ঘরে নেই। শিশুপুত্র দুটিকে সহকর্মীনীর হেফাজতে রেখে কোথায় গেছে। চে-কে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যাদাম লুজান বলল, তোমার মঙ্গল কামনা করি ডাক্তার। এই তোমার দুই সন্তান।

ছেলেদের ঠেলে দিল সে চে-র দিকে। শিশুরা বাবাকে চিনতেও পারল না বোধহয়। তারা অবাক হয়ে পিতার দিকে তাকিয়ে জড়সড় হয়ে ম্যাদাম লুজানের কোল ঘেঁসে দাঁড়াল। চে মনে মনে হাসল। সত্যিই তো সন্তানদের জন্য সে কিছু পরিচয় রেখে যায়নি।

চে এগিয়ে গিয়ে শিশুদের কোলে টেনে তুলতেই তারা কেঁদে

উঠল। কান্নার শব্দ বাইরে থেকেও শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় গলা শোনা গেল, বেবিরা কাঁদছে কেন ম্যাদাম লুজান ?

লুজান কোন উত্তর দেবার আগেই ঘরে ঢুকল ম্যাদাম য়্যালাইদা মার্চ চে গুয়েভারা।

দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক। শিশুরা তখনও কাঁদছে। হাতের ব্যাগ মেঝেতে রেখে য়্যালাইদা ছুটে গিয়ে চে-র বুকে মাথা রেখে সলজ্জভাবে বলল, তুমি এসেছো !

চে অতি সন্তর্পণে য়্যালাইদার মুখ উঁচু করে গভীরভাবে চুম্বন করে বলল; হাঁ।

য়্যালাইদা মৃদুস্বরে বলল, তুমি যখন থাক না এখানে, তখন একটা শিহরণপূর্ণ আনন্দ জাগে মনে। তখন মনে হয়, যে কোন সময় তুমি আসতে পার। আমি অধীরভাবে সেই যে কোন মুহূর্তের প্রতীক্ষা করি। আর যখন ফিরে আস, তখন শুধু ভয় আর ভয়। কখন্ যে আবার তুমি চলে যাবে !

আমাদের যে অনেক কাজ য়্যালাইদা।

জানি। আমি তো তোমাকে কখনও বারণ করিনি। আমি যে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাজ করে চলেছি, তা বুঝি তুমি জান না।

না জানলেও বিশ্বাস করি।

য়্যালাইদা শিশু দুটিকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, তুমি জামা কাপড় খুলে বস, আমি খাবারের যোগাড় করি। তোমাদের কাজের ফিরিস্তি ও ফলাফল দেখেছি। আর বোধহয় কিউবাকে কষ্ট করতে হবে না। বাতিস্তা এবার পালাবার পথ খুঁজছে।

সে রাতটা কেটে গেল সেই পর্নকুটিরে স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি শুয়ে। অনেকদিনের সঞ্চিত অনেক কাহিনী নিয়ে আলোচনা করতে করতে সকাল হয়ে গেল। স্বামীর বুকে মুখ রেখে য়্যালাইদা ঘুমিয়ে পড়েছিল। শিশুরা পাশেই কম্বলের ওপর শুয়েছিল। চে-র

ঘুম ভাঙতে দেরী হয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই লাফিয়ে উঠে জামাকাপড় বদলে ম্যাদাম লুজানকে ডাকল।

একটু গরম কিছু খাওয়াতে পার ম্যাদাম?

নিশ্চয় পারি।

চে চুরুট ধরাল। চুরুটে টান দিতেই আবার কাশি শুরু হল। ক'দিন কাশির দমক ছিল না বলেই কাজ করার অসুবিধা হয়নি, আজ বুকের মধ্যে ঘর্‌ঘর্‌ করে উঠতেই আবার কাশি শুরু হল। কাশির শব্দ শুনে য়্যালাইদা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল বিছানা থেকে।

চে তখন হাঁফাচ্ছে। চোখ দুটো লাল হয়েছে। মনে হচ্ছে অক্ষিগোলক দুটো ছুটে বের হতে চাচ্ছে। য়্যালাইদা ছুটে গিয়ে অলিভ অয়েলের শিশিটা নিয়ে এসে চে-র বুকে মালিশ শুরু করল।

চে বাধা দিয়ে বলল, একটু জল দাও য়্যালাইদা।

য়্যালাইদা দৌড়ে এক কাপ জল এনে দিতেই পকেট থেকে একটা বড়ি বের করে মুখে ফেলে দিল চে। কাপের জলটুকু নিঃশেষে খেয়ে বলল, আর দরকার হবে না। মিনিট কয়েক চুপ করে বসে থাকতে দাও।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চে মোটামুটি সুস্থ হল। ম্যাদাম লুজান এক বাটি গরম জলে কোকো গুলে এনে দিল, সঙ্গে ক'খানা বিস্কুট। চে নির্বিকারভাবে কোকো আর বিস্কুট খেয়ে য়্যালাইদার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আজই ফিরতে হবে য়্যালাইদা।

তোমার কর্তব্য তুমি করবে।

তুমি বাধা দেবে না?

কেন বাধা দেব? তুমি তো অন্যায় কাজ করছ না। মহৎ কাজে যে বাধা দেয়, সে সত্যিসত্যি স্ত্রী হবার যোগ্য কি? আমি তা পারি না, পারবও না। বরং বলে যাও, কোন্‌ অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। আমি তা করব।

চে য়্যালাইদাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলাতে

বুলাতে য়্যালাইদার কপালে চুমু দিল, শিশুদের দুই হাঁটুর ওপর বসিয়ে আদর করল। তারপর রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। যাবার সময় বিদায়সূচক কোন কথাই বলল না। য়্যালাইদা দরজায় দাঁড়িয়ে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। যখন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল চে, তখন রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ছোট ছেলেটাকে বুকের সঙ্গে জাপটে ধরল।

দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল ম্যাদাম লুজান। সেও এই বিদায়-দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছিল। চে-কে আর যখন দেখা গেল না, তখন ম্যাদাম লুজান এসে য়্যালাইদার হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গেল।

চে ফিরে এল নিজের কর্মস্থলে।

ভীষণ উত্তেজনা মুক্তিসেনাদের মাঝে। সাফল্য তাদের উৎসাহিত করেছে, কাজে প্রেরণা জুগিয়েছে। তারা অধীর হয়ে উঠেছে পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করতে।

আজকের সভায় কিউবার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু কর্মী পুরুষ ও নারী সমবেত হয়েছে। প্রত্যেকেই মুক্তসেনার অংশীদার। প্রত্যেকেই আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত।

ফিদেল বলল, আমাদের কর্মপন্থায় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হল সামরিক অবস্থার বিশ্লেষণ। আমরা যে উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছি, শত্রুর শক্তিকে তুলনামূলক বিচার করে দেখতে হবে, আমরা কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি। বন্ধুগণ, আজ আমরা যে গুরুদায়িত্ব মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছি, তার কতকগুলো দিক বিবেচনা না করলে আমাদের সাফল্য বিঘ্নিত হবে। আমাদের আঘাতের পর আঘাত দিতে হবে শত্রুকে। শত্রুকে ঘুমবার সময় দেওয়া হবে না। তাদের মনে এই আতঙ্ক যেন সৃষ্টি করতে পারি যা থেকে তাদের মনে হবে, আমরা সব সময় তাদের বৃত্তাকারে ঘিরে রেখেছি। আমাদের আঘাত চলতে থাকবে, আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করে

শত্রুকে নির্মূল করতে হবে। যে সব স্থান দুর্গম, সে সব স্থানে আমাদের আঘাত চলবে দিবারাত্র। যে সব জায়গায় শত্রু সহজে আসতে পারে, সে সব জায়গায় আঘাত করতে হবে রাত্রিতে। কিন্তু আমাদের এই সব কাজ করতে হলে জনতার পূর্ণ সহযোগিতা চাই। জনতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, তাদের মঙ্গল সাধনের জন্যই আমাদের এই সাধনা।

ফিদেল থামতেই চে গুয়েভারা উঠে দাঁড়াল।

বলল, ছাপান্ন সালের নভেম্বর মাসের দিনগুলোর কথা তোমরা ভেবে দেখ। অন্তত সেদিনের সেই মুক্তিবাহিনীর যারা জীবিত যোদ্ধা, যারা এখানে উপস্থিত আছ, তারা চিন্তা করে দেখ। সেদিন আমরা ছিলাম মাত্র আশীজন। আমরা প্রস্তুত হবার আগেই শত্রুরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করেছিল। আশীজনের মধ্যে জীবিত ছিলাম মাত্র বারজন। তার মধ্যে ফিদেল, আমি ও কামিলো এখানে উপস্থিত। বাকি ন'জনের অন্তত সাতজন এখনো আমাদর সেই দুর্ভাগ্যের সাক্ষ্য বহন করতে পারবে। আমরা অগ্রসর হতে পারিনি। তখন নিরাপত্তার জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা পালিয়ে বেড়িয়েছি। অবশেষে আশ্রয় পেলাম সিয়েরা মায়েস্ত্রাতে। সিয়েরাতে আমাদের কর্মকেন্দ্র গড়ে আমরা মরণপণ যুদ্ধে নেমেছিলাম। বিগত দু' বছরে আমরা সাফল্যের পথে অনেকটা এগিয়েছি। শেষ আঘাত হানার সময় এসেছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, কোথায় কোথায় এবং কি ভাবে আমরা ভুল করেছি। সেই ভুল সংশোধন করতে আমাদের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আবার যাতে কেউ সেই সব ভুল না করে, তার জন্য আমরা সতর্ক হয়েছি।

কামিলো বলল, বন্ধুগণ, আমাদের উচিত সব বিষয়ে গোপনীয়তা রক্ষা। আমাদের কাজ করতে হয় কৃষক এলাকায়। কৃষকের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আমাদের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের

মনে দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি করা উচিত। যখন আমাদের লড়াই চলবে, তখন যেন তারা আমাদের সাহায্য করে। বিপ্লবকে এগিয়ে দিতে তারা সংবাদ, মালপত্র বহন করবে। তাদের বলতে হবে, তোমরা দেখবে, শুনবে কিন্তু কাউকে বলবে না কিছু। এই ভাবে যদি জন-সংযোগ ও সংগঠন গড়া যায়, তা হলে তাদের ধর্মঘটের পথে এগিয়ে নিতে পারব। যে কোন সময় তারা ধর্মঘট করে প্রতিক্রিয়াশীলদের সর্বপ্রকার প্ল্যান ভেস্তে দেবে। গৃহযুদ্ধের বড় হাতিয়ার ধর্মঘট। শ্রমিকশ্রেণী ধর্মঘট করে কৃষকশ্রেণীর সশস্ত্র বিপ্লবকে সাহায্য করে। ফ্যাসীবাদী শাসকদের কর্মকেন্দ্র শহরে। শহরের জীবন যদি ধর্মঘটের মাধ্যমে স্তব্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে পল্লী অঞ্চলের তৎপরতা বেশী শক্তিশালী হবে। শহরের জীবনকে পঙ্গু করলে সামরিকশক্তি পঙ্গু হবে, কলকারখানা অচল হবে। আলো-জল-চলাচল ব্যবস্থা স্তব্ধ হলেই আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা এগিয়ে চলতে পারবে লক্ষ্যস্থলের দিকে। তবেই আমাদের অধিকৃত অঞ্চলের পরিধি বিস্তৃত করতে পারব। পরিধি বিস্তৃত হলে আমাদের মুক্তিফৌজ আরও বেশি কাজ করার সুযোগ পাবে।

ম্যাদাম এল-পেলাও উঠল সবার শেষে। বলল, আমাদের অস্ত্র-ভাণ্ডার হল শত্রুর অস্ত্র-ভাণ্ডার। যেখানেই শত্রুকে আমরা ঘায়েল করতে পারব অথবা শত্রুদের বন্দী করতে পারব, আমাদের প্রধান কাজ হবে শত্রুর গোলাবারুদ হস্তগত করা। বন্দীদের পাঠিয়ে দিতে হবে নিরাপদ এলাকায়। সসম্মানে তাদের গৃহে ফিরে যেতে দিতে হবে। আমাদের কোন কমরেড যদি প্রাণ হারায় যুদ্ধে, আমাদের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল তার অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদ করা। তারপর প্রয়োজন ও সুযোগমত তাকে সমাহিত করা। কোন কারণেই একটি কার্তুজ বা একটা বন্দুক যেম শত্রুর হস্তগত না হয়। আমাদের শক্তির উৎসমুখ শুকিয়ে যাবে, যদি আমরা অস্ত্র-সংগ্রহ করতে না পারি, অথবা আমাদের অস্ত্র শত্রুর হাতে পৌঁছায়।

বাধা পড়ল ম্যাদাম এল-পেলাওয়ের কথায়। বাইরে থেকে সিগন্যাল এল। সংবাদবাহক উপস্থিত।

ডেকে পাঠান হল সংবাদবাহককে।

ফিদেল উঠে পায়চারি করতে করতে বলল, নতুন কোন সংবাদ আছে কমরেড ?

আছে। শত্রুর ধারণা আমরা সমুদ্র-উপকূলবর্তী স্থানকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছি। সেজন্য নৌ-সেনারা জাহাজ থেকে কামান দাগছে।

ফিদেল হাসল।

কামিলো বলল, মূর্খ।

চে বলল, ঘটনা গোলমেলে মনে হচ্ছে। বাতিস্তা পলায়নের রাস্তা খুঁজছে। রাজধানীতে আঘাত করার সময় উপস্থিত। এবার মন তৈরী কর বন্ধুগণ।

শেষ আঘাত হানবার উপযুক্ত সময় কি উপস্থিত ? প্রশ্ন করল ম্যাদাম লা-পেলাও।

গোরিলাযুদ্ধের কোনটা উপযুক্ত সময় তা বিচার হয় কর্মক্ষেত্রে। আমাদের কৌশল তো একপথ দিয়ে একটি রুটিন মেনে নেবে তাতো নয় কমরেড। আমাদের কৌশল সব সময়ই পরিবর্তনশীল। আমাদের কৌশল হবে ঠিক কর্মক্ষেত্রের উপযোগী। শত্রুর কর্মপদ্ধতির সঙ্গে মোকাবিলা করার মত কর্মপদ্ধতি গ্রহণ হল বড় কৌশল। আমরা হলাম ধূমকেতু। কখন যে কোথায় উদয় হব, তা স্থির করার দায়িত্ব আমরা নিলেও তার কোন রুটিন থাকা সম্ভব নয়। আমরা সব সময়ই ফ্রন্ট বদল করে শত্রুকে ঘেরাও করে অবিরাম তাদের আঘাত করতে থাকব। আমাদের পালাতে হবে। যদি বুঝতে পারি, আমাদের বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে শত্রুরা, তখন পালান ও আত্মগোপন করা ভিন্ন দ্বিতীয় পথ নেই।

ফিদেল কাস্ত্রো থামতেই চে বলল, অনেক রক্তনদী সাঁতরে আমরা

পৌঁছেছি নদীর কিনারায়। এবার আমাদের যে কোন উপায়ে তীরে তরী ভেড়াতে হবে। তার জন্য যেখানে যেখানে শত্রুর শক্তিশালী ঘাঁটি আছে তাকে আঘাত করতে হবে। তার মধ্যে রাজধানী হাভানা অন্যতম। আমরা পাঁচ বা ছয়জন নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে এগোব। চেষ্টা করব শত্রুকে ঘিরে ফেলতে। সৈন্যবাহিনী আমাদের খবর পেলেই এগিয়ে আসবে। বহু দলের তু-একটা দলকে আক্রমণ করতে সচেষ্ট হবে, তখন পালিয়ে যেতে হবে। পলায়নের সময় পেছন পেছন এগিয়ে আসবে পেশাদারী সৈন্যরা। ঠিক সেই সময় অন্য দিকে আক্রমণ করে পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যদের ভ্রান্তি পথে নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে তাদের কর্মশক্তিকে পঙ্গু করা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে শত্রুকে পেছন থেকে আক্রমণ করে ঘায়েল করা সম্ভব হবে। সামরিক বাহিনী বার বার এইভাবে আক্রান্ত হলে ছুটোছুটি করবে, মুক্তিফৌজও দ্রুততার সঙ্গে একই উপায়ে সামরিক বাহিনীকে আক্রমণ করবে। মনে কর, আমরা ছয় জন, ওদের সংখ্যা ষাট জন। গুলী চললে কার ক্ষতি বেশি হবে? আমাদের গুলীতে কম করেও বিশ জন ঘায়েল হবে, ওদের গুলীতে বড় জোর তুজন। আমাদের যে পরিমাণ শক্তি নষ্ট হবে তার চেয়ে বেশি শক্তি হারাবে শত্রুরা। এইভাবেই রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে নানা দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ করতে হবে।

সেদিনের সভা শেষ হতেই সবাই নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে গেল। চে জিপে চেপে অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পথে হঠাৎ দেখা ম্যাদাম লুজানের সঙ্গে।

ম্যাদাম লুজান হাসিখুশী মেয়ে। য়্যালাইদার সঙ্গে খুব সৌখ্য। তার অতীত জীবন চে জানে। সেজন্য খুবই স্নেহ করে তাকে। গাড়ি থামিয়ে চে জিজ্ঞেস করল, কি খবর ম্যাদাম?

স্যাণ্টোপিনো যাচ্ছি ডাক্তার।

তুমি তো শুনলাম হাসপাতালের কাজ নিতে ব্যস্ত হয়েছ।

উপায় নেই ডাক্তার। আহত মুক্তিসেনার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাই। তুমি তো জান, আমার স্বামী বিনা চিকিৎসায় আহত অবস্থায় জঙ্গলে মারা গিয়েছিল। তার মৃতদেহটা শেয়াল-কুকুরে খেয়েছিল। তাই আমি এই কাজ নিতে চাইছি। তুমি নিজে ডাক্তার। তুমি নিশ্চয়ই জান, আহত সৈনিককে যদি একটা য়্যাসপ্যারিন বড়ি দিতে পারি, সে কতটা আরাম পাবে। সামান্য এই বড়ির অভাবে কি কাতর যন্ত্রণায় ওরা ছটফট করে তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

য়্যালাইদা কোথায়?

ঠিক বলতে পারি না। তার তো অনেক কাজ করার ছিল কিন্তু কিছুতেই নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারছে না। তোমার ছেলে দুটো পাহারা দিতে হচ্ছে।

ওঠ গাড়িতে। তোমাকে স্যান্টোপিনোতে পৌঁছে দেব।

ম্যাদাম লুজান গাড়িতে উঠে বসল।

আবার গাড়ি ছুটল।

চে জিজ্ঞেস করল, আমি চলে আসার পর য়্যালাইদা খুব কেঁদেছিল?

না। একবার মাত্র চোখ মুছতে দেখেছি।

কর্তব্য মানুষকে হৃদয়হীন করে। কি করব? তবে য়্যালাদার মত স্ত্রী না থাকলে আমি বোধহয় এই রুগ্ন দেহ নিয়ে এত কাজ করতে পারতাম না।

য়্যালাইদা বলে, তোমার মত স্বামী না থাকলে সমাজের সেবা করার প্রেরণালাভ করতে পারত না। তুমিই তাকে মহত্তের পথে নিয়ে এসেছ।

সবই সত্যি, কিন্তু য়্যালাইদা এই কষ্টকর জীবনে অভ্যস্ত নয়, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, ওকে এই বিপদসঙ্কুল জীবনে টেনে না আনলেই ভাল হত।

য়্যালাইদা বলে, তুমি ধনীর সন্তান। নিজে ডাক্তার। শুধু ঘরে বসে থাকলে মাসে দশ হাজার পেসোস উপায় করতে পারতে তুমি। তোমার বাবার সম্পত্তির অভাব নেই। অথচ তুমি সব পরিত্যাগ করে এই যে অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করেছ, এতেই তো তুমি বড়। আর সেই বড় বলেই য়্যালাইদা তোমাকে ভালবাসে গভীরভাবে।

ম্যাদাম লুজান গন্তব্যস্থল লক্ষ্য করতে করতে বলল, প্রায় এসে গেছি। সামনেই স্যাণ্টোপিনো। হাসপাতালটা সরিয়ে আনা হয়েছে অগ্রগামী ঘাঁটিতে।

বনের ধারে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ম্যাদাম লুজানকে নামিয়ে দিয়ে চে আবার গাড়ি ছেড়ে দিল। চে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক। মাঝে মাঝেই য়্যালাইদা ও শিশু-সন্তান দুটোর কথা মনে পড়ছিল। সাতান্ন সালের নভেম্বর থেকে উনষাট সাল অবধি বিরামবিহীন আঘাত করছে শত্রুকে। পেছনে থেকেছে তার ঘর, ঘরের ওপর কেমন সে মায়াহীন। য়্যালাইদা পেছনে টানার সামান্য চেষ্টাও কখনও করেনি। তাহলে যে কি হত তা বলা কঠিন। কিন্তু সব সময়ই য়্যালাইদা তাকে উৎসাহ দিয়েছে, সব সময়ই তার কঠিন কর্মক্ষেত্রে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সবচেয়ে বিপন্ন যখন হয়েছে, তখন দেখতে পেয়েছে, য়্যালাইদা রাইফেল ঘাড়ে করে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সাহায্য করতে, অপেক্ষা করছে তার নির্দেশ পেতে। রাতের পর রাত ছুটেছে স্বামীর সঙ্গে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিপুণ শিকারীর মত লক্ষ্যভেদ করছে। য়্যালাইদা মেয়ে হয়ে না জন্মে পুরুষ হয়ে জন্মালে আরও বেশি সাহায্য করতে পারত মুক্তিযোদ্ধাদের।

গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল চে।

গাড়ির শব্দে দুজন চাষী এগিয়ে এসে দেখল। তাদের কাছে ডেকে জানতে চাইল, এখানে তোমাদের ওপর কোন অত্যাচার হচ্ছে না তো?

না। বলেই হাসতে হাসতে চাষীরা এগিয়ে গেল মাঠের দিকে। চে ঠিক বুঝতে পারল না, এরা কারা। শত্রুপক্ষ নয় তো! তাদের ডাকল। ডাক শুনেই তারা আবার ফিরে এল।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

উই ওখানে। জমি দেবে বলেছে। আমাদের তো জমি নেই। আখক্ষেতে মজুরী করি। যদি জমি পাই…।

পেলে কি করবে?

গমের চাষ করব।

হাল-লাঙ্গল, সার, বীজ তোমাদের আছে কি?

জমি থাকলে সব হবে স্যার। আচ্ছা চলি। দেরী হয়ে গেলে আবার দরখাস্ত না-মঞ্জুর হতে পারে।

লোক ছুটো চলে যেতেই আবার গাড়ি নিয়ে এগোতে থাকে চে। না, কোথাও শত্রুর কোন চিহ্ন নেই। এই গোটা অঞ্চলই মুক্ত। রাস্তাটা কেমন গোলমেলে মনে হল। বোধহয় কোন ট্রাপ রয়েছে সামনে। গাড়ি থামিয়ে চে হেঁটে এগিয়ে গেল রাস্তা পরীক্ষা করতে। পাশের ঝোপ থেকে তিনজন বন্দুকধারী বেরিয়ে এসে ঘিরে ধরল তাকে।

কে তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

আমি ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা।

সেলাম। তিনজনেই সেলাম দিল। ভাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে যাচাই করে নিল। মৃদুস্বরে বলল, সামনে রাস্তা খারাপ।

শত্রুরা কি এদিকে আসে?

প্রায় পনর দিন হল ওরা পালিয়েছে, আর আসেনি। আশা করছি আসবে না। জোর মার খেয়েছে। ক্ষতিও হয়েছে খুব।

আরও এগিয়ে যাওনি কেন?

অন্য দল গেছে। আমরা য়্যামবুশের অপেক্ষা করছি, পাহারা দিচ্ছি। তবে আর প্রয়োজন হবে না। হিণ্টারল্যাণ্ড শত্রুমুক্ত মনে হচ্ছে।

বিমান থেকে ছত্রী সৈন্য নামাতে চেষ্টা করছে শত্রুরা। সতর্ক থাকতেই হবে। তোমাদের সঙ্গে চাষীদের সম্পর্ক কেমন ?

ভাল।

মনে রেখ বন্ধু, যুদ্ধ আমাদের পেশা নয়। আমাদের পেশা হল দেশকে উদ্ধার করতেই যুদ্ধ করা, আর ধর্ম হল সমাজ সেবা করা। আমরা যে আদর্শের জন্য লড়াই করছি, তার সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হল চাষীদের ভূমির অধিকার দিয়ে শোষকশ্রেণীকে নির্মূল করে শ্রেণীহীন সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তোমাদের বড় কাজ করতে হবে ভূমি-সংস্কারে মন দেওয়া। খুঁজে বের করতে হবে যত জমি বড় বড় মালিকানায় রয়েছে, সে সব জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের হাতে তুলে দিতে হবে। ভূমির মালিকানা বদল থেকেই আমাদের কাজ আরম্ভ হবে। আর ভূমি বণ্টন যারা করবে, তারা যেন নীতিহীন না হয়। সত্যকার মুক্তিযোদ্ধা হবে ত্যাগী সন্ন্যাসী। তার কর্ম দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে, মুক্তিযোদ্ধারা ব্যক্তি স্বার্থে অস্ত্রধারণ করেনি। তারা সমষ্টির স্বার্থেই লড়াই করছে।

চে চুরুট বের করে আগুন দিল। চুরুটে কয়েক'টান দিয়ে চে আবার বলল, মুক্তিযোদ্ধারা সমাজ-সংস্কারের আদর্শ স্থাপন করেই ক্ষান্ত হবে না, he ought also constantly to give orientation in ideolagical problems, explaining what he knows and what he wishes to do at right time—উপযুক্ত সময়ে জনসাধারণের উপকারের জন্য যা করতে চায় তা জানিয়ে দিতে হবে, নইলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না জনসাধারণ। প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধাকে মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর সামাজিক অবস্থার প্রতিদিন পরিবর্তন ঘটছে, মুক্তিযোদ্ধাকে জানতে হবে সমাজের অগ্রগতির জন্য এই পরিবর্তনের সঙ্গে কি করে পা ফেলতে হবে, বিশেষ করে কৃষি-সমস্যার বিষয়ে অবহিত হয়ে চাষীর বন্ধুরূপেই দাঁড়াতে হবে। আমরা যখন জনতাকে বলব, সশস্ত্র এই

বিদ্রোহের কি প্রয়োজন, তা যদি জনতা উপলব্ধি করতে পারে তা হলে তারাও এগিয়ে আসবে বিপ্লবের অংশীদার হতে, তাদের কাছেই আমরা শিখতে পারব কেমন করে তাদের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। আমাদের ও জনতার সম্মিলিত, এই ব্যবস্থা যেমন বৈপ্লবিক কর্মধারাকে এগিয়ে নেবে, তেমনি জাতির প্রয়োজন মেটাবার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। চল, তোমাদের অগ্রগামী কোন কেন্দ্রে।

আমরা এই পাহারাদারী ছেড়ে যেতে পারব না। নেতার আদেশ নেই।

চমৎকার। অন্তত পথটা বলে দাও।

রক্ষীরা পথ বাৎলে দিয়ে নিজেদের গোপন স্থানে চলে গেল। চে গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য পথ ধরল রক্ষীদের নির্দেশমত।

গ্রামে পৌঁছেই তৎপরতা লক্ষ্য করল চে।

কোন নতুন অভিযানে যাচ্ছ বুঝি তোমরা? প্রশ্ন করল পুরাতন সহকর্মী আন্টনিওকে।

অবশ্যই। আজ এখানে চাষীদের একটা সভাও আছে বিকাল বেলায়।

উদ্দেশ্য?

তারা সুখে শান্তিতে আছে কিনা তারা জানাবে, আর আমরা কি করেছি তাও বলব। কোথাও যদি কোন অসুবিধা দেখা দেয়, তা কি করে সমাধান করা যায় তাও আলোচনা হবে।

শত্রুর ঘাঁটি কতদূর?

তা বিশ মাইল দূরে। তবে পূর্বের এই দিকটা থেকে শত্রুরা সরে গেছে। এদিকে আর কোন শত্রু-ঘাঁটি আছে বলে মনে হয় না। সংবাদ অন্তত সেই রকমই পেয়েছি। তবে উপকূলে মাঝে মাঝে স্পীড বোটে শত্রুসৈন্য নামতে চেষ্টা করে, অনেক সময় গোপনে গ্রামের মধ্যে ঢুকেও পড়ে। তা বন্ধ করতে নির্দেশ

দেওয়া হয়েছে, ছত্রী সৈন্যদের মোকাবিলা করতে গেছে কিছু মুক্তিযোদ্ধা। চে-কে নিয়ে গিয়ে বসান হল একটা খোলা বাড়ির বারান্দায়। আহার্যের ব্যবস্থাও হল।

বিকেল বেলায় গ্রামের কিছু পুরুষ ও মেয়ে উপস্থিত হল সেই খোলা বারান্দায়। আণ্টনিও সবাইকে বসতে দিয়ে বলল, আজ তোমাদের কথা শুনতে চাই বন্ধুগণ। তোমাদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলতে হবে। আমরা যাতে তোমাদের সেবা করতে পারি, তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে।

পেড্রো ছিল গ্রামের ভূমিহীন চাষী। সেই উঠে দাঁড়াল। বলল, আপনারা বলেছিলেন ভূমি বণ্টন করে দেবেন ভূমিহীনদের মধ্যে। আমরা দেখছি, ভূমি বণ্টন হচ্ছে কিন্তু সবাই প্রয়োজন মত ভূমি পাচ্ছে না। অথচ ভূমির অভাব নেই। এবার আমাদের সামনে গমের মরশুম। ফসল না পেলে ভূমিগুলো অকেজো থাকবে, তাতে জাতীয় জীবনে ঘোরতর দুর্দিন দেখা দেবে।

আণ্টনিও ডাকল, ক্যাসিয়ানা, তোমার খাতাটা নিয়ে এস।

ক্যাসিয়ানা ভূমি বণ্টনের খাতা সামনে রাখতেই আণ্টনিও বলল, এই কম্যুনের দায়িত্ব যাদের তারাও এস। বন্ধু পেড্রোর অভিযোগের জবাব দাও।

লাসিয়াস বলল, বন্ধু পেড্রো যা বলেছে তা আংশিক সত্য। কারণ, আমাদের ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা এখনও শেষ হয়নি। ভূমি জরিপ করা, পুরাতন রেকর্ড দেখে তার পরিমাপ ও মালিকানা স্থির করা এখনও শেষ হয়নি। ভূমি হল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ব্যক্তিগত মালিকানায় যে হাজার হাজার একর ভূমি ছিল কতকগুলো ধনীর হাতে তা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। কেবলমাত্র তার সুষ্ঠু বণ্টন শেষ হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই প্রত্যেকে যাতে ভূমিকে কাজে লাগাতে পারে তার জন্য অধিকাংশ ভূমিই সবার মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে। বাকিটা শীঘ্রই দেওয়া হবে।

আন্টনিও পেড্রোকে বলল, বন্ধু লাসিয়াস যা বলল তাতে তুমি নিশ্চয়ই সমর্থন জানাবে। আমার মনে হয় এতে তোমার কোন আপত্তি হবে না। ভূমির সঠিক হিসাব না পেলে বন্টনকে ন্যায়সঙ্গত করা সম্ভব নয়। এই বিষয়ে তোমরা নিশ্চয়ই দ্বিমত নও।

পেড্রো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, লাসিয়াস ঠিকই বলেছে। তবে যা করার তাড়াতাড়ি কর।

ম্যাদাম কোকো উঠে বলল, আজ তোমরা আমাদের হাতে যে জমি দিচ্ছ, সে জমি কেড়ে নিতে যদি আসে আগের মালিকরা, তাহলে আমরা কি করব ?

আন্টনিও জোর দিয়ে বলল, আসবে না।

যদি আসে!

আমাদের কথায় ও কাজে কোন 'যদি' নেই। যা হবে না, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোন লাভ নেই ম্যাদাম কোকো। আমাদের শক্তির উৎস হল জনসাধারণ। তাদের সেবা করছি বলেই আমরা বলীয়ান। তোমরা যদি সাহায্য না করতে তা হলে আমাদের শত চেষ্টায়ও শত্রুদের নির্মূল করতে পারতাম না। আজ যা সম্ভব হয়েছে তা তোমাদের সাহায্যে এবং যে কোন সময়ই তোমরা যা পেয়েছ তা থেকে কেউ তোমাদের বঞ্চিত করতে পারবে না।

পেড্রো মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ঠিক কথা।

চে চুরুট ধরিয়ে এক গাল ধুঁয়ো ছেড়ে বলল, আমরা বর্তমানে এমন একটি সমাজে বাস করছি, যে সমাজে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির রয়েছে। একটা শিবির পরিচালনা করছে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ বুর্জোয়া সম্প্রদায়। তারা শোষণ করছে দরিদ্রকে। যার আছে সে পাচ্ছে আরও বেশি, যার নেই সে আরও দরিদ্র হচ্ছে। এই অসাম্য দূর করতে আমরা অস্ত্র তুলে নিয়েছি হাতে। আমরা চাই সর্বহারার এক নায়কত্ব, আমরা চাই শ্রেণীহীন সমাজ, আমরা চাই শোষণ থেকে জনতাকে মুক্ত করতে, আমরা চাই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ, আমরা

চাই জাতিয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রনের ক্ষমতা, আমরা চাই পৃথিবীকে যুদ্ধভীতি থেকে মুক্ত করতে, আমরা চাই শান্তি, সাম্য ও প্রগতি। আমাদের মহাযজ্ঞে একমাত্র ভরসা জনতার আন্তরিক সক্রিয় সহযোগিতা। আমরা যে অবস্থায় এসেছি, তাতে আশা করা যাচ্ছে, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই কিউবার মানুষ মুক্ত হবে। কিন্তু রাজনৈতিক মুক্তি আমরা চাই না, আমরা এর সঙ্গে চাই আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা। তার জন্য তোমরা যদি দলে দলে এগিয়ে না আস, তা হলে আমরা নিশ্চয়ই পেছিয়ে পড়ব। আমাদের ভুল-ত্রুটি থাকতে পারে, তা সমালোচনা সাপেক্ষ, একথা যেন তোমরা ভুল না।

সবাই সাগ্রহে চে-র বক্তব্য শুনে নিজেদের মধ্যে গুণগুণ করে আলোচনা শুরু করতেই চে বলল, তোমাদের যা জিজ্ঞেস করার তা বিনা দ্বিধায় আমাকে জিজ্ঞেস করতে পার। আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আমি তোমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে রাজিঁ।

আমরা কি অমিত বলশালী ইয়াঙ্কি শক্তির সঙ্গে লড়াই করে জিততে পারব ?

কেন পারব না। আজ অবধি আমাদের পরাজয় ঘটেনি। শতাধিক যুদ্ধে আমাদের অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। রক্ত দিয়ে দেশের ঋণ পরিশোধ করছি শুধুমাত্র জনতার মুক্তির জন্য।

চে কথা বলা শেষ করতেই আকাশে বিমানের শব্দ শোনা গেল। সবাই সতর্ক হল।

সবাই রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত।

নিরাপদ আশ্রয়ে বন্দুক উঁচিয়ে বসল সবাই।

বিমান গ্রাম পেরিয়ে চলে গেল।

চে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কার বিমান বুঝতে পারা গেল না।

শত্রুর নিশ্চিত।

কিন্তু! আচ্ছা, সংবাদ সংগ্রহ করতে লোক পাঠাও। যাত্রীবাহী বিমান বলেই মনে হল। ঠিক আছে। ও নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। যে যার নিজের নিজের কাজে চলে যাও। মোকাবিলা করার সামর্থ্য যেন থাকে আমাদের। এর বেশি আর কি বলব।

সবাইকে পেছনে রেখে চে এগিয়ে চলল মেঠো পথ ধরে। দেখতে দেখতে আখের ক্ষেতের আড়ালে চলে গেল। পেছনে যারা রইল, তাদের কাজের দিকে ফিরেও দেখল না।

আবার জিপে উঠে বসল চে।

চলতে চলতে জিপের মুখ ঘুরিয়ে দিল তার গৃহের দিকে।

সন্ধ্যাবেলায় জিপ এসে দাঁড়াল গৃহের দরজায়। গাড়ির শব্দ শুনে ছুটে বেরিয়ে এল য়্যালাইদা। চে-কে জিপ থেকে নামতে দেখে খুশীতে ভেঙে পড়ল সে। আগের মতই ছুটে এসে স্বামীর বুকে মুখ রেখে অভিনন্দন জানাল তাকে।

চে-ও আনন্দের শিহরণ অনুভব করল। দু'হাতে য়্যালাইদার মুখ উঁচু করে তুলে গভীরভাবে চুম্বন করল তার ওষ্ঠে।

তোমাকে বড় রোগা মনে হচ্ছে। বলল চে।

য়্যালাইদা হেসে বলল, তোমাকেও খুব হৃষ্টপুষ্ট মনে হচ্ছে না।

আমায় কত পরিশ্রম করতে হয় তাতো জানো, তার ওপর রয়েছে হাঁপানী।

আমাকেও কম পরিশ্রম করতে হয় না। তোমার রেখে যাওয়া কাজগুলো আমাকেই শেষ করতে হয়। তার ওপর তুমি কর্তব্য দিয়েছ তোমার সন্তানদের মানুষ করে তুলতে। তাও করতে হয়। কোথাও কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না। এবার চল, খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম করবে।

তাই তো!

আজই চলে যেতে চাও বুঝি?

চে স্পষ্ট করে 'না' বলতে পারল না। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, বেবিরা কোথায় ?

হ্যাসোকে ঘুমচ্ছে।

চে ঘরে ঢুকে হ্যাসোকের পাশে দাঁড়িয়ে শিশু দুটোর গালে আঙুল বুলিয়ে দিয়ে দেওয়ালে রাইফেলটা কাত করে রাখল। নিজেও দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে বলল, ম্যাদাম লুজানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আজ। সে তো হাসপাতালে ডিউটি নিয়েছে। তোমার সহকর্মীর অভাব হয়েছে নিশ্চয়ই।

মোটেই নয়। আমার সহকর্মীর অভাব কোথায়। গ্রামের সব মেয়ে এগিয়ে এসেছে আমাকে সাহায্য করতে। আমাদের কাজ আরও কঠিন। রাতের বেলায় পাঠশালা যেতে হয় পড়াতে, দিনের বেলায় মেয়েদের রাইফেল ছোঁড়া শেখাতে হয়, চাষীদের ক্ষেত পাহারা দিই আমরা, আর চাষীরা নিরাপদে চাষ করে। যাদের কাছ থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তারা তো চুপ করে থাকার লোক নয়। তারা মাঝে মাঝেই গুণ্ডা দিয়ে হামলা করবার চেষ্টা করে। আমাদের রাইফেলের রেনজে আসতে সাহস পায় না। মাঝে মাঝে দুর থেকে গুলী ছোঁড়ে। আমরা তেড়ে গেলেই পালায়। তারপর...।

তারপর কি ?

যে সব কমরেড মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে, তাদের পরিবারদের রক্ষার দায়িত্বও আমাদের। কখনও স্ত্রীর চোখের জল মুছাতে হয়, কখনও পিতামাতাকে সান্ত্বনা দিতে হয়। তাদের পরিবার রক্ষার জন্য খাবার সংগ্রহ করে দিতে হয়। তাই বিশ্রাম আমাদের ভাগ্যে থাকে না। তার ওপর আমি তোমার স্ত্রী, আমার যে আরও বেশি দায়িত্ব। ফিদেল কাস্ত্রোকে বাদ দিলে তোমার নামই জানে জনতা। এই জনতার সামনে তোমার মর্যাদাকে অটুট রাখার দায়িত্বও যে আমার নিজস্ব ধর্ম।

বুঝলাম। তোমাকে ধন্যবাদ। পুরস্কার দেব আজ তোমাকে।

বলেই চে উঠেই য়্যালাইদাকে আবেগের সঙ্গে বুকে টেনে নিয়ে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল।

সেপটেমবর ঊনষাট সাল।

হাভানার উপকণ্ঠে সবগুলো সামরিক ঘাঁটিতে এক সঙ্গে আক্রমণ করল গোরিলাবাহিনী। সেই ভয়ঙ্কর দিনটি কল্পনাও করা যায় না। আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত স্থল ও বিমানের সুশিক্ষিত অগণিত সৈন্যবাহিনী একপক্ষে, আর অপর পক্ষে এক সঙ্গে আঘাত হানছে মুষ্টিমেয় কয়েক জন মুক্তিযোদ্ধা অতি সাধারণ অস্ত্র নিয়ে। কিছু রকেট তাদের সম্বল। রকেট গিয়ে আঘাত করছে বিমানক্ষেত্রে ফৌজ-ছাউনীতে।

ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, বোমারু বিমান প্রত্যাঘাত করার জন্য এগিয়েছে, কিন্তু কাকে আঘাত করবে? আক্রমণকারীরা সংখ্যায় এত কম যে, তাদের ওপর নিশানা করে অস্ত্র ক্ষেপণও দুঃসাধ্য। সবাই খুঁজছে নিরাপদ আশ্রয়। গাড়ি-ঘোড়া চলাচল বন্ধ। বাজার, দোকান-পাট বন্ধ। জল বন্ধ, বিজলি বাতি বন্ধ, চারিদিকে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা। শহরের মানুষ যখন ত্রাসের রাজ্যে বাস করছে, তখন কলকারখানাও নিস্তব্ধ। শ্রমিকরা কর্মবিরতি ঘটিয়ে নিজ নিজ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কেউ-ই সাহস করে পথে বের হতে চেষ্টা করছে না।

শুধু শোনা যাচ্ছে গুলীগোলার শব্দ। পেশাদারী সেনারা বিক্রম দেখাতে বাইরে বের হয়েছে, কিন্তু তারা আক্রমণকারীদের খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ কোন গলি থেকে একটা মলোটেভে বোমা ছুটে এসে হাহাকার সৃষ্টি করছে সামরিকবাহিনীতে। হঠাৎ একটা রকেট এসে আঘাত করছে কোন সাঁজোয়া গাড়ির ওপর, কিন্তু অদৃশ্য শত্রুকে খুঁজে বের করতে পারছে না তারা। কোথায় হাওয়াতে মিশে যাচ্ছে আক্রমণকারীরা।

সকাল থেকে এক নাগারে আঘাতের পর আঘাত করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। কখনও উত্তরে, কখনও দক্ষিণে, কখনও পূর্বে, কখনও পশ্চিমে। ফৌজ দক্ষিণে ছুটছে। উত্তরে হামলা আরম্ভ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। সেদিকে যেতে না যেতেই আরেক দিকে আক্রমণ। হয়রাণ হয়ে গেল বাতিস্তার বাহিনী।

তারপরেই সাময়িকভাবে থামল যুদ্ধ।

কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার সময় পেল না সরকারী ফৌজ।

রাতের অন্ধকার নামতেই আবার শুরু হল হানাহানি। অন্ধকারে শত্রুমিত্র চেনবার কোন উপায় নেই। সরকারী ফৌজের গুলীতে মাটিতে মুখ থুবরে পড়ছে অসামরিক অধিবাসীরা। ঘরের দরজা বন্ধ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে সবাই।

যুদ্ধের গতি বুঝতে পারছিল না শহরের মানুষ। কামান বন্দুকের আওয়াজ আর আগুনের খেলা চলছিল বাইরে। সাহস করে কেউ-ই দরজা জানালা খুলে প্রকৃত অবস্থা জানবার সাহস পাচ্ছিল না।

মাঝ রাতেই বন্ধ হয়ে গেল আওয়াজ। এতক্ষণ যে তাণ্ডব চলছিল, তার প্রত্যক্ষদর্শীরা হঠাৎ কামান বন্দুকের আওয়াজ থামতেই সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল।

সকাল বেলায় সাহস করে অনেকেই দরজা খুলে বাইরে বের হল। শহরের বিশেষ বিশেষ এলাকায় গত রাতের ঘোরতর যুদ্ধের চিহ্ন তখনও বর্তমান।

সামরিকবাহিনী সাঁজোয়া গাড়ি নিয়ে টহল দিতে বেরিয়েছে, কিন্তু কেমন যেন আতঙ্ক সেনাবাহিনীর চোখে-মুখে। যারা আক্রমণকারী, তাদের একজনকেও দেখা গেল না কোথাও। পথে জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে সাধারণ অসামরিক ব্যক্তির মৃতদেহ, আর কোথাও গাদা দিয়ে রয়েছে সামরিকবাহিনীর লোকেদের মৃতদেহ, কোথাও ভাঙা সাঁজোয়া গাড়ি, এদিক-ওদিক রাইফেল

মেসিনগানের ছড়াছড়ি। রেসকুউ পার্টি এসেছে, তারা মৃতদেহ স্থানান্তরিত করছে, ভাঙা গাড়ি অস্ত্রশস্ত্র জড় করছে রাস্তার ধারে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাস্তাঘাট পরিষ্কার। গত রাতের যুদ্ধের চিহ্ন রয়েছে গৃহের দেওয়ালে আর রাস্তায়। সে সব জায়গা গোলার আঘাতে গর্তের সৃষ্টি করেছে।

শোকাচ্ছন্ন শহর। মৃত শহর। পথে লোক নেই। দোকান-পাট খোলেনি। যানবাহন চলাচল নেই। সর্বত্র আতঙ্ক। হাভানা বেতারে ঘোষণা করা হয়নি গত রাতের ঐ দুঃসাহসিক যুদ্ধের কাহিনী ও ফলাফল। সরকার সর্বপ্রকারে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলছে। বিদেশী সাংবাদিকদের সংবাদ সেন্সার করে বাহির-বিশ্বকে জানতে দেওয়া হয়নি কিউবার আজকের রাজনৈতিক পরিস্থিতি।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে তখন গোপনে পরামর্শ করতে সমবেত হয়েছে গোরিলা মুক্তিযোদ্ধারা। তারা হিসাব প্রস্তুত করছে তাদের কাজ কতটা সাফল্যলাভ করেছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ক'দিনের যুদ্ধে।

ফিদেল কাস্ত্রো, কামিলো, চে গুয়েভারা, তানিয়া, রোবার্তো এবং আরও বীর নেতারা সেই সভায় উপস্থিত।

তোমার ইনটেলিজেন্সকে প্রশংসা করতে হয় তানিয়া।

ঠিক বলেছ ডাক্তার আরনেসতো। তোমার সঙ্গে যখন জার্মানীতে আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন তুমি আমাকে খুবই আণ্ডার এষ্টিমেট করেছিলে। এখন দেখছ তো তানিয়া অসাধ্য সাধন করতে পারে।

কামিলো হাসতে হাসতে বলল, তোমার রূপের আগুনে ওরা পুড়ে মরেছে।

চুপ। ওসব কথা বলে আমাকে ছোট প্রমাণিত করতে চেষ্টা

কর না কামিলো। এখনও ফ্যাসীবাদীরা তানিয়াকে চিনতে পারে নি। আমার আরও অনেক কাজ বাকি। আমি আরজেন্টিনার মেয়ে। আমার এই লড়াই এখানেই শেষ নয়, আমাকে ছুটতে হবে মাতৃভূমি অবধি মুক্তির জয়গান গাইতে গাইতে।

চে চুরুটে টান দিতে দিতে বলল, ঠিক বলেছ তানিয়া। আমাদের জন্মভূমি মুক্ত না হওয়া অবধি শান্তি নেই। ক্যারেবিয়ানের এই ক্ষুদ্র দেশটায় আমাদের আবদ্ধ রাখতে চাই না। আমাদের শপথ নিতে হবে, যে কোন প্রকারে লাতিন আমেরিকাকে ইয়াঙ্কি সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব। তাতে যেন আমরা পেছ-পা না হই। তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংগঠনকে আরও জোরদার করতে হবে। আমরা এদিকে যেমন প্রস্তুত হব, ওদিকে তুমিও তখন ধর্মঘটের ডাক দেবে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্রোহ আমাদের বিপ্লবের পথ আরও সুচারু করে তুলবে।

তানিয়া বলল, এখানে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আমাকে শীগগির ফিরে যেতে হবে হাভানায়। বাতিস্তার কার্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে নিখুঁত চিত্র দিতে না পারলে তোমাদের কাজ পেছিয়ে পড়বে।

ফিদেল বলল, ঠিক বলেছ তানিয়া। গত রাতের অভিযান নিষ্ফল হয়নি। শত্রুর মনোবল ভেঙে গেছে। এই সুযোগে বারবার চারিদিক থেকে আঘাত হানতে হবে। এখন লোহা উত্তপ্ত, রক্তবর্ণ। এবার আঘাত করে মনের মত গড়ে নিতে পারব আমাদের অস্ত্র। তোমরা প্রস্তুত হও। সবাইকে প্রস্তুত হতে বল। জিরো আওয়ারের অপেক্ষা করতে হবে সবাইকে।

কামিলো হাসতে হাসতে বলল, আমরা প্রস্তুত। শ্রীমতী তানিয়াকে প্রস্তুত হতে বল বন্ধু। তার দেওয়া সংবাদের ওপর আমাদের লাইন অব. য়্যাকশন স্থির করতে হবে। অবিলম্বে তানিয়াকে যেতে হবে শত্রুদের পক্ষে।

অত তাড়াতাড়ি করতে হবে না বন্ধু কামিলো। আমার দলবল

বেশ সক্রিয় রয়েছে। তারাই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজন মত সংবাদ সরবরাহ করতে তারা জানে ও পারে। তবুও যত শীঘ্র পারি আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত হতে চাই।

তানিয়া উঠতেই রোবার্তো তার পেছন পেছন এগিয়ে গিয়ে বলল, যুদ্ধ শেষ হতে দেরী নেই তানিয়া।

মৃত্ হেসে তানিয়া বলল, দেশের প্রয়োজনে আমি বিয়ে করব এবং সেরূপ ক্ষেত্রে শত্রুদের বেশ শাঁসালো একজনকে বিয়ে করলে এর চেয়ে বেশি প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

অর্থাৎ আমার ভালবাসার কোন মূল্য দিতে চাও না।

ভুল কর না রোবার্তো। আমাদের ভালবাসার কোন সুযোগ নেই। দেশকে ভালবাসা ভিন্ন অন্য কোন বস্তুকে ভালবাসা আমাদের নিষেধ, এ কথা কেন ভুলে যাচ্ছ? আমরা সংসারী হতে পারি না।

রোবার্তো আবার বলল, কোনদিনই পার না?

জোর করে একথা বলতে পারি না বন্ধু। তবে সেদিন অনেক দূরে। যেদিন সময় পাব, সেদিন তোমাকে আমি-ই কাছে ডেকে নেব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। জান তো আমার বাবা ছিলেন জার্মান, মা রাশিয়ান ইহুদী। কিন্তু আমার জন্মভূমি আরজেনটিনার রাজধানী বুয়নেস আয়ারস। বিচিত্র রক্তের সংমিশ্রনে এবং বিচিত্র পরিবেশে আমি বড় হয়েছি। লেখাপড়াটা শিখেছি জার্মানে। কারণ ছোটবেলায় জন্মভূমি ছেড়ে আমাকে নিয়ে বাবা-মা গিয়েছিলেন জার্মানীতে, আমরা বাস করতে থাকি পূর্ব জার্মানে। আমার শিক্ষা-দীক্ষা এমন একটা পরিবেশে সম্পূর্ণ করতে হয়, যে পরিবেশ আমাকে শিখিয়েছে মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার ব্রতে আত্মত্যাগ করতে। সেখানে সব পেয়েছি, পাইনি শুধু যৌন-লিপ্সাকে বড় করে দেখার শিক্ষা, আর অহেতুক ভালবাসার স্বপ্নে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটাতে।

রোবার্তো প্রত্যুত্তর দেবার কোন চেষ্টা না করেই বেরিয়ে গেল নিজের কাজে।

তানিয়া এগিয়ে গিয়ে জিপে উঠতে গিয়ে থামল। ফিরে এসে চে গুয়েভারার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলার ছিল।

আজ আর সময় নেই তানিয়া। আমাদের কাজ শেষ করে তবেই কথা বলব। অনেক আলোচনা তো করেছি। এবার কাজের সময়। কাজের সামনে দাঁড়িয়ে কথার জোয়ার বইয়ে দেবার সময় নেই। তোমার সাফল্য কামনা করি।

তানিয়া জিপে উঠে বসল।

চে গুয়েভারাও জিপে উঠে ফিরে চলল।

ফিদেল চে-র পথের দিকে তাকিয়ে কামিলোকে বলল, আমার জীবনে চে-র মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং নৈতিক বলে বলীয়ান সহকর্মী খুব কমই পেয়েছি। চে এসেছিল আমাদের বাহিনীকে সেবা করতে ডাক্তার হিসেবে। অথচ সে ডাক্তারের ছুরি ছেড়ে হাতে তুলে নিল রাইফেল। চে-কে জিজ্ঞেস করতেই হেসে বলেছে, একজন মানুষের সেবা করার চেয়ে একটা জাতির সেবা হল আমার বড় কর্তব্য। আর জাতির সেবা করতে ছোট একটা ছুরির চেয়ে বড় একটা তলোয়ার বেশি দরকার। সেই কাজই করছি। সাম্রাজ্য-বাদকে চে ঘৃণা করে, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে তার উৎসাহপূর্ণ বিদ্রোহ একটা ইতিহাস।

কামিলো বলল, আজ অবধি শতাধিক যুদ্ধক্ষেত্রে পাশাপাশি আমরা লড়াই করেছি। কোন সময়ের জন্যই চে-কে পিছু হটতে দেখিনি। সবচেয়ে মারাত্মক ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ হাতে তুলে নেওয়াই হল চে-র বৈশিষ্ট। এই বীরকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারিনি। আজকের যুদ্ধেও তার নেতৃত্ব ঐতিহাসিক ঘটনা।

চে এই আলোচনার সময় পৌঁছে গেছে সিয়েরা ময়েস্ত্রার

উপকণ্ঠে তার পর্ণকুটিরে। জিপ থেকে নেমে কোলে তুলে নিয়েছে তার দুই শিশু সন্তানকে। য়্যালাইদা তখন গৃহকর্মে ব্যস্ত। স্বামীর প্রত্যাগমনে খুশী মনে ছুটে এসে আগের মতই তার হাত রাখল চে-র কাঁধে।

খবর কিছু আছে ?

শুনলাম সরকারী ফৌজ হাভানার উপকণ্ঠে শক্তিশালী প্রতিরোধ-ব্যবস্থা গড়ে তুলছে !

চে হেসে বলল, মৃত্যুর ডাক এলে রোগীকে বাঁচাতে আমরা কোরামিন দিই। প্রায় সব ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু ঘটে, নেহাত বরাত জোরে হয়ত কেউ বেঁচে যায়। বাতিস্তাও শেষ পর্যন্ত হাভানা রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে। ভালই। হাভানা কিউবা নয়। হাভানার পতন হলে বাতিস্তার পতন ঘটবে, কিন্তু হাভানা না পেলে মুক্তিফৌজের পতন হবে না। একটু কোকো খাওয়াতে পার। কাল থেকে আবার হাঁপানীর বেগটা বেড়েছে। এক কাপ কোকো তৈরী করে একটা ইণ্টারভেনাস ইনজেকসন দিয়ে দাও য়্যালাইদা। তা হলে অন্তত একটা মাস নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারব। শরীরটা বেচাল হলে কাজের বিঘ্ন ঘটে।

য়্যালাইদা কোন কথা না বলে কোকো তৈরী করতে গেল।

চে চুরুট ধরিয়ে শিশুদের আদর করতে থাকে।

গরম কোকোর বাটি সামনে রেখে সিরিনজ্ বের করল য়্যালাইদা। গরম জলে সিরিনজ্ পরিষ্কার করে য়্যাম্পুল ভেঙে সিরিনজে ওষুধ ভর্তি করে প্রস্তুত হল। চে কোকো খেয়ে মেঝেতে কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল। য়্যালাইদা অতি সতর্কতার সঙ্গে হাতে ফিতে বেঁধে ইণ্টারভেনাস ইনজেকসন দিল। অনেকক্ষণ চোখ বুজে শুয়ে রইল চে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে চে উঠে বসল।

য়্যালাইদা বলল, এখন কিছুটা ভাল মনে হচ্ছে কি ?

নিশ্চয়। এবার খাবার মত কিছু দিতে পার কি? আজ সবাই এক সঙ্গে বসে খেতে চাই। ম্যাদাম লুজানও বোধহয় এসে যাবে।

এ তো আমাদের সৌভাগ্য। তোমার জামা-প্যাণ্ট খুলে একটু 'হোমলি' হয়ে বস। আমি খাবার আনছি।

চে হাসতে হাসতে বলল, পোষাক বদল করা উচিত নয় য়্যালাইদা। আমাদের সব সময় প্রস্তুত থাকা হল ধর্ম। কোন সময় কোন প্রকার শিথিলতা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ। তুমি বোধহয় জান না য়্যালাইদা, আমরা যখন সান্ত ক্লারা শহর আক্রমণ করি, তখন অসংখ্য সুসজ্জিত শত্রু-সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়বার মত আমাদের সঙ্গী ছিল মাত্র তিনশ' জন, তাও এমন কোন বিশেষ অস্ত্র ছিল না শত্রুর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবার। তবুও আমরা জয়লাভ করেছিলাম। কেন জান? আমাদের জয়ের চেয়ে তাদের পরাজয়টা জানলেই বুঝতে পারবে। অতর্কিতে আমরা শত্রুর শক্ত ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তখন-শত্রুসৈন্যরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সশস্ত্র প্রহরা যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যে কোন শৈথিল্য যে কোন সময়ে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে। শত্রু-সৈন্যরা প্রস্তুত হবার আগেই পরাজয় ঘটল কেবল মাত্র আমাদের কোন শিথিলতা ছিল না বলে। সেজন্য মুক্তিযুদ্ধের সেনাদের কোন ক্রমেই প্রস্তুতিহীন অবস্থায় থাকা উচিত নয়। লা-ভিলা প্রদেশের যুদ্ধের কথাও তো তোমার মনে আছে। তুমিও তো ছিলে সে সময় সেবাকারিণীরূপে। সেই রাতের অন্ধকারে আহতদের সেবা করতে পারতে না, যদি তোমার সাজসজ্জা করতে সময় নষ্ট হত। আমাদের জয় শুধু সাহসের জয় নয়, আমাদের জয় হল সুচিন্তিত আক্রমণ-পদ্ধতির জন্য। তার মধ্যে সর্বদা প্রস্তুতি হল অন্যতম।

য়্যালাইদা আর দেরী করল না। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে স্বামী-পুত্র নিয়ে খেতে বসল। খাওয়া শেষ হবার আগেই এসে ঘরে ঢুকল ম্যাদাম লুজান।

আজ তোমাদের শুভরাত্রি প্রার্থনা করছি। বলেই হাসল ম্যাদাম লুজান।

য়্যালাইদার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। সে লজ্জায় মুখ নীচু করে বসল। চে শুকনো রুটির টুকরোতে কামড় দিয়ে বলল, ম্যাদাম লুজানের জন্য কবে শুভরাত্রি আবার আসবে?

সে দুর্ভাগ্য হবে কি মেজর সাহেব?

ঠিক বলতে পারি না, তবে এলে মোটেই দুর্ভাগ্য মনে করব না ম্যাদাম লুজান। এবার হাত-মুখ ধুয়ে বসে পড়ুন। আমার জন্য তো ম্যাদাম য়্যালাইদা রান্না করেন না, আপনার অংশই আমি গলাধকরণ করছি। আপনি যদি এই সময় না বসেন, তা হলে উপোস করেই কাটাতে হবে আজকের দিনটা।

আমার অভ্যাস আছে।

সেটাও সুখকর, তবে আজ কিছু খাবার আছে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ুন।

খাওয়ার পর চে বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুমিয়ে পড়ল। য়্যালাইদা ছেলেদের কোলের কাছে নিয়ে মেঝেতে শুয়েছিল। কেবল ঝিমুনি এসেছে, এমন সময় দরজায় আঘাত পড়ল।

কি খবর বন্ধু?

একটা চিঠি।

খুব জরুরী কি?

পড়ে দেখুন।

যদি জরুরী না হয়, তা'হলে ডাক্তারকে ডাকব না। অনেকদিন পর বোধহয় একটু বিশ্রাম করার সময় পেয়েছে। ঘুমটা ভাঙাবার ইচ্ছা নেই। দেখি চিঠি।

চিঠিখানা খুলে পড়ে পত্রবাহককে বলল, তুমি যাও। ডাক্তার ঘুম থেকে উঠলে দেব। পত্রবাহক ফিরে যেতেই ম্যাদাম লুজান এসে জানতে চাইল, কি খবর ম্যাদাম য়্যালাইদা?

সামান্য খবর। এবার অপারেশনে ডাক্তারকেই নেতৃত্ব করতে হবে।

কবে কাজ আরম্ভ হবে তা কিছু লেখা আছে কি ?

সে রকম কোন ইঙ্গিত নেই। বোধহয় ডাক্তার নিজেই জানে।

ম্যাদাম লুজান য়্যালাইদার পাশে এসে বসল। বলল, তোমার ভয় করে না ম্যাদাম ?

কিসের ভয় ?

এই যুদ্ধে আমার মত তোমার যদি দুর্ভাগ্য আসে।

সেটাই তো স্বাভাবিক। সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেকটি সদস্যই জানে, মৃত্যু তার জন্য প্রতীক্ষা করছে, যে-কোন সময়েই মৃত্যুর সঙ্গে পান্‌জা কষতে হতে পারে। এতে ভয় পাবার কি আছে ? আর আমি যে অনেক পেয়েছি ম্যাদাম লুজান। ডাক্তার চে-র মত অতুলনীয় একজন নেতার স্ত্রী হওয়া কি কম সৌভাগ্য। যে মানুষ জীবনে কাউকে ভয় করে না, সেই মানুষের স্ত্রী হয়ে আমি ভয় পাব মৃত্যুকে, অথবা মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে স্বামী হারাবার আতঙ্ককে। তা হতে পারে না। ও কথা কখনও মনে হয় না ম্যাদাম লুজান। এই অবস্থা আমি চিন্তাই করতে পারি না। তার চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

তোমার ইচ্ছা হয় না ডাক্তারকে আটকে রাখার ?

কপালে চোখ তুলে য়্যালাইদা বলল, কি বলছ ম্যাদাম! আমি আমার স্বামীকে বাধা দেব তার কর্তব্য পালনে, এও কি সম্ভব ? আমার কত গর্ব। আমি মেজর আরনেসতো চে গুয়েভারার স্ত্রী। একথা কোন সময়েই ভুলতে পারি না।

ম্যাদাম লুজান হার মানল।

বলল, তোমার মনের কথা জানবার চেষ্টা করছিলাম। আশা করি আমাকে ভুল বুঝবে না।

য়্যালাইদা হেসে বলল, পরীক্ষা দিতে আরম্ভ করেছি ষোল বছর

বয়স থেকে, এখন তো দুটি সন্তানের মা। আর পরীক্ষা দেবার মত অবস্থা আছে কি। আগের পরীক্ষায় যখন পাশ করেছি, তখন এ পরীক্ষায় ফেল করব বলে আশঙ্কা নেই।

চে ঘুম থেকে উঠতেই চিঠিখানা তার হাতে দিল য়্যালাইদা। চিঠিখানা পড়ে মুচকি হেসে ডাক্তার চে বলল, আমরা শুধু রক্তের নেশায় মেতেছি, একথা যে ঠিক নয় তার প্রমান এই চিঠি। ক্যাপটেন সিমপনির বিয়ে। তুমি যাবে য়্যালাইদা ? কাল সকালে চার্চে আমাদের রেজিস্টারের সামনে উপস্থিত হবে ক্যাপটেন সিমপনি আর মিস জ্যাকুইন । ওরা নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখছে। সে স্বপ্ন যাতে মধুর হয়, তার জন্য আমাদের যাওয়া উচিত। যাবে তুমি ?

যাব। কিন্তু সামনে যে পরীক্ষা, সে পরীক্ষা শেষ না করে কেন যে এই উৎসব !

তুমি খুশী হওনি ?

খুশী হয়েছি নিশ্চয়ই। মানুষ তো অতিমানুষ বা মহামানুষ হতে পারে না। মানুষ তার বৃত্তি নিয়েই চলবে। ক্যাপটেন সিমপনিও তাই চলবে। কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব পালন এখনও শেষ হয়নি ডাক্তার। তাই ভয় হয়, যদি ক্যাপটেন আর জ্যাকুইন বিলাসে মত্ত হয় তা হলে কর্তব্য পালনে অন্তরায় ঘটতে পারে। তাই সাফল্য সম্বন্ধে শঙ্কা জেগেছে মনে।

আমার বিশ্বাস দাম্পত্যজীবন মানুষকে বেশি কর্মানুরাগী করে। সেখানে ব্যক্তিস্বার্থের প্রশ্ন থাকে এবং সেই ব্যক্তিস্বার্থ আদর্শকে বিপন্ন করে।

সব ক্ষেত্রে তা সত্য নয়। যেমন তোমার ক্ষেত্রে।

আমাকে দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে ডাক্তার। তার চেয়ে সাধারণ মানুষ যা করে তা দিয়ে বিচার করা উচিত। আমি ব্যতিক্রম।

কিন্তু ওরা দুজনেই আদর্শবাদী এবং বিশ্বাস করে সর্বহারাতন্ত্রে।

আর সেজন্য ওরা সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এ রকম ক্ষেত্রে উভয়ে যদি একত্রে বাস করে, তার ফল নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তা হলেই আমরা খুশী হব। ছোট মন নিয়ে ছোটকে চিন্তা করার মত দুর্ভাগ্য যেন তাদের না হয়। এবার কি বাইরে বের হবে?

না। আজ বাড়িতেই থাকব য়্যালাইদা। যেদিন ইনজেকসনটা দিই, সেদিন কেমন যেন দৈহিক একটা ক্লান্তি অনুভব করি। অবশ্য যদি কঠিন কর্তব্য সামনে থাকে, তা হলে সেই ক্লান্তিকে মেরে ফেলে ছুটে বের হই। যদি সুযোগ থাকে তা হলে অন্তত বার-চোদ্দ ঘণ্টা বিশ্রাম নেবার চেষ্টা করি। কাল থেকে আর জড়তা থাকবে না। মাঝে মাঝে ভাবি, বাল্যকাল থেকে পঙ্গু করে রাখার জন্য এই যে ব্যাধি, একে জয় করতে কত না চেষ্টা করেছি। ব্যাধি আমাকে এখনও পঙ্গু করতে পারেনি, ব্যাধিকেই পঙ্গু করে রেখেছি। সেটা কতদিন সম্ভব হবে তা জানি না।

য়্যালাইদা চে-র হাত নিজের কোলে টেনে নিয়ে বলল, চিরকাল সম্ভব হবে।

সে রাতে গাউনটা পাশে রেখে য়্যালাইদা শোবার ব্যবস্থা করছিল। ডাক্তার চে তার দিকে তাকিয়ে গভীর কণ্ঠে বলল, তোমার জামার অভাব ঘটেছে দেখছি।

য়্যালাইদা হেসে বলল, আমাদের এই অঞ্চলে তো বস্ত্রশিল্প গড়ে ওঠেনি। বাইরে থেকে কাপড় না এলে লজ্জা নিবারণ সম্ভব কি? কিন্তু বাইরে থেকে মাল আনার অসুবিধা কত তাতো জান। আমার তো দু-তিনখানা গাউন আছে। অনেকেরই একটার বেশি নেই, তাও বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিধানের উপযোগী নয়। কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করতে হয়। আমরা রাতের বেলায় পরিধেয় খুলে রেখে ঘুমতে যাই পরিধেয় বস্ত্রাদির আয়ু বৃদ্ধি করতে।

ডাক্তার মোটেই দুঃখিত হল না। মনে মনে খুশী হল।

কিছু কম্বল সংগ্রহ করে দিতে পার?

শীতটা এবার বেশি।

দলের মেয়েরা বড়ই কষ্ট পাচ্ছে। তাদের জন্যই দরকার।

বোধহয় একটা মাস অপেক্ষা করতে হবে। যদি ইতিমধ্যে কিছু সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে তা পাঠিয়ে দেব। আর কিছু প্রার্থনা নেই তোমার ?

আমার জন্য কোন প্রার্থনাই নেই। আমাদের রাইফেলগুলো ভর্তি আছে, আহার্যের জন্য জই আর বার্লির অভাব ঘটছে না। কিছু কিছু ঘোড়া ও শূকরের মাংস পাচ্ছি। চর্বিও সংগ্রহ করতে পারছে দেশের লোকেরা। সবজীক্ষেতে সবজীও জন্মাচ্ছে কিছু কিছু। এর বেশি আর কি দরকার বল। বস্ত্র যা আছে, তাতে কেটে যাবে আরও চার ছ'মাস। দরকার কিছু কম্বলের। সেইটেই বলছিলাম।

তোমার ছেলেদের জন্য কিছু দরকার হতে পারে তো ?

না, তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুই পাচ্ছি। তারা যখন বড় হবে তখন শুনবে তাদের বাবা-মা কতদিন না খেয়ে থেকেছে দেশ থেকে ধনতন্ত্র উচ্ছেদ করতে, কতদিন বনে বনে ঘুরেছে, কতদিন গাছতলায় বিনা শয্যায় ঘুমিয়েছে, কতদিন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েও ভয়ে আদর্শ-চ্যুত হয়নি। তখন তাদের আর কোন আপশোষ থাকবে না।

আলো নিভিয়ে দিয়ে য়্যালাইদা শুয়ে পড়ল।

ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা কেমন একটা শান্তি অনুভব করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে য়্যালাইদাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কে দায়িত্ব নেবে বাতিস্তার প্রাসাদ আক্রমণের ? চ্যালেনজ দিল কাস্ত্রো।

আমি। আমি ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা দায়িত্ব

নিলাম বাতিস্তার প্রাসাদ আক্রমণ করার এবং বাতিস্তাকে বন্দী করার। অবশ্য যদি কোন ক্রমে সে পালিয়ে যায় গোলমালের মধ্যে, তা হলে আমি দায়ী নই।

উইং রক্ষার দায়িত্ব নেবে কে?

উত্তর দিকের দায়িত্ব আমার, বলল কামিলো।

আবার বলল, উত্তরে যত সৈন্যঘাঁটি রয়েছে, সবকে অকর্মণ্য করে দেবার দায়িত্বও আমার।

দক্ষিণের দায়িত্ব কে নেবে?

আমি, আমি জ্যাকুইন।

কেন্দ্রের দায়িত্ব আমার। বলেই ফিদেল কাস্ত্রো সমর-সজ্জার প্ল্যানের দিকে নজর দিয়ে বলল, বিমান ক্ষেত্রগুলো আগে অকেজো করতে হবে। স্থলবাহিনী, বিশেষ করে গোলন্দাজবাহিনীকে টেনে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। তা হলে প্রাসাদ রক্ষার জন্য কোন সৈন্যকে সময় মত পাবে না বাতিস্তা। ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্য-বাদকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে বাতিস্তার পতন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। আর তার জন্য চাই নিখুঁত পরিকল্পনা।

তোমার পরিকল্পনা তৈরী কর। আমি সমর-সজ্জা করি। বলেই চে উঠতে চেষ্টা করছিল। ফিদেল বাধা দিয়ে বলল, বস বন্ধু। গোটা প্ল্যানটা যদি তোমার চোখের সামনে না থাকে তা হলে সমন্বয় ঘটানো যাবে না। তার জন্য কিছু সময় বসতেই হবে।

বেশ, তাই হোক।

সবাই আবার ভাল করে বসল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে আলোচনা করে প্রোগ্রাম তৈরী হল। সর্বসম্মতিক্রমে প্রোগ্রাম তৈরী হতেই ফিদেল বলল, আমাদের এই আঘাত যদি সাফল্যলাভ করে তা হলে আগামী দিনে আমরা লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারব। আমাদের বিরোধ শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে। আমরা মানুষ, আমাদের

অনেকেরই সংসার আছে, অনেকেরই পিতামাতা বর্তমান। আমরা ভালবাসি স্ত্রীকে, সন্তানকে, স্বামীকে, পিতামাতাকে। আর আমরা ততোধিক ভালবাসি আদর্শকে। আদর্শ আমাদেরকে সংঘাতে টেনে এনেছে বুর্জোয়াদের হাত থেকে মুক্তি পেতে। যারা আমাদের সঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে এসেছে তারা নিরপরাধ। তারা চায় বাঁচতে এবং অপরকে বাঁচাতে। তারা সংসার ভালবাসে, প্রজনন দিয়ে সংসারের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে কিন্তু তাদের সামনে রয়েছে কর্তব্য। সে কর্তব্য বাঁচার ও বাঁচতে দেবার কর্তব্য। আমরা বুর্জোয়াদের আইন ধ্বংস করে সর্বহারার আইন চালু করতে চাই। সেই কাজে আমরা অনেক এগিয়েছি, আমাদের শেষক্ষণ সমুপস্থিত। এবার কিউবার শ্রেণীসংগ্রামের শেষ পর্যায়। আমরা যেন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি, যাতে দ্বিতীয়বার আঘাত হানার প্রয়োজন না হয়। আমার যথেষ্ট আস্থা আছে ডাক্তার চে-র ওপর, যথেষ্ট আস্থা আছে কমরেড কামিলোর ওপর, যথেষ্ট আস্থা আছে কমরেড জ্যাকুইনের ওপর, আর বিশেষ আস্থা আছে আমার নিজের ওপর। জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। আগামী রবিবারে আমরা যদি নতুন রাষ্ট্রের পত্তন ঘোষণা করতে পারি, তা হবে বিরাট গৌরবের।

সবাই সমস্বরে বলল, আমাদের সাফল্য নিশ্চিত।

যে যার নিজ নিজ কাজে চলে গেল।

ক্যাপটেন সিমপনি নব-বিবাহিত জ্যাকুইনের সঙ্গে মৃদুস্বরে আলোচনা করতে করতে এগিয়ে গেল জিপের দিকে। আগামী দিনের অভিযানে উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, সে সম্বন্ধেই আলোচনা করছিল ওরা।

ক্যাপটেন সিমপনি বলল, এবার যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাব তখন নিশ্চয়ই তুমি কাঁদবে।

তা কাঁদতে হবে বই কি! তবে তোমার মৃত্যু-সংবাদ না পেলে

চোখের জল ফেলব না, তাতে তোমার অমঙ্গল হবে। আর আমি যদি নিরুদ্দেশ হই ?

খুঁজবার অবসর পাব না। তুমি চিরকালের জন্যই অজ্ঞাত রয়ে যাবে।

হাসল দুজনেই।

ছুটল তাদের জিপ। পেছনে জিপের চাকার আঘাতে ধূলোর কুণ্ডলী পাকানো বাতাসে জিপ অদৃশ্য হল। মুখর ছিল যে অঞ্চল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তা নীরব হয়ে গেল। কিছুক্ষণ আগে যে সেখানে বহু জনসমাগম হয়েছিল তার চিহ্নও দেখা গেল না।

হাভানার প্রাসাদে বাতিস্তা চিন্তা করছে কিউবার ভবিষ্যত। আমেরিকার সামরিক সাহায্য পেয়েও কেন যে বিপ্লবীদের রুখতে পারছিল না, তা ভাবতে ভাবতে বাতিস্তা উন্মাদ প্রায়।

আটান্ন সালের ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।

সোনালী রোদে ঝলমল করছে পৃথিবী। কদিন আগে যে আঘাত হেনেছে মুক্তিযোদ্ধারা তার ক্ষত রয়েছে শহরের নানা স্থানে, বিশেষ করে সরকারী প্রশাসন-পরিচালনার অট্টালিকায়।

আমেরিকা থেকে বাতিস্তার পুরাতন বন্ধু কূটনীতিবিশারদ উইলিয়ম পাউলে এসেছে বাতিস্তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে। বাতিস্তা সাদরে তাকে ডেকে নিয়েছে প্রাসাদে।

পাউলে বলল, যে কোন উপায়ে হোক ফিদেলকে পরাজিত করতে হবে।

আমিও তাই চাই। কিন্তু আমরা যেভাবে বেষ্টিত হয়ে পড়েছি, তাতে মনে হচ্ছে একমাত্র সামনের সমুদ্রপথ ছাড়া আর কোন পথ নেই আত্মরক্ষার। তোমরা তো অনেক সাহায্য করেছ, কিন্তু ফিদেলের জনসংগঠন এত শক্তিশালী যে কোন রকমেই তাকে বাধা দিতে পারছি না।

আমরা প্রয়োজন হলে য়্যাটম দিয়ে সাহায্য করব।

তাতে কি লাভ! মরবে তো কতকগুলো নিরীহ মানুষ। গোরিলারা রইবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। তোমাদের বিমানবাহিনী ফিদেলকে বিতাড়িত করতে তো কম চেষ্টা করেনি, কিন্তু You killed women and children in Playa Giron (Bay of Paigs). এরপর সাধারণ মানুষকে কি দোষারোপ করা যায়! কিন্তু এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চালিয়েও তো আমরা কোন ফল লাভ করতে, পারিনি। তোমরা স্বাধীন বিশ্বের স্বপ্ন দেখছ। সেই স্বাধীনতার নামে তোমরা শিশু-নারীকে হত্যা করেছ। আর সেই হত্যার পুরোধা আমি স্বয়ং। And you did it in the name of liberty, democracy and free enterprise, তা কি সত্য?

পাউলে বলল, তোমার নৈতিকশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছ বন্ধু। স্বাধীনতা, বিশেষ করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। আরও, আরও কঠিনভাবে আঘাত করতে হবে বিশ্বের শত্রু কম্যুনিষ্ট দানবদের নিশ্চিহ্ন করতে। তার জন্য কোথাও কোন দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। আমরা সমগ্র দেশকে কবরখানায় পরিণত করতেও পেছ-পা হব না শুধুমাত্র স্বাধীন বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে। তুমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ। এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতেই হবে তোমাকে। তোমার যদি সাহস না থাকে তা হলে একটা care taker government-এর হাতে প্রশাসন ব্যবস্থা ছেড়ে দাও। আমরা সেই care taker government-কে পরিচালনা করব। আমরা শতগুণ বেশি সামরিক সাহায্য দিয়ে ফিদেল কাস্ত্রোকে চিরকালের মত স্তব্ধ করে দেব। আমাদের সচিব মহামতি ডালেস এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। তুমি রাজি হলেই আমরা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি।

বাতিস্তা অনেকক্ষণ ভেবে বলল, তোমার প্রস্তাব খুবই সময়োপযোগী। কিন্তু আমি এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।

পাউলে উত্তেজিতভাবে বলল, তুমি নিজেও সামলাতে পারবে

না, আবার আমাদেরকেও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে দেবে না, তা হতে পারে না। আমেরিকার এত নিকটে কোন ক্রমেই একটা দস্যুদের ঘাঁটি করতে দিতে পারি না।

আমাকে ভাবতে দাও বন্ধু। কিউবাকে আমি ভালবাসি। আমার প্রশাসন ব্যবস্থা যদি দেশের মানুষ না চায় তার জন্য আমি দায়ী। আমার কর্তব্য, হানাহানি বন্ধ করে যারা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি তাদের হাতে শাসনভার তুলে দেওয়া। তবুও আমার সামর্থ্য অনুযায়ী বাধা দেব কাস্ত্রোকে। যদি সাফল্যলাভ করতে না পারি তার জন্য আমার দায়িত্ব রইবে। অপরকে কোন দায়িত্ব বহন করতে হবে না।

তোমার মতিস্থির এখনও হয়নি। আজ রাতটা তুমি ভেবে দেখ। আগামীকাল আবার আমরা আলোচনা করব। তোমার সুচিন্তিত অভিমত নিশ্চয়ই পাব।

বাতিস্তা ব্যস্ততার সঙ্গে বলল, আমার সুচিন্তিত অভিমত তোমাকে তো বলেছি। আমার কাজ আমি করে চলব। তোমার প্রস্তাব যতই যুক্তিযুক্ত হোক, তা গ্রহণ করতে পারব না। তবুও ভেবে দেখব তোমাদের সাহায্য নেওয়া উচিত হবে কিনা।

পাউলে স্থিরভাবে বাতিস্তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, জন-সাধারণ কি বলছে জান? তারা বলছে, Scarcely a transaction, a contract or a concession was negotiated here without incredibly large percentage going to Batista. অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই তুমি উৎকোচ নিয়েছ, তাই জনমনে তোমার প্রতি কোন শ্রদ্ধা নেই। সেজন্য তোমার উচিত গদী ত্যাগ করে কোন care taker সরকার গঠনে সাহায্য করা।

বাতিস্তা বলল, যারা আমাকে উৎকোচগ্রহণকারী বলে, তারা ভুল বলে না বন্ধু। কিন্তু কাল যদি আমি ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হই, তখন আমার পেটের ভাত কোথা

থেকে জুটবে বলতে পার ? আমার ভবিষ্যত চিন্তা করেই আমাকে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়েছে। এর জন্য আমার মোটেই ক্ষোভ নেই।

তবুও তুমি কোন care taker সরকার গঠনে রাজি নও ?

বর্তমানে নই। ভবিষ্যতে কি হবে তা বলতে পারি না।

পাউলে ক্রুদ্ধভাবে বিদায় নিল।

সেই রাতেই আমেরিকায় ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করল তার ওপর-ওলার কাছে। সবাই চিন্তিত হল। বাতিস্তার পতন যে আসন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না কোন ইয়াঙ্কির। সমগ্র কিউবাই প্রায় দখল করেছে মুক্তিফৌজ। হাভানা আর তার উপকণ্ঠকে কোন ক্রমে রক্ষা করছিল বাতিস্তার পেশাদারী আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট সৈন্যরা। তারাও শঙ্কিত। কোন সময়ই তারা সাহস করে ছাউনীর বাইরে যেত না। শহরে, সামরিক ছাউনীতে, প্রাসাদ-রক্ষীর মনে সব সময় আতঙ্ক। কখন কোথা থেকে যে আক্রমণ আসবে, তা জানা নেই কারও।

ডিসেম্বর মাসটা প্রায় পেরিয়ে গেছে।

নতুন বছরের ঘণ্টা শোনার অপেক্ষা করছে সবাই। যীশুর পবিত্র জন্মদিবসে উৎসব হচ্ছে। হাভানাতেও উৎসব হচ্ছে। অবশ্য সাড়ম্বরে নয়। সবাই কোন রকমে জন্মদিন পালনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। এমন সময় কঠিন আঘাত হানল মুক্তিসেনারা।

বাতিস্তা ও তার বাহিনী কোন সময়ই ভাবতে পারেনি এত শক্তিশালী এই মুক্তিফৌজ। আঘাতটা যে ব্যাপক হবে তাও ভাবতে পারেনি। পেশাদারী সৈন্যরা মরিয়া হয়ে হাভানা রক্ষায় নেমে পড়ল। বাতিস্তা তার প্রাসাদে বসতে সাহস পেল না। সেও বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তার প্রাসাদ-রক্ষীদের পাশে। চারিদিকে তখন ছুটছে আগুনের হল্কা। কামান, বন্দুক আর বোমার আওয়াজে

কানে তালা লাগার উপক্রম। শহরের অসামরিক ব্যক্তিরা সবাই আত্মরক্ষার তাগিদে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। মাঝরাত থেকে শেষরাত অবধি হানাহানির শেষ নেই।

হঠাৎ থেমে গেল বন্দুক, কামানের আওয়াজ, থেমে গেল ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনীর ভয়ঙ্কর চলাচলের শব্দ। আকাশে আর দেখা গেল না বিমানের আনাগোনা।

সকাল হল।

শহরের দোকান-পাট বন্ধ। গাড়ি-ঘোড়া একটাও নেই। সদর রাস্তার গলিতে পড়ে আছে কতকগুলো মৃতদেহ। অধিকাংশই পেশাদারী সৈনিকের। কোথাও ভেঙে পড়ে আছে প্যাটান ট্যাঙ্ক, কোথাও ভেঙে পড়ে আছে সৈন্যবাহী লরী, কোথাও তখনও আগুন জ্বলছে সৈন্যবাহী জিপে। কবরখানার চেয়েও শান্ত শহর, মৃত শহরের মত হাভানার চেহারা।

বাতিস্তা হাঁফ ছেড়ে প্রাসাদে ফিরে এল।

ডেকে পাঠাল তার সৈন্যাধ্যক্ষদের।

তোমরা বুঝতে পারছ আমার পরিস্থিতি ?

নিশ্চয়।

পরবর্তী কার্যক্রম কি ?

আমরা ভাবছি প্রেসিডেণ্ট। আমাদের শক্তি যেভাবে ক্ষয় হচ্ছে, তাতে এই আক্রমণকে বেশি দিন প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না বলেই আশঙ্কা আছে।

কিসের অভাব ? অস্ত্রের অভাব ? আহার্যের অভাব ? সৈন্যের অভাব ?

না অভাব মনোবলের। অকর্মণ্য প্রমাণিত হয়েছে আমেরিকার অস্ত্র, অখাদ্য মনে হচ্ছে আমেরিকার দেওয়া খাদ্য, হীনবল হয়েছে ভাড়াটিয়া সৈন্য। কারণ এ যুদ্ধ তো চোরাগোপ্তা। আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি যুদ্ধ করার সামর্থ্য গোরিলাদের নেই, কিন্তু কে যে

আমাদের শত্রু, তা তো আমরা জানি না। কোথা থেকে গুলী আসছে, কোথা থেকে আক্রমণ হবে তা আমরা জানতেই পারছি না। এমন অবস্থায় যুদ্ধ পরিচালনা সম্ভব কি? তবুও আমরা রাজধানী রক্ষায় মরিয়া হয়ে লড়ছি।

বাতিস্তা চিন্তা করে বলল, নিষ্ফল এই নরহত্যা।

উপায় নেই মিস্টার প্রেসিডেণ্ট। আজ যুদ্ধ বিনা পথ নেই।

বাতিস্তা বিদায় দিল তার সৈন্যবাহিনীর নেতাদের।

আরও কদিন কেটে গেল নির্বিঘ্নে। গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল, গোরিলারা পালিয়েছে। সে রাতে আমাদের ক্ষতি যথেষ্ট হয়েছে, গোরিলাদেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তারা পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে নেই। বোধহয় তার চেয়েও বেশি।

বাতিস্তা আদেশ দিল তার সৈন্যদের দখল করতে গোরিলামুক্ত অঞ্চল।

সরকারী সৈন্যরা ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেল, বিমান বাহিনী প্রস্তুত হল শত্রুকে দেখামাত্র আঘাত বরতে, নৌ-সৈন্যরা কামানে গোলা ভর্তি করে উপকূল রক্ষার জন্য প্রস্তুত হল।

বেশ নির্বিঘ্নে কাটল বছরের প্রায় শেষ কটা দিন।

বছরের শেষ দিন এগিয়ে এল।

আজ একত্রিশে ডিসেম্বর। গির্জায় রাত বারটায় ঘণ্টা-ধ্বনি হতে থাকে। নতুন বছরকে স্বাগত জানাল কিউবার মানুষ। আগামী দিন যাতে মঙ্গলময় হয়, তার জন্য প্রার্থনা জানাল শান্তিপ্রিয় মানুষেরা। এই ভয়ঙ্কর পরীক্ষা পার হয়েও যে নতুন বছরকে তারা অভিবাদন জানাতে পেরেছে, এর জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সবাই।

তানিয়া, আজ কত তারিখ?

একত্রিশে ডিসেম্বর। আটান্ন সালের শেষ দিন। উত্তর দিল তানিয়া।

নতুন বছরে অত্যাচার অব্যাহত রাখার অধিকার নিশ্চয়ই বাতিস্তাকে দেওয়া যায় না, কেমন ?

ঠিক বলেছ ডাক্তার। উনষাট সালের প্রথম দিনেই নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে সমগ্র কিউবার মানুষকে।

তার জন্য আমাদের প্রস্তুতি আছে কি ?

নিশ্চয় আছে। আমাদের গুপ্তচর যে সংবাদ দিয়েছে বাতিস্তাকে, তার সুফল দেখা গেছে। রাজধানী থেকে অনেক সৈন্যই বাইরে গেছে গোরিলা অধিকৃত অঞ্চলকে কব্জায় আনতে।

বিমানঘাঁটি সক্রিয় আছে নিশ্চয়ই।

তা আছে।

নৌ-বাহিনীও প্রস্তুত ?

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে নৌ-বাহিনী যুদ্ধে যোগ দিলে তা হবে আত্মঘাতী। শহর গুঁড়ো হবে তাদের কামানের গোলায়, অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না।

আমাদের বক্তব্য ছেপে সৈন্যবাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে কি ?

নিশ্চয় দেওয়া হয়েছে।

তা হলে অস্ত্র তুলে নাও হাতে। আজ রাত বারটায় যখন নতুন বছরকে অভিনন্দন জানাবে সবাই গির্জার ঘণ্টা বাজিয়ে, সেই ঘণ্টার শব্দ থামতে না থামতেই যেন আমাদের অস্ত্র গর্জে ওঠে।

কিন্তু…।

এর মধ্যে কিন্তু নেই তানিয়া। আমাদের আজ মরণপণ যুদ্ধ করে বাতিস্তার প্রাসাদ দখল করতেই হবে। আমাদের দখল করতে হবে বেতার-ঘাঁটি, আমাদের দখল করতে হবে বিমানক্ষেত্র, আমাদের ঘিরে ফেলতে হবে ফৌজ-ছাউনী। এ সবের দায়িত্ব নিতে হবে সবাইকে।

আমার স্থান নির্দেশ করে দাও, ডাক্তার।

তার আগে আমি সবচেয়ে বিপদসঙ্কুল স্থান ও কাজ নিজের মাথায় তুলে নিতে চাই। প্রাসাদ দখল করব আমি। কামিলো যাবে বিমানক্ষেত্র দখল করতে, তুমি বেতার-ষ্টেশন দখল করেই ফিদেলকে দিয়ে সময় ঘোষণা করাবে। জ্যাকুইন সৈন্যবাহিনী বেষ্টন করার দায়িত্ব নেবে। অবশ্য এ বিষয়ে সবার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করা দরকার। সেই আলোচনায় তুমি উপস্থিত থেকো তানিয়া। য়্যালাইদাকেও তোমার কাজে সাহায্য করতে ডেকে নিও।

মন্ত্রণাসভা বসেছিল। কয়েক মিনিটেই সভা শেষ।

গির্জার ঘণ্টা বাজা তখনও শেষ হয়নি। শোনা গেল কামানের শব্দ, শোনা গেল বোমার শব্দ, শোনা গেল বিমানের গর্জন।

আবার সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ মাঝরাতে।

ভোরের আলো তখনও ফোটেনি। আধা আলো, আধা অন্ধকারে বুলেটপ্রুফ একখানা গাড়ি ছুটে বের হল প্রাসাদ থেকে। বিদ্যুৎবেগে ছুটছিল অসামরিক বিমানঘাঁটির দিকে। বিমানঘাঁটির প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকে গাড়িখানা এসে দাঁড়াল রানওয়েতে। সেখানে অপেক্ষা করছিল একটি অসামরিক যাত্রীবাহী বিমান।

গাড়ি থেকে নেমে একজন ছুটে গিয়ে উঠল বিমানে। সঙ্গে সঙ্গে বিমানের গর্জন শোনা গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমান ভূমি ছেড়ে আকাশে উড়ল। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কে গেল ?

বিমান বন্দরের অধ্যক্ষ জানাল, প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তা কিউবা ছেড়ে চলে গেল চিরদিনের মত।

তানিয়া তখন তার দলবল নিয়ে বেতার-কেন্দ্র দখল করে বসেছে। য়্যালাইদা খুঁজছে ফিদেলকে। খুঁজতে খুঁজতে ফিদেলকে পেল প্রাসাদ-সংলগ্ন চৌরাস্তার মুখে।

শীগ্‌গির এস ফিদেল। বলল য়্যালাইদা।

কোথায় ?

বেতার-কেন্দ্রে। ভাষণ দিতে হবে। বাতিস্তা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। সরকারী সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে।

কিন্তু··· ।

কোন কিন্তু নেই। তুমি মহানায়ক, তোমার বক্তব্য শুনতে দাও জাতিকে।

তা ঠিক, তবে প্রেসিডেন্ট চাই। দেশ থাকবে, প্রশাসন থাকবে। অথচ প্রশাসক থাকবে না। তা হতে পারে না। ডাক সবাইকে। এই যুদ্ধক্ষেত্রেই আমরা নির্বাচন করব কিউবার প্রেসিডেন্ট ।

মুক্তিসেনারা সমবেত হল ফিদেলের আহ্বানে।

সবাই বলল, কিউবার নতুন প্রেসিডেন্ট হবে ম্যানুয়েল উরুশিরা লিও।

সর্বসম্মতিক্রমেই স্থির হল লিও হবে কিউবার প্রেসিডেন্ট ।

সকাল বেলায় কাস্ত্রোর কণ্ঠ শোনা গেল হাভানা বেতারে।

কাস্ত্রো কিউবান নাগরিকদের আহ্বান করে বলল, বন্ধুগণ, আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। নতুন বছরের নতুন দিনে নতুন সংবাদ হল আমরা আজ মুক্ত হয়েছি ফ্যাসীবাদের হাত থেকে এবং ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে। আজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ। বাতিস্তা পালিয়ে গেছে আমেরিকায়। বাতিস্তার সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। আমরা আজ মুক্ত ও স্বাধীন। আমরা নতুন সর্বহারা নায়কত্বে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে এগোতে চাই। আমাদের এই নতুন রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বীর সেনানী ম্যানুয়েল উরুশিরা লিও।

আমাদের লড়াই এখনও শেষ হয়নি। আমেরিকা ওঁৎ পেতে রয়েছে। সুযোগ পেলেই আমাদের এই সদ্যজাত রাষ্ট্রকে আঘাত করবে ধ্বংস করতে। তাই আপনারা সব সময় সতর্ক থাকবেন।

বুর্জোয়ার প্রভাব যাতে আমাদের দেশে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য অতন্দ্র প্রহরা দিতে কেউ যেন ভুলবেন না। আমাদের জয় হয়েছে, সর্বহারাদের জয় হয়েছে। আমাদের এই নতুন রাষ্ট্র দীর্ঘজীবী হোক।

ফিদেল কাস্ত্রো বক্তব্য শেষ করে নেমে এল।

ওদিকে প্রাসাদশীর্ষে মুক্তিফৌজের রক্তপতাকা পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। পতাকার দণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মেজর আরনেসতো চে গুয়েভারা বীর সেনানীদের অভিবাদন গ্রহণ করছিল সেখানে।

কিউবার আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি। বাতিস্তা পালিয়ে গেলেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখনও আশা করছে, আমেরিকার সাহায্যে কাস্ত্রোকে বিতাড়িত করা সম্ভব। তার জন্য গোপনে অনেক সলাপরামর্শ চলছিল। প্রতিবিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল কিউবার চতুর্দিকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে ধ্বংস করার চক্রান্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে এগিয়ে চলেছে আমেরিকার দালালরা। কাস্ত্রো সব সময় এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা দিচ্ছিল।

শক্তি সংহত করতে সমাজতান্ত্রিক প্রশাসনকে কায়েম করতে মুক্তিযুদ্ধের নেতারা দিবারাত্র পরিশ্রম করছে, নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরী করে তাকে কার্যকরী করতে উদয়াস্ত ছুটে বেড়াচ্ছে।

কাস্ত্রোর নিকট সহচর ও সহকর্মী কামিলো সিয়েলকিউগোম আর চে গুয়েভারা সব চেয়ে ব্যস্ত।

কামিলো গিয়েছিল ক্যামাগুয়েতে।

ফেরবার পথে বিমান-দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হল হাভানার উপকণ্ঠে।

আটাশে অক্টোবর উনষাট সাল।

সংবাদ পৌঁছল কাস্ত্রোর কাছে। সংবাদ শুনেই কান্নায় ভেঙে পড়ল কাস্ত্রো। শিশুর মত হাউ-হাউ করে কাঁদতে থাকে কিউবা মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। কামিলোর মৃত্যু যে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করল, তা পূরণ করা সম্ভব কিনা, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলল ক'দিন ধরে।

ওদিকে Operation Forty কিউবার অশান্তি সৃষ্টি করতে এগিয়েছে। প্রতিবিপ্লবীরা এগোবে আর পেছন পেছন আসবে এই দল। আধা সামরিক, আধা অসামরিক ওরা। ওরা কায়েম করবে প্রতিবিপ্লবীদের শাসনতন্ত্র।

আমেরিকা প্রচার করতে থাকে, আমরা কিউবার জনসাধারণকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেব, ব্যক্তি স্বাধীনতা দেব, সামাজিক ন্যায়-বিচারদেব। কম্যুনিষ্টরা যা দেয়নি, দেবে না কোন দিন, তাই আমরা দেব।

তারা প্রতিবিপ্লবের সহযাত্রী হতে আমন্ত্রণ জানাল কিউবার মানুষকে।

সংবাদ পৌঁছল কাস্ত্রোর কাছে।

শুনে হেসেছিল কাস্ত্রো। পাশে ছিল ডাক্তার চে গুয়েভারা।

কাস্ত্রো বলল, ইয়াঙ্কীর প্রচার-নমুনা দেখছ তো। ওরা এই কথাই বলেছিল গুয়েতেমালায়। আমরা গুয়েতেমালায় সর্বহারার শাসন কায়েম করার বুনিয়াদ তৈরী করে এসেছিলাম। আর গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর সামাজিক ন্যায়বিচারের বড় বড় বুলি শুনিয়ে সেখানে সামরিক শাসন কায়েম করেছে আমেরিকা। প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সৈন্য নামিয়ে নির্বাচিত সরকারকে তাড়িয়েছে। এরা আবার গণতন্ত্রের কথা বলে, আশ্চর্য! কিন্তু আমাদেরও বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। আমেরিকার দালালরা যাতে কোনক্রমেই কদম না রাখতে পারে আমাদের এই পবিত্রভূমিতে, তার জন্য অতন্দ্র প্রহরা দরকার।

আমরা বুকের রক্ত দিয়েছিলাম গুয়েতেমালায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে। সে কথা মোটেই বিস্মৃত হইনি বন্ধু। কামিলো সেদিন যে শৌর্য আর বীর্যের পরিচয় দিয়েছিল, তা চিরদিন মনে থাকবে। গোরিলা যুদ্ধের নতুন নতুন পরিকল্পনা স্থির করেছিল কামিলো। আজ সেই কামিলো আমাদের মধ্যে নেই। সে থাকলে গুয়েতেমালার চিত্র ভাল করে দেখিয়ে দিতে পারত। সব চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা হল, সাধারণ মানুষ আজও কি করে বিশ্বাস করে আমেরিকার মিথ্যা ফাঁকা কথায়, এইটেই বিস্ময়কর। সবার সামনে রয়েছে কোরিয়া, গুয়েতেমালা, ভিয়েতনামের দৃষ্টান্ত। অথচ তাতেও কেন যে আমেরিকাকে বিশ্বাস করে, সেইটেই আশ্চর্য।

তানিয়া পাশে বসেছিল। গম্ভীরভাবে সে বলল, গণতন্ত্র। আমেরিকার ইয়াঙ্কীরা গণতন্ত্র বলতে মুক্তকণ্ঠ। গণতন্ত্রের গলা টিপে কেমন করে মারতে হয়, তার দৃষ্টান্ত রয়েছে গুয়েতেমালায়। জন-নির্বাচিত প্রতিনিধি হল গণতন্ত্রের আদর্শ, অথচ গুয়েতেমালায় হয়েছে উল্টোটা। প্রেসিডেন্ট আরবেন্জ পেয়েছিল দু লক্ষ সাতষট্টি হাজার ভোট আর তার বিপক্ষ প্রার্থী পেয়েছিল মাত্র তিরিশ হাজার ভোট। এর চেয়ে বড় গণতন্ত্রের নিদর্শন কোথায় পাবে। কিন্তু আমেরিকা তা সহ্য করতে পারল না। কারণ আরবেন্জ প্রেসিডেন্ট থাকলে বিশ্বকম্যুনিষ্ট আন্দোলন সেখানে স্থায়ী আস্তানা করবে, এ আশঙ্কা ছিল মার্কিন যুদ্ধবাজদের। প্রতিবিপ্লব ঘটাবার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন প্রত্যক্ষভাবে মার্কিন সরকার সৈন্য পাঠাল আরবেন্জকে তাড়াতে। হণ্ডুরাস থেকে আমেরিকার সহায়তায় কর্ণেল বারনোস কাসটিলো আরমাস আক্রমণ করল গুয়েতেমালা। দশ দিনের যুদ্ধে দশ বৎসর ধরে সমাজতন্ত্রের যে বনিয়াদ তৈরী হয়েছিল গুয়েতেমালায় তাকে ধ্বংস করে ফ্যাসীবাদী বুর্জোয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত করল কর্ণেল আরমাস আর তাতে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিল মার্কিন সৈন্য।

চে গুয়েভারা চুরুটে টান দিতে দিতে বলল, অথচ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেছিল, "Any nations right to a form of Government and an economic system of its own choosing is inalienable···. Any nations attempt to dictate to other nations their form of Government is indefensible"–অপরের ওপর নিজেদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া মার্কিন নীতি নয়। কিন্তু গুয়েতেমালায় তাই করেছে আমেরিকা। আমেরিকার মুখের কথা আর কাজ কোন সময়ই এক নয়। তাদের যারা বিশ্বাস করে, তাদের মত মূর্খ গোটা পৃথিবীতে আর নেই। তাই আমেরিকার নয়া উপনিবেশবাদ হল পৃথিবীর পক্ষে সবচেয়ে ভীতির কারণ।

তানিয়া বলল, ইংরেজও আমেরিকার এই কাজ সমর্থন করতে পারেনি। তারাও বলেছে, this was a plain act of aggress-ion. কিন্তু চোরা কি ধর্মের কাহিনী শোনে। দুর্বল জাতিকে আমেরিকার তাঁবেদার করতে আমেরিকা সর্বপ্রকার অন্যায় করতে প্রস্তুত। এই জলদস্যুদের না আছে কোন ধর্ম, না আছে কোন নীতি, না আছে কোন কালচার। এরা লুঠেরা। এদের লুণ্ঠন বন্ধ করাই হল মানুষ মাত্রেরই ধর্ম।

ফিদেল বলল, আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট কেনেডি স্থির করেছে, কিউবাকে অধিকার করতে আমেরিকা সর্বপ্রকারে মদত জোগাবেই। "Go ahead with in invasion plan"—কি গর্বিত উদ্ধৃতি। আর এই কাজে একদিন আমাদের যে সব উদারপন্থী সহচর ছিল, তাদের কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছে 'সিয়া' (C. I. A.)। এটা আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু জ্যাকুইন সানজেনিসের মত লোকও কি ভাবে এদের এই গণবিরোধী কাজে যোগ দেয় তাই ভাবছি। কাস্ত্রো বিরোধী যে দল গড়েছে 'সিয়া', তার নেতৃত্ব করছে ক্যাপটেন আরটাইম, ক্যাপটেন জোস সান-

রোনান, ক্যাপটেন ভিল্লাফানা। আমেরিকার পদলেহী এইসব সারমেয় দল ঘেউ-ঘেউ করবে, কিন্তু তা থেকে বিপদ যে কোন সময় আসতেও পারে। আমাদের কাজ হল সতর্ক হওয়া।

তানিয়া বলল, আমাদের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জনসংগঠনকে জোরদার করা। উপকূলবর্তী অঞ্চলে যাতে কেউ পা রাখতে না পারে, তার জন্য গণবাহিনী গঠন অবিলম্বে প্রয়োজন।

ফিদেল বলল, কামিলো তার জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিল। কিন্তু তাকে হারিয়ে আমরা যেন অনেক কিছু হারিয়ে ফেললাম।

চে বলল, কামিলোকে হারাবার দুঃখ ভুলতে পারছি না, কিন্তু তার স্থান পূরণ করা অবিলম্বে প্রয়োজন। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো এ বিষয়ে অতি বিশ্বস্ত কমরেডদের মধ্য থেকে কাউকে চার্জ বুঝিয়ে দেবে, এই আশা করছি আমরা।

নিশ্চয়, নিশ্চয়। বলে তানিয়া সমর্থন জানাল।

কিন্তু তুমি কি করবে মেজর?

আমি ছুটি নেব বন্ধু। আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করব আমার পল্লীকুটিরে বসে। তারপর স্থির করব পরবর্তী কার্যক্রম। আমার কাজ হল সমাজ সেবা। মুক্তিযুদ্ধের কাহিনী পৃথিবীর মানুষকে জানিয়ে দিতে চাই। বিশেষ করে যারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্বাস করে এবং যারা সেই পথে চলতে চায়, তাদের জন্য আমি লিপিবদ্ধ করে রাখতে চাই আমাদের অভিজ্ঞতা। আমাদের উত্তর পুরুষ এই অভিজ্ঞতাকে ভুল-ভ্রান্তিহীন করে আরও যাতে সক্রিয় করতে পারে, সেটা করাই হল আমার বর্তমান কাজ।

দেশ এখনও বিপন্ন।

দেশের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করবে রাষ্ট্রনায়করা। আমরা সমাজ-সেবী অক্লান্ত যোদ্ধা, আমাদের কাজ দেশকে সেবা করা। আমরা তা করেছি। যদি প্রয়োজন হয়, আবার আমরা বুকের রক্ত দিয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে আসব। আমরা যে স্থানে

এখন দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে প্রয়োজন একজন শক্ত প্রশাসকের। সে কাজ সম্পূর্ণ করার যোগ্যতা কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর আছে।

কথা শেষ করেই চে হাঁপাতে লাগল।

তোমার হাঁপানীটা আবার যেন বেড়েছে ?

হাঁ।

আমাদের চিফ. মেডিকেল অফিসারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, সে তোমার চিকিৎসার দায়িত্ব নিক। তুমি নিজে ডাক্তার হয়েও নিজের শরীরের কথা কখনও ভাবছ না। এটা ভাল নয় মেজর।

আমিও ভেবেছি ভাল করে চিকিৎসা করা দরকার।

কারণ তোমাকে জীবিত ও কর্মক্ষম অবস্থায় আমরা পেতে চাই।

ঠিক বলেছ তানিয়া।

আমি আজই ব্যবস্থা করছি। তুমি তোমার পল্লীভবনে আজই চলে যাও। বিশ্রাম কর। আর লিখতে থাক কিউবার মুক্তিযোদ্ধাদের কাহিনী। চিকিৎসা চলবে যতদিন তুমি নিরোগ না হও, অন্তত রোগকে বশ্যতা স্বীকার করাতে না পার, ততদিন তুমি তোমার পল্লী কুটিরেই থাকবে।

চে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, বেশ, তাই হবে।

সামনের ছোট্ট বাগানে টেবিল চেয়ার পেতে সকালের মিঠে রোদ পোহাচ্ছিল চে গুয়েভারার পরিবার। য়্যালাইদা কোকো তৈরী করে স্বামীর সামনে রাখতেই চে বলল, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পদ্ধতি লিখে রাখতে চাই য়্যালাইদা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমাজতন্ত্রকে কেউ যদি লিখতে চায়, তা হলে আমাদের এই অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিককে সাহায্য করবে। কিন্তু শরীরটা বড়ই বেচাল করছে। পারবে তুমি লিখতে ? আমি বলে যাব আর তুমি লিখবে। পারবে ?

পারব।

সব দিন লিখতে হবে না। যেদিন আমার লেখার সামর্থ্য থাকবে না শুধু সেদিনই লিখতে হবে।

যখনই তুমি বলবে তখনই লিখব।

কোকো খাওয়া শেষ করে বড় ছেলেটার হাত ধরে বাগানে পায়চারি করতে করতে চে বলল, গুয়েতেমালায় যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তাকেই কাজে লাগিয়েছি কিউবাতে। কিউবার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে গোটা লাতিন আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধে। আরে, এই যে ডাক্তার ক্যারোল, কি খবর?

ডাক্তার ক্যারোল গাড়ি থেকে নেমে বাগানের দরজা ঠেলে সোজা ঢুকছিল ভেতরে। চে-র গলার শব্দ শুনে উত্তর দিল, তোমাকে পরীক্ষা করতে এসেছি মেজর।

ভালই করেছ। ক'দিন থেকে হাঁপানীটা বড়ই কষ্ট দিচ্ছে। কেমন প্যাসম্ জমেছে বুকে। ভাবতেই পারছি না এত শ্লেষ্মা কোথা থেকে এল।

তুমি নিজে ডাক্তার। নিশ্চয়ই জানো হাঁপানী কোন রোগ নয়, এলার্জি। খুঁজে দেখতে হবে কোথা থেকে এলার্জি সৃষ্টি হচ্ছে। দরকার মনে করলে অপারেশন করতে হবে। তারপর মিসেস চে, তোমার সন্তানরা ভাল আছে তো?

য়্যালাইদা মাথা নেড়ে বলল, এই তো দেখছ। ভালই আছে। তুমি চে-কে তাড়াতাড়ি চাঙ্গা করে দাও ডাক্তার। ওর অনেক কাজ। এতকাল ভূমি-সংস্কারের দায়িত্ব ছিল। এখন অর্থ-দপ্তরের ভার পেয়েছে। দেশের অনেক কাজ এখনও যে বাকি।

আমার কি সাধ্য। সেবা করতে হবে, বিশ্রাম নিতে হবে। সারাটা জীবন কেটে যাচ্ছে মাঠে, বনে, পর্বতে। কোনদিন খাবার জুটেছে, কোনদিন জোটেনি। এই তো ডাক্তার চে-র জীবন। তার ওপর রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব। বাপরে! শরীর তো কতকগুলো যন্ত্রের সমাহার। যত্ন না করলে যন্ত্র বিকল হবেই। এইবার তোমার

কাজ। যেমন করে হোক ওকে ঘরে আটকে রাখতে হবে, সেবা করতে হবে।

আমার কাজের কোন ত্রুটি নেই। তবে ঘরে আটকে রাখাটা আমার সাধ্য নয়। দেশের ডাক এলে যে কোন সময় ছুটে বের হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বরং তুমি যদি ধমকে দাও, তা হলেই কাজ বেশি হতে পারে। নইলে রাতের পর রাত জেগে ফাইল দেখবে, কখনও বাইরে ছুটবে, কখনও লিখবে।

তা হলে বলতে চাও, তোমার ভালবাসা ওকে আটকে রাখতে পারে না।

আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, তার চেয়েও বেশি ভালবাসি নিপীড়িত মানবকে। তাদের ক্রন্দন কানে এলে আমরা স্থির থাকতে পারি না। তখন স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা তুচ্ছ মনে হয়।

ডাক্তার ক্যারোল স্তম্ভিতভাবে তাকিয়ে রইল মিসেস চে-র দিকে।

চে বলল, ভেতরে চল। বাইরে দাঁড়িয়ে বিশ্বসমাজনীতি অনেক আলোচনা হয়েছে।

ডাক্তার ক্যারোল পরীক্ষা করে বলল, ব্রংক্যাল হাঁপানী। এ থেকে মুক্তি নেই। সাময়িক উপশম হবে, তার বেশি নয়। চিরসহচর হয়ে থাকবে এই রোগ।

চে হেসে বলল, এ তো জানি। বর্তমানে এমন কোন নতুন ওষুধ যদি আবিষ্কার হয়ে থাকে, যাতে আমার কর্মক্ষমতা নষ্ট না হয়, সেই ওষুধ দেবার ব্যবস্থা কর।

তা তো করতেই হবে। আমি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। একি, এর মধ্যে কোকো রুটি কেন আনলে মিসেস চে! আমি খেয়েই বেরিয়েছি। দরকার ছিল না।

সামান্য। অতিথি তুমি।

আমার কর্তব্য দেশের বীর সেনানীদের সুস্থ রাখা, তথা মানবের

সেবা করা। সেজন্য তো কোন পারিতোষিক চাইনি। আমিও তো তোমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে এতকাল এসেছি। আমাকে আপ্যায়িত করতে হবে কেন?

ওটা গৃহীর ধর্ম। আমি গৃহী, আমার ধর্ম আমি পালন করছি।

ডাক্তার ক্যারোল কথা না বাড়িয়ে খাওয়া শেষ করে বিদায় নিল। গাড়িতে উঠে হাত নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

য়্যালাইদা ডাক্তারের অভিমত জেনে মোটেই চিন্তিত হয়নি। সে জানে, তার স্বামীকে পাশে পেলে যে কোন উপায়ে তার রোগের উপশম করতে সে পারবে, কিন্তু তার স্বামী তার পাশে থাকবে কি!

চে বলল, তুমি বেশ চিন্তা করছ ডাক্তার ক্যারোলের কথায়।

মোটেই না। তবে ভাবছি তোমাকে ঘরে রাখতে হলে আমার কি করা কর্তব্য।

তোমার কর্তব্য স্বামীকে বীরবেশে রণক্ষেত্রে পাঠানো। অবশ্য যদি রণের প্রয়োজনে তাকে ঘরের দরজা পেরিয়ে যেতে হয়।

রাতের বেলায় য়্যালাইদা চে-র বুকে মুখ গুঁজে ঘুমচ্ছিল। শেষ রাতে চে-র ঘুম ভেঙে গেল হাঁপানীর টানে। ডেকে তুলল য়্যালাইদাকে।

আলো জ্বালো।

য়্যালাইদা আলো জ্বেলে একটা এফিড্রিন ট্যাবলেট এনে দিল তার হাতে। জলের গেলাস সামনেই ছিল। চে বড়িটা খেয়ে সুস্থ অনুভব করল।

বলল, কাগজ কলম প্রস্তুত আছে কি?

আছে।

লেখ। আমি যা বলব তাই লিখবে।

য়্যালাইদা কাগজ কলম নিয়ে বসল তার পাশে।

জানো য়্যালাইদা, আজ এই অতীত কাহিনী লিখতে বসে বার বার মনে পড়ছে কামিলোর কথা। তাকে ভুলতে পারছি না।

আমার এই লেখায় যে ভুল-ভ্রান্তি থাকবে, তা সংশোধন করার ক্ষমতা ছিল একমাত্র কামিলোর। প্রথম দিন থেকে সে ছিল সহচর ও পরামর্শদাতা। তার নির্ভুল প্রস্তাবগুলো না মেনে চললে আমাদের সাফল্য আসত কিনা বলা কঠিন। এই বীর তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার অপমৃত্যু ঘটবে, তা ভাবতেও পারিনি। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে তার মৃত্যু হত, তা হলে সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু কি ভয়ঙ্কর সে মৃত্যু, তা কল্পনা করতে পারছি না। লেখ: কামিলো আমার সহচর ছিল শতাধিক যুদ্ধে। তার স্মৃতি সব সময় আমার মনে জেগে রয়েছে। তার উদ্দেশ্যেই এই অভিজ্ঞতার লিপি উৎসর্গ করছি। হে কামিলো, তোমার প্রতিভা, তোমার ত্যাগ, তোমার বীরত্ব, তোমার নেতৃত্ব আমরা কোন দিন ভুলব না, ভুলব না। কামিলো, তুমি যুদ্ধে প্রাণ দাওনি। কিন্তু তবুও তুমি শহীদ। কিউবার জন্যই তুমি প্রাণ দিয়েছ। তোমার কাছে কিউবার ঋণ অপরিশোধ্য। তোমাকে শত কোটি প্রণাম। আমার এই লিপি তোমার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার স্মারক। আমি নই, সবাই—কিউবার সব মানুষের শত কোটি প্রণাম।

থামল চে।

য়্যালাইদা বলল, একটু আস্তে আস্তে বল। তুমি উত্তেজিত ও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছ। আমিও তোমার সঙ্গে সমানে কলম চালাতে পারছি না।

চে মৃদু হেসে বলল, কি প্রশান্তি! আমার মনে আর কোন গ্লানি নেই। কামিলোকে কৃতজ্ঞতা জানানো আমার ধর্ম, কিউবাবাসীর ধর্ম। তাই জানিয়েছি। আলোটা নিভিয়ে দাও য়্যালাইদা। আমার ঘুম আসছে। এমন শান্তিতে ঘুমতে পাইনি অনেক দিন। তুমি তোমার হাতখানা আমার দেহের ওপর রেখে আমার পাশেই শুয়ে পড়। মনে হচ্ছে আমার রোগ অর্ধেক আরাম হয়ে গেছে। বলতে বলতে চে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

য়্যালাইদা আলো নিভিয়ে দিয়ে চে-র বুকে হাত রেখে তার পাশে শুয়েই শুনতে পেল চে-র নাক ডাকার শব্দ।

য়্যালাইদার চোখে ঘুম নেই। কিউবা বিপ্লবের পুরোধা কামিলোকে য়্যালাইদাও ভুলতে পারছিল না। কতদিন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শুকনো মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বলেছে, মিসেস চে, কিছু খাবার আছে? ছদিন জল বিনা আর কিছুই পেটে পড়ে নি। সেই কামিলো স্থায়ী স্থান করেছে কিউবার জনমানসে। প্রতিদিন তাকে স্মরণ করছে দেশের মানুষ, অথচ কামিলো আর নেই। বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে মনোজগতে। সে শূন্যতা পূরণ হবে কিনা সন্দেহ।

বীরত্বের স্তম্ভ কামিলোর প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে পেরে চে পরম শান্তিলাভ করেছে। পরম শান্তিতে চে নিদ্রামগ্ন।

য়্যালাইদা উঠে বসল।

ধীরে ধীরে চে-র মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তারও ঝিমুনি এসে গেল। চে-র পাশে শুয়ে পড়ে কখন অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ল য়্যালাইদা।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখনও চে ঘুমচ্ছে। কোন সময় বা য়্যালাইদার মুখখানা দু হাতে চেপে ধরেছিল নিজের বুকে, টেরও পায়নি য়্যালাইদা। চে-র মুখে কেমন প্রশান্তির চিহ্ন। কাপড় জামা সামলে নিয়ে অতি সন্তর্পণে চে-র কপালে একটা চুমু দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল য়্যালাইদা।

ম্যাদাম লুজান পাশের ঘর থেকে ডাকল, মিসেস চে উঠেছ?

হাঁ উঠেছি।

ডাক্তারের শরীর কেমন আছে?

খুব ভাল নয়, তবে ভয়ের কিছু নেই। বেশ ঘুমচ্ছে আজ।

ঘুমতে দাও। ঘুম রোগকে জব্দ করতে পারে। রোগী যত ঘুময় ততই ভাল।

কাল রাতে কামিলোর কথা বলতে বলতে ঘুমিয়েছে।

কামিলো, He is monument of the people. তাকে অনেকদিন দেখেছি তোমার বাড়িতে। সে যে আমাদের অনাথ করে পালিয়ে যাবে চিরদিনের মত, তা ভাবতেও পারিনি।

সেই কথাই বলছিল ডাক্তার। বলতে বলতে ঘুমিয়েছে। বোধহয় এতে যথেষ্ট মানসিক শান্তি লাভ করেছে ডাক্তার।

নিশ্চয়। কাল তো ডাক্তার ক্যারোল এসেছিল। প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক তো সে?

হাঁ।

সে কি বলে গেল?

বলে গেল, ঘরে আটকে রাখতে, বিশ্রাম করতে, সেবা করতে। সবই তো হতে পারত, যদি ওকে ঘরে আটকে রাখা যেত। তা তো সম্ভব নয়। আমরা তা পারি না। দেশের প্রতি যে কর্তব্য, তাকে ছোট করে দেখার মত শিক্ষা পাইনি আমার স্বামীর কাছে।

ম্যাদাম লুজান মাথা নেড়ে বলল, ঠিক বলেছ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ম্যাদাম লুজান। বলল, আমি একবার চোখের দেখাও দেখতে পাইনি তার শেষ সময়ে। এ দুঃখ থেকেই গেছে। মৃত্যু তার গৌরবের, কিন্তু দুঃখ আমার অসীম।

য়্যালাইদা সহানুভূতি জানাল তাকে। বলল, আমার যে সে রকম হবে না তাই বা কে বলতে পারে। জীবন আর মরণের দূরত্ব তো বেশি নয় ম্যাদাম লুজান। তবে যা ঘটে তাকে মেনে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা তার বাইরে তো যেতে পারি না।

কাগজ কলম নিয়ে বসল চে গুয়েভারা। লিখল: আমি ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা। আমি মুক্তিযোদ্ধা। পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষকে ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, যুদ্ধবাজ সামন্ততন্ত্র থেকে

মুক্ত করা আমার ধর্ম। আমার কাজ হল শ্রেণী বৈষম্যহীন সর্বহারার এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা।

আমি গুয়েতেমালায় লড়াই করেছি। সেখানেও সাফল্যলাভ করেছিলাম। স্থায়ী হয়নি সে সাফল্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস আক্রমণে। কিন্তু কিউবাতে আমরা সাফল্যলাভ করেছি। জানি না মার্কিন দস্যুরা কি ভাবে আমাদের আক্রমণ করবে। আমরা এবার বেশি সতর্ক। আমরা মার্কিন দস্যুতার মোকাবিলা করতে সচেষ্ট।

কিন্তু আমরা কি ভাবে এবং কেন সাফল্যলাভ করেছি, তাই বলতে চাই। আমার অভিজ্ঞতাপ্রসূত এই লিপি পৃথিবীর মুক্তি-যোদ্ধাদের সাহায্য করবে—এই আমার ভরসা ও আশা।

মুক্তিযোদ্ধা হবার যোগ্যতা কার আছে আর কার নেই, তা সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে।

বাতিস্তার পতন আমাদের বীরত্ব প্রমাণ করেনি, প্রমাণ করেছে প্রগতির জয়। এই জয়লাভের পেছনে কাজ করেছে মুক্তি-যোদ্ধাদের সংগঠন শক্তি, অস্ত্র নয়। আর সাহায্য করেছে জন-সাধারণের অকুণ্ঠ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতা।

সেজন্য বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপে প্রয়োজন জন-সংযোগ। নিপীড়িত, অত্যাচারিত ও শোষিত জনসাধারণকে স্বমতে আনার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন তাদের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সক্রিয় সাহায্য।

আমরা এসেছিলাম আশী জন। সপ্তাহ শেষ হতে না হতেই আমাদের সহকর্মীরা নিহত হল। রইলাম মাত্র বার জন। বাকি সবাই ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছিল। তখন আমাদের কাজ হল আত্মগোপন করে দলের শক্তি বৃদ্ধি করা। আমাদের অস্ত্রাগার হল শত্রুর অস্ত্রাগার। আমরা তাদের কাছ থেকেই ছিনিয়ে নেব আমাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার। তাদের কাছ থেকেই কেড়ে নেব মুক্তিযোদ্ধাদের নিত্য প্রয়োজনীয় রসদ। এসব কাজ করতে হলে নিম্নতম শক্তি

সংহত করার প্রয়োজন, নইলে আমাদের ঘাঁটি প্রস্তুত করে অগ্রসর হওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

আমাদের বিপক্ষ হল পেশাদারী সুদক্ষ সৈন্যবাহিনী যাদের পৃষ্ঠপোষক হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জ। কিন্তু আমরা হলাম জনতার ফৌজ। আমাদের পেছনে থাকবে জন-সমর্থন। তাই অস্ত্রের চেয়ে নৈতিক বল হল সর্বাধিক প্রয়োজন। আমরা এক ও অভিন্ন, এই চিন্তাধারা আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলবে। জন-সমর্থন আমাদের বেশি, কিন্তু অস্ত্র আমাদের কম। কি ভাবে যে আমরা এগোতে পারি, সেটাই আসল চিন্তার বিষয়।

আমাদের কর্মক্ষেত্র হবে গ্রামে। গ্রামের মানুষ হল সবচেয়ে বেশি শোষিত, অত্যাচারিত ও উপেক্ষিত। শহরে আমাদের কর্মক্ষেত্র যদি সক্রিয় হয়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে কোন সময়ে আমাদের নির্মূল করতে পারবে, যে কোন সময়ে সৈন্য দিয়ে আঘাত করতে পারবে। কিন্তু গ্রামের অভ্যন্তরে আমাদের ঘাঁটি থাকলে সহজে সে সব জায়গায় কোনক্রমেই সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করতে পারবে না।

তারপর দেখতে হবে জনতার মনোবৃত্তি।

পোর্টো রিকোতে মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনা ছিল না। তবুও সে দেশের কৃষকরা মার্কিন দস্যুদের হাত থেকে ভূমি উদ্ধারের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে আসছে। জাতীয়তাবোধ তাদের মার্কিন বিরোধী করেছে, কিন্তু শ্রেণীহীন সমাজের চিন্তা তারা করতে পারেনি। তাই সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ সেখানে স্থান গড়ে নিতে পারেনি। অবশ্য আলজেরিয়াতেও এই ঘটনাই ঘটেছে। আরব জাতীয়তাবাদ ফরাসীদের বিতাড়িত করলেও, আসলে জনগণের কোন সুবিধাই হয় নি। সেখানে সাম্রাজ্যবাদের শোষণ শেষ হলেও দেশী সামন্ততন্ত্র জনতার কণ্ঠরোধ করেছে। শ্রেণীচেতনা সেখানে জাগেনি। কারণ সেখানে ধর্মীয় জাতীয়তাবোধ সর্বনাশ সাধন করেছে।

এইসব কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রেণীচেতনা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধ

সাফল্যলাভ করতে পারে না। ভারতেও ইংরেজ আমলে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়েছিল বহুজন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইংরেজ বিতাড়ন। শ্রেণীসংগ্রাম ছিল অজ্ঞাত। ফলে ইংরেজ যাবার পর দেশীয় বুর্জোয়ারা শাসনক্ষমতা অধিকার করেছে। ভারতীয় শ্রেণীসংগ্রামের বনিয়াদ রচিত হবার আগেই আত্মকলহ দেখা দিয়েছে প্রগতিশীল নামধারী পার্টিগুলোতে।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে অতীত এমনভাবে চিন্তার ক্ষেত্রকে অকর্মণ্য করেছে, যাতে যখনই প্রগতির নাম নিয়ে কেউ অগ্রসর হতে চেয়েছে, তখনই পেছনে টেনেছে ঐতিহ্যবাহী রক্তকণা।

মানুষের এই ভাবাবেগ ও ভাবের আবেশে আদর্শ ত্যাগ অথবা আদর্শের অপব্যাখ্যা স্বাভাবিক। তাদের মানসিক পরিবর্তনের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাকে উপেক্ষা করে মুক্তির জন্য সংগ্রামী করে তোলা খুবই কঠিন কাজ। সে কাজ করার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে মুক্তিযোদ্ধারা যেন ভুল না করে। শক্তি যত ছোট হোক, তার বিস্ফোরণে বিরাট কিছু যে হবে না, একথা মনে করা ভুল। সামান্য যাকে মনে করি, তাই হয়ত গুরুতর হতে পারে।

চীনের শাসকরা মুক্তিযোদ্ধাদের বলত bandit—ডাকাত। ডাকাত ও মুক্তিযোদ্ধাদের এক পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে আত্মতুষ্টিলাভ করে শাসকরা এবং অত্যাচারও যথেচ্ছ করতে পারে, কিন্তু তাতে কোন সময়েই আদর্শের ক্ষতি হয় না। শাসককে আত্মসমর্পণ করতে হয়, অপশাসন উৎখাত হয়।

লিখতে লিখতে থামল চে।

এত রাত জেগে তোমাকে লিখতে দেব না। বলল য়্যালাইদা।

কেন?

তুমি যে অসুস্থ। শরীরকে কিছুটা কর্মোপযোগী কর। তারপর যা খুশী করতে পার। তোমার যে এখনও অনেক কাজ করার আছে। সব কাজ শেষ করার দায়িত্ব তোমার।

বেশ। বলে চে শুয়ে পড়ল।

ছোট ছেলেটা কেঁদে উঠতেই য়্যালাইদা ছুটে গেল তাকে থামাতে। চে মিটমিট করে তাকিয়ে দেখছিল। য়্যালাইদা শিশুর মুখে স্তন তুলে দিতেই চমকে উঠল চে। শুকনো ঐ স্তনে তো দুধ নেই সন্তানের পেট ভরাবার মত। য়্যালাইদার স্বাস্থ্যও তো ভেঙে গেছে। তারও চিকিৎসার প্রয়োজন। ভাল খাদ্যের প্রয়োজন। এতদিন দেশের মুক্তির কথা সে ভেবেছে, কখনও তো য়্যালাইদার কথা ভাবেনি। য়্যালাইদা তাকে সেবা করেছে, তার জন্য রাত জেগেছে, দেশের জন্য সংগঠন গড়েছে, মাঠে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। তার ত্যাগ তো কম নয়।

চোখ বুজে ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছিল চে। য়্যালাইদা শিশুকে শুইয়ে কখন যে তার পাশে এসে শুয়েছে, সে টেরও পায়নি। তার উষ্ণ নিঃশ্বাস মুখে লাগতেই ঝিমুনি কেটে গেল। চে বলল, তোমার কথা ভাবছিলাম য়্যালাইদা।

আমার কথা ভাববার মত কিছুই তো দেখছি না।

তোমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ। আমি দেখতে পাচ্ছি, কত না ত্যাগ করতে হয় নারীদের, কত না সহ্য করতে হয় তোমার মত আদর্শবাদিনীদের!

ওসব কথা থাক। এখন ঘুমোও। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও।

চুপ করে শুয়ে রইল চে। য়্যালাইদা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়েছিল দুজনের অজান্তে।

পরদিন সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে সংসারের কাজে মন দিল য়্যালাইদা। চে আবার কাগজ কলম নিয়ে বসল। আগের দিনের লেখাগুলো ভাল করে পড়ে নিয়ে আবার লিখল :

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। এ যুদ্ধ বাক্যের যুদ্ধ নয়, অস্ত্রের যুদ্ধ। তার আগে জানতে হবে শত্রুর ক্ষমতা কতটা। শত্রুর জনসংখ্যা, তাদের চলাচল করার ক্ষমতা, তারা কতটা সমর্থন লাভ করেছে, তাদের অস্ত্রশক্তি এবং এই সব পরিচালনা করার মত নেতাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করতে না পারলে মুক্তিযোদ্ধাদের যে মূল উদ্দেশ্য শত্রুকে পরাস্ত করা, তা সম্ভব হতে পারে না।

শত্রু অস্ত্রবলে বলীয়ান। তার অস্ত্র ব্যবহারের যোগ্যতা এবং অস্ত্রের উপযোগিতা না জানলে লড়াই করা সম্ভব নয়। শত্রুর ট্যাঙ্ক আছে, বিমান আছে। আমাদের হাতে মান্ধাতা আমলের বন্দুক। এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করা সম্ভব কি? সম্ভব। সেজন্য প্রয়োজন শত্রুর অবস্থান জানা, সেজন্য প্রয়োজন তাদের আঘাত করার সময় ও সুযোগ সৃষ্টি করা। আমাদের অস্ত্র নেই কিন্তু শত্রুকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র দখল করাই হল আমাদের বড় কাজ। সে কাজ করতে ভুল করলে মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে।

মুক্তিযোদ্ধা, তুমি জান মৃত্যু তোমার সম্মুখে। মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করতেই তুমি এসেছ, কিন্তু সব সময় মনে রাখবে আত্মরক্ষা তোমার ধর্ম। আত্মরক্ষার অর্থ পলায়ন নয়। কার্যসিদ্ধি করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া। তুমি মনে রাখবে, একটি মুক্তি-যোদ্ধা একশত পেশাদারী সৈন্যের সমকক্ষ। তুমি প্রাণ হারালে তোমাকে মনে রাখতে হবে একশত জন শত্রুকে মোকাবিলা করার লোকের অভাব ঘটল। একদিনে তুমি এগোতে পারবে না। মুক্তিযোদ্ধার জীবনের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারলেই তুমি আত্মরক্ষার কৌশলও জেনে নিতে পারবে।

মুক্তিযোদ্ধা, তুমি শত্রুকে আঘাত করবে। বার বার আঘাত করবে। শত্রুকে বিশ্রাম করতে দেবে না। শত্রুকে ঘুমবার অবসর

দেবে না, খাবার অবসর দেবে না। কখন যে তুমি আক্রমণ করবে তা ঘুণাক্ষরেও শত্রুরা যেন জানতে না পারে। শত্রুকে সব সময়ই সশঙ্ক থাকতে হবে আঘাতের ভয়ে। একটার পর একটা শত্রুঘাঁটিকে আঘাত করতে হবে। আঘাতের পর আঘাত করে শত্রুঘাঁটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে। যদি দেখ শত্রুর অবস্থান কোন বনে অথবা পাহাড়ে, তা হলে দিবারাত্র আঘাত করবে। যদি শত্রু নিরাপদ এলাকায় থাকে, রাতের বেলায় আঘাত করাই হল প্রশস্ত। তুমি মনে রাখবে, পেশাদারী সৈন্য কোন সময়ই জনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারে না। যারা তা বিশ্বাস করে না, তারা মুক্তি-যোদ্ধা নয়। (Whoever does not feel this undoubted truth cannot be a guerrilla fighter).

আবার তুমি কলম নিয়ে বসেছ? ধমকানির সুর য়্যালাইদার কণ্ঠে।

সময় যে আর কাটছে না য়্যালাইদা। কর্মী কখনও কাজ ভিন্ন বাঁচতে পারে কি? একটা কিছু না করলে যে আমি বাঁচব না।

তা জানি। তুমি ছোট ছেলে যেশোকে কাছে বসিয়ে রাখ। বড়ই বিরক্ত করছে। আমি ততক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা করি।

যেশোকে পাশে বসিয়ে য়্যালাইদা বেরিয়ে যেতেই বড় ছেলে জুনো ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে ডাকল, বাবা।

চে তাকেও কাছে ডেকে নিল।

ওটা কি বাবা?

বন্দুক।

বন্দুক কেন?

দুষ্ট লোককে মারবার জন্য।

কেন মারবে?

দুষ্ট লোক বড়ই ক্ষতি করে মানুষের। তাদের শায়েস্তা করতে বন্দুকের দরকার।

মানুষ দুষ্ট হয় কেন ?

এবার যে কি উত্তর দেবে ভেবে ঠিক করতে না পেরে চে ডাকল য়্যালাইদাকে। য়্যালাইদা খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে ঢুকতেই বলল, তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে দাও মানুষ দুষ্ট হয় কেন। আমার বিদ্যাবুদ্ধি শেষ হয়ে গেছে।

য়্যালাইদা হেসে বলল, দুষ্টলোক তাড়িয়ে বেড়াচ্ছ এতদিন, শিশুর মনকে জানতে চেষ্টা তো করনি, এবার ভাল করে জেনে নাও। তুমি জবাব না দিলেও আমাকে কিন্তু এর জবাব দিতেই হবে। জবাব যদি ছেলের মনের মত না হয়, তা হলেই সর্বনাশ। কেঁদে-কেটে একসা করবে। ভেবে দেখ, মায়ের কাজ কত কঠিন।

খেতে খেতে চে বলল, সেই জন্যই তো মেয়েরা মা হয়, পুরুষেরা বাবা হয়।

বলেই হো-হো করে হাসতে থাকে চে।

য়্যালাইদাও স্বামীর হাসির সঙ্গে হাসি মিলিয়ে বলল, এবার থেকে পুরুষদেরই মা হতে বলে দিও।

তা বটে। কিন্তু তা হলে তোমার কি কাজ আর থাকবে? মায়া-মমতা-স্নেহ-ভালবাসার একছত্র সম্রাজ্ঞী নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, তোমাদের ভাগ্যে থাকবে বিরাট একটা শূন্য। তার জন্য প্রস্তুত থেক তোমরা। জুনো, তোমার মায়ের কাছ থেকে সব কথার জবাব নিও। আমি বাপু অত সব বুঝি না।

জুনো বাবা-মায়ের কথা শুনে থমকে গিয়েছিল। বাবার মন্তব্য শুনে মায়ের গাউন ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে।

আজ কিন্তু আর লিখতে দেব না। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যাব। ক্যাপটেন সার্লোমন এসেছে তার নতুন বউ নিয়ে। নেমন্তন্ন করেছে বিকেলে তার টেবিলে চা খাবার। যেতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে।

তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, কিন্তু কিছু কিছু করে রোজ না লিখলে সারা জীবনেও যে লেখা শেষ হবে না।

বেশ তো, রোজ একঘণ্টা সকালে আর একঘণ্টা বিকেলে, রাত জেগে মোটেই নয়। ক'দিন তোমার হাঁপানীটা একটু কমেছে। শরীরের ওপর অত্যাচার করলে আবার হাঁপানী বাড়বে। তুমি অন্য কোন কাজই করতে পারবে না।

বিকেল বেলা চে কাগজ কলম নিয়ে বসতেই য়্যালাইদা বাধা দিয়ে বলল; এখন নয়। ক্যাপটেন সার্লোমনের বাড়িতে যেতে হবে। সময় থাকলে ফিরে এসে লিখবে। কেমন ?

বেশ, তাই হবে।

দুজনে যখন ক্যাপটেন সার্লোমনের বাড়িতে পৌছল, তখন সূর্যাস্ত হতে অনেক দেরী। জুনো ও যেশোও ছিল সঙ্গে। তাদের নিয়ে বাংলো বাড়ির বাগানে তাদের জন্য যে আসন পাতা ছিল, তাতে গিয়ে বসল। দুই ভাই গুটিগুটি বেড়াতে লাগল বাগানে।

অভ্যর্থনা জানাল ক্যাপটেন ও ম্যাদাম সার্লোমন।

অর্থমন্ত্রী মেজর চে গুয়েভারার শারীরিক কুশল কামনা করি।

চে হেসে বলল, আমিও তোমাদের সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করি। ম্যাদাম সার্লোমন আসন গ্রহণ করুন। ইনি এই অভাজনের স্ত্রী ম্যাদাম য়্যালাইদা, অতি মেঠো মহিলা।

ম্যাদাম সার্লোমন বলল, আপনার বীরত্বের কাহিনী এখন লোক-প্রবাদে পরিণত হয়েছে। আপনাকে দূর থেকে দেখেছি। অনেক দিনের ইচ্ছা, আপনার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা বলার। আজ সেই সৌভাগ্যলাভ করে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল ম্যাদাম। আমাকে যত বড় মনে করছেন, অত বড় আমি নই। আমি সামান্য একজন সৈনিক।

বীর ছিল কামিলো, বীর হল ফিদেল কাস্ত্রো, বীর নারী হল তানিয়া। সম্মান তাদেরই প্রাপ্য।

ম্যাদাম সার্লোমন মুখ লাল করে বলল, আপনার সম্মানিত হবার অনীহা আপনার গুণমুগ্ধদের নিরস্ত্র করতে পারবে না মেজর চে গুয়েভারা। আমরা চিরকাল আপনার প্রশংসাই করব।

চে চুরুট ধরিয়ে নীরবে ধূমপান করতে থাকে।

আপনার স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছে না শুনেছি।

চে হেসে বলল, আমাদের জীবন হল বন্ধনহারা। কোন শক্ত অচল আইনের আমি দাস নই। আমরা সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলতে অভ্যস্ত। তা যদি না হতে পারি, তা হলে মুক্তিযুদ্ধের যোদ্ধা হতে পারতাম না। আমার স্বাস্থ্য ভাল নয় ঠিকই, তার জন্য চিন্তা করার অবসর আমার নেই ম্যাদাম। আমি যে দেশসেবার দাসত্ব করছি। আমার ব্যক্তিগত সত্ত্বা হারিয়ে গেছে দেশের বৃহত্তর স্বার্থের মাঝে।

ক্যাপটেন সার্লোমন বলল, এতদিন ঘরে বসে মুক্তিযোদ্ধাদের কথা শুনেছ। তাদের কার্যকলাপ দেখনি, কিছু কিছু অবশ্য শুনেছ। কিন্তু বাস্তব পরিচয় তো কখনও হয়নি।

তাতো সম্ভব নয়। বলল য়্যালাইদা।

ম্যাদাম সার্লোমন বলল, আপনি চিরকাল স্বামীর সহচর। তাই আপনি দেখেছেন, অংশ গ্রহণ করেছেন। আমার তো সে সৌভাগ্য হয়নি। সেজন্য আমার জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আমাদের কর্মধারা সীমাহীন। শত্রু আসছে, আমরা পালাচ্ছি। আমাদের পেছন পেছন ছুটে তারা আসছে কামান দাগতে দাগতে। হঠাৎ থামল তাদের গতি। আমরা জানি গতি রুদ্ধ হবেই। আশ্চর্য হবেন না আমার কথা শুনে। শত্রু ছুটছে, কিন্তু তাদের জন্য যে মরণফাঁদ আমরা তৈরী করেছি, তা তারা জানে না। আমাদের শত্রুঘাঁটির পথে কত যে বিঘ্ন, তা তখনই শত্রুরা বুঝতে

পারে। ওদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, কিন্তু আমাদের কর্মধারা অসীম। আমরা পালাতে পালাতে যখন দাঁড়িয়ে যাই, তখন আমাদের স্থির বিশ্বাস থাকে, এই একটি বিশেষ জায়গায় এলে আমরা যে আঘাত হানব, সে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা নেই শত্রুর।

য়্যালাইদা ডাক্তারের উত্তেজিত আলোচনা লক্ষ্য করে বলল, এসব আলোচনা এখন থাক। চল, আমরা ক্যাপটেনের বাগান ঘুরে-ফিরে দেখে বাড়ি ফিরে যাই। ক্যাপটেন সার্লেমিন, আপনাদের নেমন্তন্ন রইল আমাদের গরীবখানায়।

সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে চে আবার কাগজ কলম তুলে নিল হাতে। য়্যালাইদা রাতের রান্নায় ব্যস্ত।

চে লিখল ঃ অন্তর্ঘাতী কাজ হল মুক্তিযোদ্ধাদের বড় কাজগুলোর অন্যতম। মুক্তিযোদ্ধাদের মনে রাখতে হবে অন্তর্ঘাতী কাজ সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারীরাও করে থাকে। বিপ্লবীদের ও সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের কাজে পার্থক্য আছে। সন্ত্রাসসৃষ্টিকারীদের কাজ হল সাধারণ মানুষের সুবিধা অসুবিধা না বুঝে কাজ করা, যার ফলে তাদের কাজ কোন সময়ই কোনরূপে ফলপ্রসূ হয় না। আর বিপ্লবীদের অন্তর্ঘাতী কাজ হবে তার বৈপ্লবিক কাজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে। সন্ত্রাস-বাদীদের কাছে নিরীহ মানুষ প্রাণ দেয়। এই মানুষগুলো বিপ্লবীদের সাহায্য করতে পারত, কিন্তু তা হয় না সন্ত্রাসসৃষ্টিতে। সেজন্য সন্ত্রাসসৃষ্টিকারী জনতার কোন সমর্থন লাভ করে না। উপরন্তু তারা অসাফল্যলাভ করে। নরহত্যা করতে বাধ্য হয় মুক্তিযোদ্ধারা, কিন্তু সমাজে যে সব লোক প্রভাব বিস্তার করে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায়, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়, যারা সামান্য সামাজিক অবস্থায় বাস করে, তাদের প্রাণ নষ্ট হওয়া কোন সময়ই কাম্য নয়। সন্ত্রাসবাদীরা যা করে, তাতে থাকে ব্যক্তির স্বার্থ কিন্তু যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের কর্তব্য হল সমষ্টির স্বার্থ রক্ষায় আত্মনিয়োগ করা।

মুক্তিযোদ্ধা, তোমরা যখন দেখবে পুলিশ অত্যাচার করছে জনসাধারণের ওপর, যখন দেখবে শোষণ কায়েম রাখতে রাষ্ট্রশক্তি তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করছে, তখন তোমাকে হয়ত সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হবে, হয়ত সন্ত্রাসকে সমর্থন করতে হবে। কিন্তু যদি গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হয় কোন প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র, তখন অত্যাচারের মাত্রা এত বৃদ্ধি পায় যে সভ্যসমাজ সেই অত্যাচারের কাহিনী শুনে শিউরে ওঠে। সেজন্য সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কোন ফললাভ হয় না। পরিকল্পনা অনুসারে অন্তর্ঘাতী কাজ করলে সাফল্য নিশ্চিত। তুমি যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রকে অকেজো করতে পার, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় জয়। কিন্তু যারা সন্ত্রাসবাদী, তারা হয়ত একটা ছোট শিল্পের যন্ত্রপাতি ধ্বংস করে তাদের ক্ষমতা দেখাতে চাইবে। কোন মুক্তিযোদ্ধা এ রকম অন্যায় কাজকে বরদাস্ত করবে না। কারণ তাতে জনমানসে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। জনতা মনে করবে এরা লুঠেরা, দস্যু। এটা কৃতিত্ব নয়, এটা অকৃতিত্ব।

অস্ত্র সম্বন্ধেও তোমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবে। আলজেরিয়াতে ফরাসী উপনিবেশবাদীদের বিরুদ্ধে রেডিও-বোমা ব্যবহার করা হয়েছে। বহুদূরে বসে রেডিও-র সাহায্যে বোমা ফাটানো হত। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে, অপর পক্ষ বেশি বিপন্ন হবে। আমরা কিউবাতে যুদ্ধ করেছি এমন সব বিস্ফোরক দিয়ে, যা আমরা আমাদের নিজেদের ল্যাবরেটারীতে আবিষ্কার করেছি। আমরা বাতিস্তার বিমান কেড়ে নিয়ে সেই বিমান থেকে 'মাইন' ব্যবহার করে শত্রুদের ঘায়েল করেছি।

পথের ধারে ওঁৎ পেতে থাকা হল মুক্তিযুদ্ধের বড় কৌশল। 'য়্যামবুশ'এর জন্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা অতর্কিতে অজ্ঞাত স্থান থেকে আক্রমণ করে শত্রুকে। শেষ জীবিত শত্রু যেন ফিরে যেতে না পারে, সেদিকে নজর রেখে অস্ত্র ব্যবহার করবে তোমরা। শত্রু অতর্কিতে আক্রান্ত হলে অস্ত্র ব্যবহার করার সুযোগ পায় না,

সেজন্য তাদের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা যায় অতর্কিত আক্রমণে।

কাজ কিন্তু সহজ নয়। সব সময় তাদের বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। শত্রুও দলবদ্ধভাবে অগ্রসর হয়, তারাও আক্রান্ত হলে পালটা আক্রমণ করে। জনসংখ্যায় ও অস্ত্রবলে তারা বলীয়ান। সেজন্য আক্রমণের স্থান নির্ধারণের সময় কোন ভুলচুক যেন না থাকে। যে এলাকার জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও সৌখ্যভাব না থাকে, সে এলাকায় শত্রুকে আক্রমণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। সাময়িক অথবা স্থায়ী আত্মগোপন কেন্দ্রগুলোকে নিরাপদ রাখতে হলে জন-সংযোগ বেশি দরকার। কোন্ পথে শত্রু যাতায়াত করে, তার যেমন একটা সঠিক সংবাদ জানা দরকার, তেমনি কোন্ পথে আত্মগোপন করা যায়, তারও সঠিক সংবাদ রাখা প্রয়োজন। তারপর স্থান নির্ধারণ করে কাজে নামলে শত্রু বিচ্ছিন্ন হবেই।

লিখতে লিখতে থামল চে গুয়েভারা।

য়্যালাইদা ঘরে ঢুকে দেখল, তার স্বামী কাগজ কলম সরিয়ে রেখে গভীরভাবে কি যেন ভাবছে।

ডাকল: ডাক্তার ঘুমিয়েছ?

না। খেতে দেবে কি?

খাবার প্রস্তুত। কি ভাবছ?

ভাবছি আমার ঘর তো সমগ্র বিশ্বব্যাপী। কিউবাকে আশ্রয় করে জীবনের বাকি কটা দিন কাটালে অন্যায় করা হবে মানবজাতির কাছে। তাই ভাবছি পরবর্তী কর্মক্ষেত্র কোথায় হবে।

এখন কিছুদিন বিশ্রাম কর। আরও সহকর্মীর সঙ্গে পরামর্শ কর। তারপর কোথায় তোমার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করবে, তা স্থির কর।

মাথা নাড়তে নাড়তে চে বলল, ঠিকই বলেছ য়্যালাইদা। আচ্ছা, এবার খাবার নিয়ে এস। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়া যাক। রাতও বেশ কয়েক ঘণ্টা এগিয়ে গেছে।

হাভানা থেকে বিশেষ সংবাদবাহক এসেছে ডাক্তার চে গুয়েভারার বাড়িতে। হাতে তার দুখানা চিঠি। একখানা কাস্ত্রোর ব্যক্তিগত, আরেকখানা সরকারী।

চে চিঠি দুখানা পড়ল। পড়েই কাগজ টেনে নিয়ে উত্তর লিখল : বন্ধু ফিদেল, আমার মনে হয় তোমার ইচ্ছা নয় আমি কিউবাতে বাস করি কিছুকাল। তোমার সরকার আমাকে পেনসন মঞ্জুর করেছে। আমি তো ছিলাম কৃষিমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী—তখনই অর্থের প্রয়োজন হয়নি, এখন পেনসন দিয়ে কি হবে! হাঁ বন্ধু, বলতে পার আমার সারা জীবনের মেহনত কি ঐ পেনসন পাবার জন্য? আমার তো কোন স্থির আস্তানা নেই। সমগ্র বিশ্বই আমার আস্তানা। আমি কি করে তোমার সরকারের মহান দান গ্রহণ করি, বলতে পার? আমি অসুস্থ ঠিকই, কিন্তু এমন কিছু অসুখ নয় যে, আমার মৃত্যু হতে পারে অতি শীঘ্রই। আমি চিকিৎসক নিজেও, আমি দেহবিজ্ঞান জানি। সেজন্য ভয় পাই না, কিন্তু আমার যে এখনও অনেক কাজ বাকি। আমার জন্মভূমি লাতিন আমেরিকা, এ সবের এখনও তো মুক্তি আসেনি। তাদের জন্য কে যেন আমাকে ইসারায় ডাকছে। আমাকে যেতে হবে তাদের ডাকে সাড়া দিতে। তোমার সরকার যে মহত্ব দেখিয়েছে, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পেনসন ভোগ করার কোন ইচ্ছাই আমার নেই। আমি যখন মরব, তখন যদি য়্যালাইদার রুটি-রুজির অভাব হয়, তখন তাকে দিও পেনসন। সে মহিলা, তার পক্ষে আমার মত পৃথিবীর সকল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করা হয়ত সম্ভব হবে না।

চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিয়ে য়্যালাইদাকে ডেকে তার হাতে তুলে দিল চিঠি দুখানা। য়্যালাইদা চিঠি পড়ে বলল, এর কি উত্তর দিলে?

সহজ উত্তর। কৃতজ্ঞতা জানালাম। পেনসন নিতে অস্বীকার করলাম। ফিদেল আমাকে মনে করেছে মুমূর্ষু। কালকেই চল আমরা ফিদেলের সঙ্গে দেখা করে আসি। তাকে জানিয়ে আসি,

আমরা সংগ্রামী মেহনতী মানুষ, আমরা লড়াই করছি মানবজাতির মুক্তির জন্য। মানুষের মুক্তি হল আমাদের আসল পুরস্কার। তার বেশি কিছুই আমরা চাই না।

পরের দিন ফিদেলের আবার একখানা চিঠি পেল চে।

বন্ধু চে, আমি লজ্জিত। তোমার মত ইস্পাতদেহী ও মনসম্পন্ন লোককে এরূপ প্রস্তাব দেওয়া শুধু ভুল নয়, অন্যায়। তুমি যদি সুস্থ থাক, তা হলে যত শীঘ্র সম্ভব আমার সঙ্গে দেখা করবে। মার্কিনের সহায়তায় প্রতিবিপ্লবের যে চেষ্টা চলছে, তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য বিশেষ মন্ত্রণাসভা আহ্বান করেছি আগামী সোমবার। সেদিন তুমি উপস্থিত থাকলে খুশী হব।

য়্যালাইদার হাতে চিঠি তুলে দিয়ে চে বলল, এবার কর্তব্য স্থির করতে হবে য়্যালাইদা। আর আমরা কিউবার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকতে চাই না। আজ সমগ্র পৃথিবীতে সর্বাধিক চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল, দুনিয়ার মানুষ মানবতার অধিকার লাভ করতে আগ্রহী এবং তার জন্য সংগ্রামশীল, "By far the greatest and most significant thing that is happening in the world today is a movement on foot forgiving benefits of civilisation to the huge majority of the human race that has paid for civilisation, without sharing in its benefits, during the first five thousand years of civilisation's existense"—Toynbee. পাঁচ হাজার বছর ধরে যে মানুষ সভ্যতাকে উন্নত করতে এত মেহনত করেছে, অথচ সভ্যতার দানগুলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেই মানুষ আজ নিজে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে তার প্রাপ্য আদায় করতে। আর যারা বঞ্চিত করেছে, তারা আজ শঙ্কিত এবং চিন্তিত। গণতন্ত্র আর স্বাধীন বিশ্বের স্বপ্ন দেখিয়ে এখনও তারা বঞ্চিত করতে সচেষ্ট। এর প্রতিকার চাই, এর জন্য আমাদের সব কিছু ত্যাগ করতে হবে, তার জন্য প্রস্তুত

হতে হবে, নতুন করে সংগ্রামে নামতে হবে। চল, ফিদেলের কাছ থেকে ঘুরে আসি। কিউবাকে বিপন্মুক্ত করে আমাদের নতুন পথ খুঁজতে হবে লাতিন আমেরিকার মুক্তির জন্য।

য়্যালাইদা বলল, আজ যে জনজাগরণ তাকে নষ্ট করতে পারবে না কেউ-ই। এই জনজাগরণ ঘটেছে অর্থবান বুর্জোয়া শ্রেণীর হৃদয়-হীনতায়। এতকাল জমিদাররা বড় বড় সম্পত্তি নিজের কুক্ষিগত করে সমাজের অর্থসম্পদ শোষণ করেছে, বুর্জোয়ারা depressed majority of the mankind-কে বঞ্চিত করেছে। অপরের শ্রমলব্ধ ফল নিজেরা ভোগ করেছে। কি নির্মম সেই শোষণ! তাকে যে কোন উপায়ে প্রতিরোধ করতে আজ সারা বিশ্বে আরম্ভ হয়েছে জনজাগরণ। হয়ত অতি শীঘ্র সমগ্র বিশ্ব মুক্তিলাভ করবে না, কিন্তু সংগ্রাম ও বিবর্তনের মাঝ দিয়েই আসবে গণমুক্তি। হয়ত কোথাও চোরা কায়েমী স্বার্থের বাহকরা প্রগতির নামে বুর্জোয়া শোষণ কায়েম রাখতে চেষ্টা করবে, তাতে বিলম্বিত হবে সমাজতন্ত্র, কিন্তু শেষ দিনে দেখা যাবে শ্রেণীহীন সমাজে শোষণবিহীন পরিবেশে সমগ্র মানবজাতি বাস করছে। বুর্জোয়া শ্রেণীর চেয়ে সর্বনাশা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তারা দালালী করেই বুর্জোয়াতন্ত্রকে কায়েম করার কাজে সাহায্য করে। তাদের উৎখাত না করতে পারলে আরও বিপন্ন হবে সমাজবাদী আন্দোলন। যে দেশে সমাজবাদী আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক নেতৃত্বে এসেছে, সে দেশের সর্বনাশ অবধারিত। বুদ্ধিজীবী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল সমাজের দুই নম্বর শত্রু। এদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ।

চে বলল, গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কায়েমী স্বার্থের প্রহরীরূপে মার্কিন ডলার, সৈন্য, অস্ত্র সমগ্র পৃথিবীতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। গ্রীসে, তুরস্কে, ইরাণে, গুয়েতেমালায়, দক্ষিণ ভিয়েতনামে, দক্ষিণ কোরিয়াতে, লেবাননে, লাওসে, পাকিস্তানে ও কিউবাতে মার্কিন হস্তক্ষেপ অসহ্য। এগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যের অধীন নয়, কিন্তু মার্কিন

নয়া সাম্রাজ্যবাদের আওতায় রয়েছে। অকারণে এইসব দেশে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটছে। ফলে কোটি কোটি টাকা নষ্ট হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিচ্ছে। কিউবাতে মার্কিন-নীতির পরাজয় হল গুরুতর পরাজয়। দক্ষিণ ভিয়েতনামে আঘাতের পর আঘাত করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বুনিয়াদ নড়িয়ে দিয়েছে, কোরিয়াতেও মার্কিনের নৈতিক পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু গ্রীস, তুরস্ক, ইরাণ, গুয়েতেমালা, লেবানন, পাকিস্তান ও লাওস মার্কিন প্রভাবমুক্ত তো হতেই পারেনি। বরং তারা তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিনের মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস—I believe that History would sweep the United States out of the path of its onward march. মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের পতন যে আসন্ন, তা আমি বিশ্বাস করি। এখন তার লক্ষণও দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আজ কিউবা বিপন্ন। আমাদের যেতে হবে হাভানায়। তার জন্য প্রস্তুত হও য়্যালাইদা।

য়্যালাইদা হেসে বলল, আমি সব সময়ই প্রস্তুত। শুধু তোমার মুখের কথার অপেক্ষায় আছি।

হাভানার এই মন্ত্রণাসভায় রয়েছে একখানা মানচিত্র। তার সঙ্গে মন্তব্য রয়েছে, কোন্ দেশকে কত ভাবে সাহায্য করেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রকে বরবাদ করতে আর কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখতে।

পেনসিলের ডগাটা মানচিত্রের ওপর রেখে ফিদেল বলল, নিকারাগুয়া। ফ্যাসীবাদী সোমোজা পরিবারকে ক্ষমতায় আসীন রাখতে আঠার মিলিয়ন ডলার দিয়েছে মার্কিন সরকার। সোমোজা পরিবার, "By systematic graft he accumulated vast commercial and agricultural holdings making the

Samozas one of the wealthiest families in the Americans". আর সাধারণ মানুষের কোন অধিকার নেই ভূমিতে আর ভূমির ফসলে। এই শোষণ ও অত্যাচার কায়েম রাখতে মার্কিন সাহায্য আসছে সেখানে বছরের পর বছর ধরে। এই দেখ সর্বাধিক ক্ষুদ্র রাজ্য হল সালভাডোর। এখানে সামরিক উত্থান ঘটিয়ে প্রগতিবাদী শাসনব্যবস্থাকে নির্মূল করেছে আমেরিকা একষট্টি সালের জানুয়ারী মাসে, আর্জেনটিনার সর্বনাশ করেছে আমেরিকা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বাষট্টি সালে, পেরুতেও সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বাষট্টি সালে। পেরুতে বন্ধুত্বের চিহ্নস্বরূপ তিরাশী মিলিয়ন ডলার ছড়িয়েছে আমেরিকা। আমেরিকার শের-ম্যান ট্যাঙ্ক পেরুর সামরিক অভ্যুত্থানে ব্যবহৃত হয়েছিল। বৃদ্ধ প্রগতিবাদী প্রেসিডেন্ট প্রাদোকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকা কায়েম করল সামরিক শাসন। তার শীর্ষে বসল কর্ণেল গোনজালো ব্রিসেলো। ব্রিসেলোকে তৈরী করেছিল আমেরিকার ধাঁচে। তাই কায়েমী স্বার্থের রক্ষকরূপে ব্রিসেলো দখল করল পেরু।

চে বলল, গুয়েতেমালার জনদরদী সরকারকে উৎখাত করেছে সামরিকবাহিনী। এরা হণ্ডুরাসকে কেন্দ্র করে এগিয়ে এসে দখল করল গুয়েতেমালা। দুর্বল হণ্ডুরাস বাধা দিতে পারেনি। কয়েক মাস যেতে না যেতেই হণ্ডুরাসকেও কুক্ষিগত করল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তারপর এগিয়ে গিয়ে কণ্ঠরোধ করেছে ইকোয়াডোরের। ওদিকে আমাদের সর্বনাশ করার ইচ্ছা নিয়ে ডোমিনিক্যান রিপাবলিকও কুক্ষিগত করেছে। লাতিন আমেরিকায় আর কি রইল ?

তানিয়া বলল, এতে দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষক-সমাজের। অথচ তিপান্ন সালে গুয়েতেমালায়, চুয়ান্ন সালে ভেনেজুয়েলায়, একষট্টি সালে কলম্বিয়াতে কৃষি-উন্নয়নের প্রোগ্রাম নেওয়া হয়েছিল। কার্যকালে দেখা গেল গুয়েতেমালায় আর ভেনেজুয়েলাতে কৃষকের উন্নতির জন্য মোটেই কিছু করেনি সেখানকার শাসকরা—প্রতি-

বিপ্লবকে কায়েম করতে, সফল করে তুলতে দেশের ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের বদলে বড় বড় জমিদারদের হাতে জমি তুলে দেওয়া হল। যদি প্রেসিডেন্ট আরবেনজাকে তাড়িয়ে সামরিক শাসন প্রবর্তন না করা হত, তা হলে চাষী ভূমির অধিকার পেত, কিন্তু বর্তমান মার্কিন প্রভাবে যে সামরিক শাসন চলেছে, তাতে আগামী দেড়শত বৎসরেও হয়ত গুয়েতেমালার চাষীরা চাষের জমি পাবে না।

ফিদেল মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, তাই ওরা কিউবাকে ভয় পাচ্ছে। কিউবা মার্কিন সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, ভূমি তুলে দিয়েছে চাষীর হাতে। ডলারের মালিক মার্কিন শাসকরা মনে করেছে এসব হল কিউবার ঔদ্ধত্য। তাকে শায়েস্তা করতে হলে সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই তারা চেষ্টা করছে প্রতিবিপ্লব ঘটাতে। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ যে সব সংবাদ আনছে তাতে মনে হয় শীঘ্রই আমাদের দেশের অভ্যন্তরে অশান্তি সৃষ্টি করতে পেছ-পা হবে না আমেরিকার তাঁবেদার গোষ্ঠী। বিশেষ করে আমাদের সঙ্গে সোভিয়েতের মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠাতে ওরা আরও বেশি চিন্তিত ও সন্ত্রস্ত। আমরা সংবাদ পেয়েছি, আমাদের আক্রমণ-কেন্দ্র হবে হাইতি। হাইতির অত্যাচারী শাসনকর্তা দ্যু-ভালিয়রকে সাহায্য করতে সামরিক মিশন পাঠিয়েছে আমেরিকা। উদ্দেশ্য, যাতে হাইতির লোক ক্ষুধার জ্বালায় কোন প্রকার বিদ্রোহ না করে, তা দেখা এবং হাইতি থেকে কিউবার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা শত বৎসর ধরে আমেরিকা তার দালাল দিয়ে কিউবা শাসন করেছে। সামাজিক অবস্থা এখানে ছিল নোংরামীতে ভরা, আর্থিক বনিয়াদ ধসে পড়েছিল। এই ব্যবস্থাকে জয় করে সুখী ও সমৃদ্ধ কিউবাকে গড়ে তুলতে হচ্ছে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে আমেরিকা। এতদিন ব্যবসায় বৃদ্ধির নামে দোহন করেছে কিউবাকে। অথচ সে পথ আজ বন্ধ। তাই আক্রোশ বেশি। আক্রোশের ফলাফলও

খুবই অপ্রীতিকর হবে, তাও আমরা জানি। সেজন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা দরকার।

মানচিত্র থেকে মুখ তুলে ফিদেল কাস্ত্রো সমবেত সবাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগ 'সিয়া' (C.I.A.) তার সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছে কিউবাকে ধ্বংস করতে। এই চক্রান্তে অংশ গ্রহণ করেছে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডি, ডালেস, ম্যাকনামারা, ডিলন, ফুলব্রাইট প্রভৃতি বহু সিনেটার। একমাত্র ফুলব্রাইট এই চক্রান্ত সর্বতোভাবে সমর্থন করেনি। এই চক্রান্তকে সক্রিয় করতে যে সব সামরিক বিশেষজ্ঞরা কাজ করছে, তাদের নামও আমরা পেয়েছি। উপকূলে ধৃত অনুপ্রবেশকারীরা প্রকাশ করেছে তাদের নাম। তারাই জানিয়েছে আমেরিকার চক্রান্ত। যে সব কায়েমী স্বার্থের বাহক এ দেশ থেকে পালিয়ে মিয়ামী প্রভৃতি আমেরিকার চক্রান্ত-কেন্দ্রে আশ্রয় লাভ করেছে, তারাই অনুপ্রবেশকারীদের সংগ্রহ করছে। যাতে তারা প্রতিবিপ্লবের অংশ গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য যথাযথ শিক্ষাও দেওয়া হচ্ছে। এসব তথ্য ধৃত অনুপ্রবেশ-কারীদের কাছ থেকে পেলেও আমাদের আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। আমাদের এই পবিত্র ভূমিখণ্ডে এখনও বহু চোরা লোক গোপনে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাদের গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন। নইলে আমাদের সমাজদেহে তারা বিষ প্রবেশ করিয়ে যে কোন সময় প্রতিবিপ্লব ঘটাতে পারে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত আমি জানতে চাই।

সবাই নীচু গলায় আলোচনা করল। সবাই সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করল, দেশের অভ্যন্তরে যেসব সন্দেহভাজন লোক রয়েছে, তাদের গতিবিধি সম্বন্ধে কঠিন দৃষ্টি রাখতে হবে।

কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হল কিউবা। কিউবাতে সোভিয়েত

আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি তৈরীর সংবাদ প্রচারিত হতেই আমেরিকাও সতর্ক হল। এতদিন মার্কিন সরকার মনে করেছিল প্রতিবিপ্লব কিউবাকে জখম করতে পারবে, কিন্তু তাতে কোন ফললাভ করতে না পারাতে প্রেসিডেন্ট কেনেডি স্বীকার করতে বাধ্য হল, unless economic development is carried out along with democratic rule, no valid case can be made against the short-cut totalitarian practices of the Marxist-Laninist Cuban regime and therefore, the west has nothing to offer Latin America ideologically to counter Communism—কামান বন্দুক দিয়ে জনমতকে দাবিয়ে রাখা যে সম্ভব নয়, এই সত্য কেনেডি বুঝলেও বড় বিলম্বিত সে সত্যার্থ লাভ। সামরিক কু (coups) ঘটিয়ে লাতিন আমেরিকাকে ধনতন্ত্রের গোলাম করা গেলেও তার সুদূরপ্রসারী কোন সুফল নেই জেনেও আমেরিকা তার অতীত জলদস্যুবৃত্তি কোনমতেই ছাড়তে পারল না।

আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ফিদেলকে এগোতে হল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সাহায্য নিতে। সোভিয়েত রাশিয়া এগিয়ে এল সাহায্য দিতে। ফিদেল দেখল, তার দেশে শিক্ষিত জনসংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের কম, গৃহহীনের সংখ্যা যে কত তার হিসাব নেই। মৃত্যুহার অত্যধিক বেশি, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বাতিস্তার শাসনকালে ক্রমেই নিম্নগামী হয়েছে। জনসাধারণ তাদের জীবনের নিম্নতম প্রয়োজন মেটাতে পারছে না। ভূমি বড় বড় ধনীর হাতে, শ্রমিক ন্যায্য মজুরি পায় না। সামরিক শক্তি এমন নয় যা দিয়ে মুখোমুখি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করা যায়। এই সমস্যাসঙ্কুল অবস্থায় বাইরের সাহায্য না হলে দেশ গঠন সম্ভব নয়। ফিদেল আবেদন জানিয়েছিল দুনিয়ার তাবৎ সমাজতান্ত্রিক দেশে। সাহায্য ধীরে ধীরে আসতে থাকে কিউবাকে আধুনিকতম রাষ্ট্রে পরিণত করতে।

আমেরিকা নিশ্চিন্তে বসে নেই। স্বাধীন বিশ্বের বুলি শুনিয়ে

ছুনিয়াকে আমেরিকার নয়া-সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবে রাখা হল তার নীতিতে। রাশিয়া যদি কোনক্রমে কিউবাতে তার দূরপাল্লার আণবিক অস্ত্রের ঘাঁটি করে, তা হলে আমেরিকা তার পাশবশক্তি নিয়ে মোটেই এগোতে পারবে না। মার্কিন যুদ্ধবাজরা এতকাল চিন্তা করেছিল কিউবার বর্তমান শাসনব্যবস্থা ধ্বংস করতে। তাই গোপনে প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করাই নিরাপদ, কিন্তু কাস্ত্রো যখন আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল, তখন তাদের নীতি বদল করতে বাধ্য হল।

কেনেডি চেয়েছিল, সরাসরি কিউবা আক্রমণ করতে।

নিকসন ছিল তার বিরোধী।

সোজাসুজি কিউবা আক্রমণ করলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হয়। বিশেষ করে বিগত ছুটি বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার ক্ষয়ক্ষতি মোটেই হয়নি। আমেরিকার মূল ভূখণ্ড থেকে বহুদূরে যুদ্ধ হয়েছে, তার আঁচও লাগেনি আমেরিকার দেহে। বরং কোটি কোটি ডলার উপার্জন করেছে আমেরিকা। যুদ্ধ তাদের খতিয়ানে আশীর্বাদস্বরূপ। তাদের লোকক্ষয় তো হয়ই না, ধনলাভ হয়। এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হতে পারে। কিন্তু কিউবা ছোট দ্বীপ হলেও আমেরিকার অতি নিকটবর্তী। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহলে কিউবা থেকেই আমেরিকাকে আক্রমণ করতে পারবে তার শত্রুরা। আমেরিকার ধন ও সম্পদ ধ্বংস হবেই হবে। এই ঝুঁকি নিতে নিকসন রাজী নয়। শেষ অবধি সিনেটেও এ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি।

তাহলে কি রাশিয়া তার দূরপাল্লা ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি করবে কিউবাতে!

তা করতে দেওয়া হবে না।

উপায়?

রাশিয়ার অস্ত্রবহনকারী জাহাজ আক্রমণ করে তা ডুবিয়ে দিতে হবে।

আমেরিকার ঘোষণা শুনে সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত। সবার আশঙ্কা আমেরিকা যদি রাশিয়ার জাহাজ আক্রমণ করে, তাহলে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবে। রুদ্ধশ্বাসে বিশ্ববাসী অপেক্ষা করছে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান দুটি রাষ্ট্র যেভাবে সেদিন মুখোমুখী হয়েছে, তা ছিল কল্পনার বাইরে। শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন জানাল. নিরপেক্ষ দেশ সমূহ।

রাশিয়ার জাহাজ এগিয়ে চলেছে।

কেনেডি তার বিমানবহর ও নৌ-বহরকে আক্রমণের আদেশ দিয়েছে।

সর্বনাশ সম্মুখে। কি হয় কি হয় অবস্থা।

সব শঙ্কার অবসান ঘটল। রাশিয়ার নৌ-বহর মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেল স্বদেশের দিকে।

পৃথিবীর একটি নিশ্চিত সঙ্কট তখনকার মত এড়ানো গেল রুশীয় নেতাদের শুভ বুদ্ধিতে।

আমেরিকাও তার ঔদ্ধত্যকে সংযত করতে বাধ্য হল। কিউবা যখন আমেরিকার সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিল, তখন আমেরিকা চোখ রাঙিয়ে হুমকি দিয়েছিল, for prompt, adequate and effective compensation. ক্ষতিপূরণ দেবার ক্ষমতা কিউবার নেই জেনেই এই হুমকি। তার ফলাফল যে গুরুতর হতে পারে জেনেই মার্কিনের এই দাবী। ফিদেল কাস্ত্রো চিন্তিত হলেও মোটেই ভ্রূক্ষেপ করেনি, বরং বিদেশের সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকে সাহায্য নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট ছিল। রাশিয়া ও আমেরিকার এই দ্বন্দ্ব ঘটতেই আমেরিকাও বুঝতে পারল, তাদের চোখ রাঙানী সহ্য করতে রাজী নয় কিউবা। প্রথমে কাস্ত্রো বিশ বছরে আমেরিকাকে দাবী শোধ করতে চেয়েছিল, আমেরিকা তাতে রাজি হয়নি। অবশেষে শূন্য হাতেই আমেরিকাকে ফিরতে হল ঘরে।

কাস্ত্রোর চোখের সামনে ছিল গুয়েতেমালার উদাহরণ। দুর্বল

সমাজতান্ত্রিক দেশকে কি ভাবে সংহার করা যায়, তা সে নিজে দেখেছে। পাশবশক্তি দিয়ে গুয়েতেমালার সর্বনাশ করেছে ইয়াঙ্কীরা। তাই সাবধানে থাকতে হত তাকে। কাস্ত্রো প্রকাশ্যে বিবৃতি দিল : আমার দেশকে দ্বিতীয় গুয়েতেমালা হবার সুযোগ দেব না। যারা তা আশা করে, তারা মূর্খ। আমরা বুর্জোয়া নোংরামীকে নির্মূল করতে সমর্থ। আমার দেশের শতকরা আশীজন আমাদের এই শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে, বাকি বিশ-জন শিশু ও বৃদ্ধ, তাদের সমাজতন্ত্র বিষয়ে হয়ত পুরো জ্ঞান নেই। এ থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিশ্চয় বিশ্বাস করবে, গুয়েতেমালার দ্বিতীয় পর্যায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

কাস্ত্রোর শক্তির উৎস হল জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা আর মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের ইস্পাতের মত অনমনীয় মনোবল। নিজের দেশের অবস্থা বর্ণনা করতে কাস্ত্রো বলেছে : "Cuba is a small economically undeveloped country, the same as all those countries dominated by colonialism and imperialism * * Great dangers have threatned our country since the triumph of the Revolution but not because of this will imperilalism succeed in making us yield, not being important to us the difficulties that a consequent revolutionary line entails"—রাজনীতির ঘন তমসার মাঝ দিয়েই ক্ষীণ আলোর যে রেখা দেখা যাচ্ছে কিউবাতে, তার ভাগ্য স্রষ্টারা কিন্তু চুপ করে থাকতে পারেনি কিউবার মুক্তি হওয়া মাত্র। তারা নিশ্চিন্ত হল, যখন আমেরিকার প্রতিবিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হল।

কিন্তু !

গৃহে ফিরে যখনই অবসর পেয়েছে চে গুয়েভারা, তখনই তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছে উত্তরপুরুষদের জন্য। বিশেষ করে

লাতিন আমেরিকার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক পর্যুদস্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের জন্য।

য্যালাইদা মার্চ চে গুয়েভারা তার উপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী। অসুস্থ স্বামী যখন এই সব লিখত, তখন য্যালাইদা তাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করত। আদর্শ স্ত্রী ও মহৎপ্রাণা মহিলার নাম করতে হলে ডাক্তার চে গুয়েভারার স্ত্রী য়্যালাইদার নাম সর্বাগ্রে করতে হয়।

চে-র জীবন-ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে করতে অনেকটা এগিয়েছি আমরা।

শয্যাশায়ী চে য়্যালাইদাকে পাশে বসিয়ে বলল, আমি ক্রমেই সুস্থ হয়ে উঠছি। শীগ্‌গিরই নতুন কর্মক্ষেত্র বেছে নিতে হবে কিন্তু আমার বক্তব্যগুলো লেখা শেষ হয়নি য়্যালাইদা। আমি বলব, তুমি লিখবে। এতে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারব।

তুমি সুস্থ হচ্ছ তা আমি বুঝেছি, কিন্তু এত বড় কঠিন কাজ কি করা উচিত হবে?

আর সময় পাব না য়্যালাইদা। বিছানায় শুয়ে বসে দিন আর কাটছে না। তুমি আমাকে সাহায্য যদি না কর, তা হলে আমার বক্তব্য জানতে পারবে না ভবিষ্যত বংশধররা।

বেশ আমি লিখব।

পরদিন সকালের কাজ শেষ করে য়্যালাইদা কলম তুলে নিল হাতে। চে বলতে থাকে ঃ

আমরা যুদ্ধ করেছি। শত্রুকে পরাস্ত করেছি। কিন্তু বিপদমুক্ত এখনও হইনি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরা সজাগ। সেজন্য সমাজতন্ত্র কায়েম করে যদি জনসাধারণের অর্থ-নৈতিক পরিবর্তন না আনতে পারি, তা হলে জনতা সাম্রাজ্যবাদের শিকারে পরিণত হতে পারে।

আমরা শুধু মুক্তিযোদ্ধাই নই, আমরা সমাজের বন্ধু, সমাজ-

সংস্কারক। আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হল, কৃষকের ও কৃষির উন্নতি করা। আমরা দেখব বিপ্লবের আগে কৃষির কি অবস্থা ছিল এবং বিপ্লবের পরে কি ভাবে তার উন্নতি করা যায়। সে বিষয়ে চিন্তা করে কৃষকদের সেই উন্নতির পথে নিয়ে যেতে চাই আমরা।

সমাজ-সংস্কার সম্ভব করে তোলা যায় না বিপ্লবের প্রথম অবস্থায়। সামাজিক অবস্থাকে অনিচ্ছার সঙ্গে কিছুটা স্বীকার করে নিতে হয়। বিপ্লবের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজও এগিয়ে চলে।

আমাদের রসদ দরকার। মূল্য আমরা দিতে পারি না সব সময়। আমরা সেজন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দেব অর্থ পরিশোধের এবং যখনই আমাদের হাতে অর্থ আসবে, তখনই সর্বাগ্রে এই প্রতিশ্রুতিপত্র ফিরিয়ে নিয়ে নগদ মুদ্রা দেব। এতে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস জন্মাবে আমাদের ওপর।

কৃষকদের শেখাতে হবে বৈজ্ঞানিক চাষের পদ্ধতি। আর্থিক সাহায্য দিতে হবে, নৈতিক সাহায্য করতে হবে, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ সৃষ্টি করতে হবে। গরীবদের সাহায্য করতে হবে, কিন্তু ধনীদের ওপর কোন অত্যাচার যাতে না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। গরীবের সংহত না করা পর্যন্ত ধনীর কার্যকলাপে নজর দিলে ধনীরা সক্রিয়ভাবে আমাদের কাজে বাধা দেবে। ধনীদের মোটামুটি অকেজো করে রাখাই হল বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের কাজ যত অগ্রসর হবে, ততই ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানটা কমিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। যে সব পাতি বুর্জোয়া আমাদের প্রতি প্রথমে সহানুভূতিশীল মনে হয়েছিল, যতই ব্যবধান কমাবার চেষ্টা হবে ততই তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকবে। সেজন্য সতর্কতার সঙ্গে যার বেশি জমি আছে, অথবা বেশি গো-ধন আছে, তা ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে দরিদ্রের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে দিতে হবে।

যাদের আমরা মনে করি সমাজতন্ত্রের শত্রু, তাদের ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ যত সত্বর সম্ভব দখল করে বণ্টন করা উচিত। যুদ্ধের সময় ভ্রাতৃভাবসম্পন্ন লোকদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে হবে এবং এই সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতেই হবে।

মুক্তিযোদ্ধা আদর্শবাদী। তার চরিত্র হবে অপরের অনুকরণ-যোগ্য। জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার নিজের আদর্শ এবং তার কি করার আছে, তাও বুঝিয়ে বলতে হবে। যদি সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে আমাদের কাজে, তারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাবে এবং যে পরিবর্তনের জন্য আমরা সংগ্রাম করছি তা তাদের হিতকামী, তা হলে তাদের সমর্থন, সহযোগিতা ও সহানুভূতি লাভ করতে আমরা সমর্থন হব এবং তা হবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপকারী।

মুক্তিযোদ্ধা সমাজ-সংস্কারক, এই বিশ্বাস আনতে হবে জন-সাধারণের মনে। জনসাধারণ যাতে কোন রকমে উৎপীড়িত না হয়, তাদের গৃহের পবিত্রতা যাতে কোন রকমেই ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই হল মুক্তিযোদ্ধাদের ধর্ম।

জনসাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের যদি দস্যু মনে করে, যদি সন্ত্রাসবাদী মনে করে, তা হলে বিপ্লব সাফল্যলাভ করতে পারে না।

অনেক লোক আছে, যারা সমাজের এই পরিবর্তনকে সমর্থন করে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই পরিবর্তনকে এড়িয়ে চলে। চাষী জমি পাবে, একথা স্বীকার করেও অনেক জমির মালিক আছে, যারা নিজের এক ছটাক জমিও চাষীকে দিতে চায় না। এরূপ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই সব লোক যদি যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে, বাধ্য হয়ে তখন তার সম্পদ সমবণ্টন করতেই হবে। প্রয়োজন হলে অস্ত্রের সাহায্যও নিতে হবে।

লেখা শেষ করে য়্যালাইদা কাগজ কলম উঠিয়ে রেখে দিল।

চল, আজ বেড়িয়ে আসি। বলল য়্যালাইদা।

কোথায় যাবে ?

খোলা আলো বাতাসে ঘুরলে তোমার শরীরও ভাল থাকবে, মনটাও প্রফুল্ল হবে।

তা মন্দ নয়। ছেলেদের সঙ্গে নাও। ওরাও মাঠে মাঠে ঘুরে খুশী হবে। আমরাও আমাদের ভূমি-সংস্কার-ব্যবস্থা কতটা সাফল্য-লাভ করল, তা দেখে আসতে পারব।

আমিও জেনে আসব এই শাসনব্যবস্থায় লোক সুখে আছে কিনা।

বোধহয় দেখবার প্রয়োজন আর নেই। আমাদের রক্তপাত বৃথা যায়নি য়্যালাইদা। বিনা রক্তপাতে কোনদিনই জনতার মুক্তি হত না। আমরা যদি বুর্জোয়াদের বলতাম, তোমরা জনসাধারণের উপকার যাতে হয় তা কর, তা কি তারা করত? asking the oligarchs to sign their own death warrants by agreeing to land reform, tax reform and other innovations that will depress their own status—তা কি সম্ভব? তারা কি নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানাকে স্বীকার করতে পারে? তা পারে না বলেই সশস্ত্র বিপ্লবকে আমরা মুক্তির পথ মনে করেছি। যে সব দেশে জনতার মুক্তির জন্য আবেদন নিবেদন করা হয়েছে, সে সব দেশে জনতাকে কায়েমী স্বার্থের লোকেরা ঠকিয়েছে। They have replied to our proddings by ruse and fraud, তারা জনদরদী সেজে জনতাকে বিভ্রান্ত করার কম চেষ্টা করেনি এবং তাতে সাফল্যলাভ করেনি, এমন নয়। জনতার দুঃখ মোচন যে বড় সমস্যা; তা জেনেও তারা বঞ্চনার নানা পথ ধরেছে। I nevitably, we are led to only possible solution—the establishment of a socialist order, firstly within national boundaries and eventually in the world as a whole—(Nehru). কিন্তু সত্যই কি সমাজতন্ত্র হয়েছে এই বক্তার দেশে! সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ বলতে যা তারা বোঝে, তা যে ঠিক কি ধরণের, তা দুনিয়ার মানুষ বোঝে না। জনতার

সামনে গালভরা কথা তুলে ধরে তাদের মোহাবিষ্ট করে বঞ্চনা করতে জানে কায়েমী স্বার্থের প্রহরী এই সব ধূর্ত মানুষ। এতেই তারা ক্ষান্ত হয় না। তারা সম্পদকে জনসাধারণের উপকারে ব্যয় করতে ও বণ্টন করতে চায়। যারা সে পথে বিঘ্ন তাদের উৎখাত করার কথাও এই সব বাক্যবাগীশরা বলে থাকে—If political institutions or social institutions stand in the way if such change they have to the removed. (Nehru)—বক্তা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু। তাকিয়ে দেখ ভারতের অবস্থা। বক্তার বক্তব্য কোথাও কার্যকরী হয়নি। ভারতের দরিদ্র জনগণ আরও দরিদ্র হয়েছে এবং ধনী আরও ধনের অধিকারী হয়েছে। ভারতকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে আমেরিকার কাছে। তাই আপোষে কোন সময়ই জনতার দুঃখ-দুর্দশা মোচন সম্ভব নয়। আমাদের কাজের ফল নিশ্চয়ই জনতার উপকার করেছে। তবুও দেখে আসব।

সেদিন বিকেলে দুজনেই বের হল ছেলেদের হাত ধরে। গ্রাম-পরিক্রমা শেষ করে বৃদ্ধ য়্যাজউইলের কুটিরে এসে বসল। চে চুরুটে আগুন দিয়ে য়্যাজউইলের পাশে বসে বলল, খুড়ো, আজকাল তোমার শরীর কেমন আছে?

শরীর ভালই আছে ডাক্তার সাহেব। তবে মাথাটা মাঝে মাঝে ঝিমঝিম করে। যখনই ভাবি, দশ পনের বছর আগে বউ আর ছেলেমেয়ের হাত ধরে শহরের রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াতাম, তখনই মাথাটা কেমন করতে থাকে। বুদ্ধিসুদ্ধি তালগোল পাকিয়ে শরীরটাকে অবসন্ন করে তোলে।

ভিক্ষা করতে কেন খুড়ো? তখন তো তুমি কাজ করে খেতে পারতে।

পারতাম কিন্তু কাজ কোথায়! ছয় একর জমি ছিল চাষের। ইয়াঙ্কী সুগার কোম্পানী জমিটা দখল করল। বলল, জমির বদলে

জমি দেব। কাজের বেলায় জমি তো দূরের কথা, জমি কেনার টাকাও দিল না। ক্ষতিপূরণ বলে যে টাকার ব্যবস্থা হল, তা কিস্তিতে দেবে বলে জানিয়েছিল। অথচ একটা কিস্তি দিয়ে আর টাকা দিল না। বলতে গেলাম, বলল, আদালতে নানিশ কর। আদালতে নালিশ করার সামর্থ্য কি আমার ছিল। ছিল না ডাক্তার। অন্য কোন কাজও তো জানতাম না। তাই পেটের দায়ে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতাম।

তোমার ছেলেমেয়ে কটা ?

ছেলে দুটো। মেয়ে ছিল চারটে। এখন আছে একটা।

আর তিনটে মেয়ে গেল কোথায় ?

জানি না। খেতে দিতে পারিনি ডাক্তার। তাই তারা পালিয়ে গিয়েছিল। হয়ত এখনও বেঁচে আছে। কিন্তু আজও তাদের কোন ঠিকানা জানি না। হয়ত কোন গ্রামে আশ্রয় পেয়েছিল, হয়ত কোন ধনীর গৃহের দাসী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল।

কোথায় চললে ডাক্তার সাহেব? একটু কোকো খেয়ে যাও। আমার গৃহিণী খুব ভাল কোকো তৈরী করতে পারে। এমন সুন্দর কোকো এই গ্রামের আর কেউ তৈরী করতে পারে না।

ডাক্তার মৃদু হেসে বলল, তোমার ছেলেরা কোথায় ?

বড়টা চাষের কাজ করছে। ছোটটা লড়াই করতে গিয়েছিল। এখনও ফেরেনি। হাভানায় আছে। আসে মাঝে মাঝে। বেশ আছে।

য়্যাজউইলের গৃহিণী গরম কোকোর পেয়ালা সামনে রেখে বলল, খাও ডাক্তার। আমার কি সৌভাগ্য, তুমি আমার ঘরে পায়ের ধূলো দিয়েছ। চিরকাল মনে থাকবে তোমার দয়াকে।

লজ্জিত ভাবে চে বলল, ও ভাবে বললে আর আসব না কিন্তু। আমাকে তোমার একটি ছেলে মনে করবে, তবেই আসব।

তাই করব বাপু। তুমি এলে আমি যে কি খুশী হই। কি করে বুঝাব কত আনন্দ হয় তোমার মত একটি ছেলে আমার ঘরে এলে।

য়্যালাইদা তখন ভেতরের ঘরে বৃদ্ধের পুত্রবধূকে নিয়ে গল্পে মেতেছে। সমুদ্রের ধারে ছিল এই মেয়েটির বাপের বাড়ি। বাবা ছিল বড় চাষী। বিপ্লবের প্রথম দিকে তার বাবার জমি ভূমিহীনদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল।

তুমি বিশ্বাস করবে না ম্যাদাম য়্যালাইদা। আমরা তো ভয়ে কাঁপছি। যমের মত চেহারা কয়েকজন বিশ বছরের জোয়ান ছেলে সাব-মেশিনগান নিয়ে এসে হাজির হল আমাদের দরজায়। গ্রামের কিছু লোক ছিল তাদের পেছনে। তারা বিকট চীৎকার করছিল। আমরা তো ভাবলাম ডাকাত পড়েছে। ওদের একজন বলল, ফ্রনডিজি কোথায়?

বাড়ির বুড়ো চাকর বলল, কর্তা ঘুমচ্ছে।

ডেকে আন তাকে।

বুড়ো চাকর ভেতরে আসতেই বাড়ির অন্যান্য চাকররা বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত হল ডাকাতদের বাধা দিতে। বাবা মানা করল তাদের। বলল, দিনের বেলায় ডাকাত পড়লে ভয় কি। দরকার হলে গুলী চলবে। আগে শুনতে দাও ওরা কি বলে।

বাবা বাইরে গেল একাই। আমরা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছি।

ওদের একজন বলল, তুমি বোধহয় জান আমরা কৃষকের স্বার্থ-রক্ষার জন্য বাতিস্তা সরকারের সঙ্গে লড়াই করছি।

বাবা বলল, শুনেছি।

বর্তমানে এই এলাকা আমাদের শাসনাধীন। আমরা ভূমি-সংস্কার করতে চাই। আমরা জানি, তোমার পাঁচশ একর জমি আছে। আর এই যে গ্রামবাসী, এদের এক ডেসিম্যালও জমি

নেই। আমরা চাই, তোমার জমি থেকে কিছু জমি এদের মাঝে বণ্টন করে দিতে। আশা করি, তোমার এতে আপত্তি নেই।

বাবা অনেকক্ষণ ভেবে বলল, ঠিক আছে। আমি এদের মধ্যে চারশ একর সমান ভাবে ভাগ করে দিতে পারব।

ধন্যবাদ। আমরা তা হলে নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরতে পারি।

নিশ্চয়। কাল ওদের আমি জমির দখল দেব।

বাবা অত সহজে রাজি হতেই আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। বাবাকে জিজ্ঞেস করতেই বাবা বলল, জমির ওপর আমার কি অধিকার আছে? জমি তো ওদেরই। বাকি যে একশ একর জমি, তাও থাকবে না। আমার যতটা প্রয়োজন তার বেশি রাখা চলবে না। আজ হোক আর কাল হোক ওদের জমি দিতেই হবে। যদি এক কথায় রাজি না হতাম, তা হলে ওরা জোর করে কেড়ে নিত। তাতে আমার সামান্য দাবীটুকুও ওরা অগ্রাহ্য করত। সেই জন্যই যা সহজ ও সরল তাই করেছি।

এরপর মাঝে মাঝেই দল বেঁধে মুক্তিসেনারা আমাদের গ্রাম পেরিয়ে যেত। মাঝে মাঝেই দেখতে পেতাম দল বেঁধে চাষীরা এগিয়ে চলেছে। শুনতাম, ওরা জমির আশায় যাচ্ছে। আবার মাঝে মাঝে বন্দুক, বোমার আওয়াজ শুনতে পেতাম। ভয় হত কিন্তু শেষের দিকে আমাদের বাড়িতে এল একদল মুক্তিসেনা। তারা রয়ে গেল রাতটা। দু'একজনের সঙ্গে সাহস করে কথা বললাম। তারাই বলল, আমাদের দেশের মুক্তির পথে একমাত্র পুরুষই কিছু করতে পারে না। মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

আমরা দল বেঁধে সেদিন থেকে কাজে নেমে পড়লাম।

য়্যালাইদা হাসতে হাসতে বলল, জুনিয়ার য়্যাজউইলের সঙ্গে পরিচয় হল কোথায়?

এই গ্রামেই। এখানে একটা হাসপাতাল ছিল। আমি ছিলাম সেখানে সেবিকা।

বুঝলাম। সুখে আছ তো?

আহার্য না থাকলেই অশান্তি। এখন আর সে অভাব তো নেই ম্যাদাম। অশান্তি সৃষ্টির পথ আপনা থেকেই বন্ধ। যাদের কাজ আছে, পেটে ভাত আছে, তাদের সময় কোথায় অশান্তি সৃষ্টি করার।

বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, য়্যালাইদা।

আসছি। চলি বোন। সময় পেলে আমাদের কুটিরে এস।

তোমরাও সময় পেলে এস কিন্তু।

জান তো আমার স্বামী অসুস্থ। সে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোন কথা দিতে পারি না। ওর স্বাস্থ্য ভাল হলেই আসব। তোমরা যেও কিন্তু।

বিদায় নিয়ে য়্যালাইদা বের হল ঘর থেকে।

দুজনে পথে এসে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

বজ্রাঘাতের মত চে-র একখানা চিঠি পৌঁছল ফিদেল কাস্ত্রোর হাতে।

চে লিখেছে: বন্ধু ফিদেল, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। খোলা দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখছি, আমার আরব্ধ কাজ এখনও শেষ হয়নি। লাতিন আমেরিকার সহস্র সহস্র নির্যাতীত মানুষের আর্ত ক্রন্দন আমার কর্ণপটে আঘাত করছে। সেই ক্রন্দনধ্বনি আমাকে উৎক্ষিপ্ত করছে, হাতছানি দিচ্ছে কর্মের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে। আমার বাসস্থান তো কোন ভূমিরেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের সব পরিশ্রম ও রক্তপাত নিষ্ফল হয়েছে গুয়েতেমালায়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, এল-সালভেডর, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকোয়াডোর, পেরু, বলিভিয়া—বলতে গেলে গোটা লাতিন

আমেরিকা। এদের মুক্ত করতে হবে বুর্জোয়া শাসন থেকে, সাম্রাজ্যবাদের পেষণ থেকে, সামন্ততন্ত্রের শোষণ থেকে। এই মহান কার্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ধর্ম গ্রহণ করেছি আমি। তাই অতি বিনীতভাবে নিবেদন করছি, কিউবার কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ থেকে আমাকে রেহাই দেওয়া হোক। আমি নতুন দেশে নতুন কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যরূপে নিজেকে মুক্তিযুদ্ধে নিয়োগ করতে চাই।

আশা করি, তোমরা আমার এই পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করবে এবং কিউবা থেকে বিদায় নিতে অনুমতি দেবে। আমার যে সব কর্তব্য ছিল কিউবার প্রতি, তা যথাসাধ্য সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। কতটা সাফল্যলাভ করেছি, তা তোমরাই বিচার করবে।

আমার স্ত্রী য়্যালাইদা ও সন্তানদের বর্তমানে রেখে গেলাম তোমার আশ্রয়ে। যতদিন নতুন আশ্রয় তৈরী করতে না পারি, ততদিন তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণেই তারা থাকবে। —তোমার সহকর্মী চে।

চিঠি পেয়েই কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সদস্যকে ডেকে পাঠাল ফিদেল। মন্ত্রণা-সভা বসল। সবাই চে-কে এই কাজ থেকে বিরত করার প্রস্তাব তুলল।

ফিদেল বলল, চে-র মত বদল অসম্ভব। সারা জীবনে অসংখ্য যুদ্ধে চে ছিল আমার সহকর্মী। তাকে আমি যতভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছি, এমন করে দেখার সুযোগ হয়ত অনেকেই পায়নি। আমি জানি, চে যদি কোন বিষয়ে কোন মতে উপস্থিত হয়, তা কোনক্রমেই বদল করা যায় না। আমাদের উচিত, তার পরিবার যাতে শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করে, তার ব্যবস্থা করা এবং তার কর্মধারা সম্বন্ধে কিছু জানতে চেষ্টা করা। এর চেয়ে আমরা তার কাছে গিয়ে যদি কিছু করতে পারি, সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

সবাই সম্মত হল ফিদেলের প্রস্তাবে।

পরদিন দলবদ্ধ হয়ে সবাই গেল চে-র পল্লীভবনে। চে তখন কাগজ কলম নিয়ে তার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছিল। সঙ্গীদের নিয়ে ফিদেলকে আসতে দেখেই চে উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাল। হাসতে হাসতে বলল, আমি জানতাম তোমরা আসবে। কিন্তু আমার যা বলবার, তা তো বলেছি।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসল ফিদেল। বলল, তোমার মত পরিবর্তন করতে আমরা পারব না, তা জেনেই এসেছি। কিন্তু কোথায় তোমার কর্মক্ষেত্র হবে, কি ভাবে কাজে অগ্রসর হবে, তা তো জানি না। সে সব শুনতে এসেছি। আর সে সম্বন্ধে আলোচনাও প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

এখনও মনস্থির করতে পারিনি। আমি এখন আমার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করছি। লেখা শেষ হলে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি কর্মক্ষেত্র স্থির করব। আশা করি, তোমরা তখন তোমাদের মতামত দেবে। ইতিমধ্যে কয়েকটি বিদেশী কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টাও করছি।

লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহে যেসব কম্যুনিষ্ট পার্টি গজিয়েছে, তারা হল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের উপাসক। বাইরের খোলস ঠিক রেখে অন্দরে তারা তোষণ করছে মার্কিন ডলারকে। যে সমস্ত বিপ্লবী প্রগতিশীল শক্তি এতদিন স্থান গড়েছিল দুর্বল লাতিন আমেরিক্যান রাষ্ট্রে, সে সব স্থানে সাময়িক 'কু' ঘটিয়ে প্রগতির কণ্ঠরোধ করা হয়েছে ইতিমধ্যে। এই সর্বনাশা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করে এগোতে হবে বন্ধু চে। সেজন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আমি নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েই অগ্রসর হব বন্ধু। আমাকে চিন্তা করতে হবে কোন্ পথ ধরে আমি অগ্রসর হব। সেজন্য তোমাদের অভিমতও শ্রদ্ধা সহকারে গ্রহণ করব।

আমেরিকা সাম্যবাদী আন্দোলনকে রোধ করতে বিশ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে প্রতি বৎসরে কেবলমাত্র কোরিয়া, তাইওয়ান,

পাকিস্তান ও তুরস্কে। পাকিস্তানে মার্কিন ঘাঁটি পাকা করে রেখেছে সাহায্য দানের আচ্ছাদনে। সোভিয়েতকে চোখ রাঙিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে তুরস্কে ক্ষেপণাস্ত্র-কেন্দ্র করেছে। এরপরই ইস্রায়েল হল অপর কেন্দ্র। এইসব দেশের সাধারণ মানুষের যে কি দুর্দশা, তা বলে শেষ করা যায় না। কোরিয়াতে (দক্ষিণ) কোন অসামরিক শাসনব্যবস্থা নেই। সিংম্যান রীকে সং সাজিয়ে রেখেছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। তাইওয়ানের চিয়াংকাইশেকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ঢাল-তলোয়ারবিহীন বীর চিয়াং কেবল বাঁধানো দাঁতের খিঁচুনি দিচ্ছে প্রজাতান্ত্রিক চীনকে, তার মূল শক্তির উৎস হল আমেরিকা। পাকিস্তানের মানুষ মাঝে মাঝেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। তাদের সাম্প্রদায়িক করে তুলে ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করতে প্ররোচিত করতে শাসকরা বেশি ব্যস্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি ঘটেছে। সেজন্যই অক্ষম সামরিক শাসন ভিন্ন কোন সভ্য শাসন-ব্যবস্থা সেখানে নেই। তুরস্ক ছিল গত কয়েক দশকের প্রগতিশীল মুসলিম রাষ্ট্র। তাকেও পেছনে টেনে নিয়ে চলেছে আমেরিকার ডলার। এইসব সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের সঙ্গে লড়বার মত মনোবল আমাদের আছে জানি, কিন্তু সে দেশীয় সাম্যবাদী সংস্থা-গুলোও ধীরে ধীরে বিপ্লবের কথা ভুলে সামরিক, আধা-সামরিক শাসন-ব্যবস্থার কাছে মাথা নত করেছে। তারা শোধনবাদী অথবা চোরা প্রতিক্রিয়াশীল। সেজন্য ওদের ওপর ভরসা রেখে চলা উচিত হবে না ডাক্তার।

তা জানি। সেজন্য বিশেষভাবে ছেঁকে দেখতে হবে। কিউবায় আমাদের সাফল্য আমেরিকাকে স্তম্ভিত করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট কেনেডিকে বলাও হয়েছে, for unless necessary social reforms including land and tax reform are freely made, unless we broaden the opportunity for all our people—unless the great mass of Americans share in increasing prosperity—than our alliance,

our revolution and our dream will have failed—আমেরিকা চেয়েছে সংস্কার, কিন্তু তা জনসাধারণের স্বার্থে নয়। শাসন-ক্ষমতা যাদের হাতে আছে, তারাই ক্ষমতাকে চিরকালের জন্য কুক্ষিগত রাখুক। যাকে বলে প্রগতিশীল বুর্জোয়া—সেই প্রগতিশীল বুর্জোয়ার ভূমিকা গ্রহণ করে সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করাই হল এদের উদ্দেশ্য। ঠিক এইভাবেই মার্কিন প্রভাবান্বিত রাষ্ট্রগুলোতে প্রগতিশীল বুর্জোয়ার ধুয়া ধরে সাধারণ মানুষকে এরা বঞ্চনা করতে চায়। তাদের এই ভণ্ডামির শিকার হয়েছে তথাকথিত সাম্যবাদী দলসমূহ। এটাই হল সবচেয়ে মর্মান্তিক।

কেন এসব হয়েছে তা বোধহয় জানো। The Communist parties in Latin America generally go for "popular fronts" national democracy coalitions and so on. They have not sufficient popular support to make a revolution and so they sacrifice immediate revolutionary action—even thought (Wright Mills). সাম্যবাদী প্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। জন-সংযোগ ও জন-সংগঠন না থাকায় তাদের এই দুর্দশা। বিপ্লবের কথা তারা ভুলে গেছে, তারা জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখছে। এটাই হয় বন্ধু। ভারতেরও এই দুর্দশা দেখা দিয়েছে। সেখানেও পার্জিং আরম্ভ হয়। একদল সোজাসুজি শোধনবাদীতে পরিণত হয়েছে। অপর দল বাইরের আবরণ দিয়ে বিপ্লবী বুলি কপচাচ্ছে, কিন্তু আসলে তারাও জনতা থেকে অনেক দূরে থাকায় national democracy অথবা peoples democracy বলে চীৎকার করছে। যারা বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক ধারায় চিন্তা করে, তারা আসর জমাতে পারছে না শোধনবাদীদের মোহময় বঞ্চনার জোর প্রচার-ব্যবস্থা আর গণতন্ত্রের ভুয়া বুলিতে। তাই আমাদের চিন্তা করতে হবে কি ভাবে শোধনবাদী ও চোরা সাম্যবাদীদের হাত থেকে দুনিয়াকে রক্ষা করা যায়। তুমি বন্ধু কাজে এগোবার আগে ভাল করে চিন্তা করবে। ভুল যেন না হয়।

চে শুধু হাসল।

য়্যালাইদা অতিথিদের খাবার তৈরী করে টেবিল সাজিয়ে অপেক্ষা করছিল। ম্যাদাম লুজান এসে খেতে বসতে আমন্ত্রণ জানাল সবাইকে।

খেতে খেতে ফিদেল বলল, ম্যাদাম য়্যালাইদা নিশ্চয়ই তার স্বামীর পরবর্তী কর্মপন্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল।

য়্যালাইদা হেসে বলল, জানি।

তোমার কিছু বক্তব্য নেই ?

না। আমরা দেশের জন্য, মানুষের জন্য। আমাদের কোন বক্তব্য নেই মানুষের ক্রন্দনে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে। আমার স্বামী যা করে তাতে আমার কোনদিনই কোন বক্তব্য ছিল না, আজও নেই। এ সম্বন্ধে মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী মেজর কাস্ত্রোর কাছে বিরূপ কিছু নিশ্চয়ই কেউ আশা করে না। বিপ্লবে স্বামী-স্ত্রী অচ্ছেদ্য সাথী। নইলে মুক্তি কেমন করে আসবে, কে আনবে।

ফিদেল খুশী মনে বলল, ঠিক বলেছ ম্যাদাম। তুমি আমাদের নমস্য। কিউবার ঘরে ঘরে তোমার মত নারী জন্ম নিলে আর আমাদের কোন দুঃখ ও ভীতি থাকবে না।

সবাই মন্তব্যকে মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

চে এতক্ষণ শুনছিল। খাবারের থালা থেকে নজর তুলে বলল, আমি কিউবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু লিখেছি। তুমি যদি শুনতে চাও, তাহলে য়্যালাইদা তোমাকে তা পড়ে শোনাবে।

আজ সময় নেই বন্ধু, অন্যদিন শুনব। তুমি যাবার আগেই আমি সময় করে আসব তোমার কাছে, তখন শুনব। অবশ্য তোমার বিশ্লেষণকে শ্রদ্ধা সহকারেই আমি গ্রহণ করব।

সেদিন ফিদেল সদলে ফিরে গেল। চে কিউবা ছেড়ে যাবার আগে আবার দেখা করার আশা নিয়েই ফিরে গেল ফিদেল।

রাতের বেলায় চে-র লেখা 'কিউবার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধ

পড়ছিল য়্যালাইদা। চে পাশে বসে শুনছিল তার নিজের লিখিত বক্তব্য।

ঃ এক বছর আগে কিউবার ডিকটেটর পালিয়ে গেছে কিউবা থেকে। কিউবার সাধারণ মানুষ যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করেছিল ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে, তা জয়লাভ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। কিভাবে এগিয়েছে, কতটা এগিয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা ও তার মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। আমাদের এই বিপ্লব ও বিপ্লবের সাফল্য মূলত ছিল কৃষক-সমাজের সক্রিয় সহ-যোগিতার ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য শ্রমিক, মধ্যবিত্তশ্রেণীও সহযোগিতা করেছে সম্পূর্ণভাবে এবং বর্তমানে শিল্পের মালিকরাও এগিয়ে এসেছে কিউবার সমাজতন্ত্রী সরকারকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে। এর ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিউবা। বিশেষ করে কিউবা বিপ্লবের বিশেষ একটি ধারাকে এবং জনতার অনমনীয় মনোভাবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে পৃথিবীর মানুষ।

ঃ জনসমাজের উপকারের জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তা বিশদভাবে বলা সম্ভব নয়। তার মধ্যে কতকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। কারণ এগুলো ধীরে ধীরে আমাদের দেশকে উন্নতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে এবং কিউবার বহু সমস্যার সমাধানও হয়েছে।

আমরা পরোপজীবীদের সমাজ থেকে বিচ্যুত করতে খাজনার আইন করেছি, ইলেকট্রিকের মূল্য কমিয়েছি, টেলিফোনের চার্জ কমিয়েছি—এগুলো খুব তাড়াতাড়ি করতে হয়েছে। অনেকেই মনে করেছিল ফিদেল ও তার সঙ্গীরা মধ্যযুগীয় স্বার্থান্বেষী যুদ্ধবাজ, পার্থক্য শুধু তাদের শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখ—তারা নিরাশ হয়েছে। কায়েমী স্বার্থে আঘাত লেগেছে। বিশেষ সুবিধা যারা ভোগ করে এসেছে,

তারা বিপদগ্রস্ত হয়েছে। যে সমস্ত ধনতন্ত্রবাদীরা এতকাল শোষণ করেছে, তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে প্রগতিশীল আইন চালু করতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা আত্মসমর্পণ করেছে জনস্বার্থ রক্ষা করতে।

ঃ ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার হল সবচেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য আইন। যারা এতকাল ভূমি দখল করে কৃষকদের বঞ্চিত করেছে তারা নানা-ভাবে অশান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছে। এরপর যখন তারা কোন রকমেই তাদের কায়েমীস্বার্থ রক্ষা করতে পারেনি, তখন তারা বিদেশে পালিয়ে গেছে। তারা মনে করেছিল, আইন শুধু কাগজে আইন। আইন কার্যকরী করার ক্ষমতা এই সরকারের নাই। তাই তারা উপেক্ষা করেছে আইনকে, কিন্তু আইন কার্যকরী করতে জনতা এগিয়ে যেতেই তারা বুঝতে পেরেছে "the law is the law" নয়—আইন জনতার মঙ্গল সাধনের জন্য এবং তা কার্যকরী করার দায়িত্বও জনতার। আগে মহাজনদের ওপর চাষীরা নির্ভরশীল ছিল। শস্যের ন্যায্য মূল্য তারা পেত না, বর্তমান সরকার "Association of people's stores" স্থাপন করে ন্যায্য মূল্যে শস্য ক্রয়ের ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। পুরাতন মহাজনী ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। ভূমি-সংস্কার আইন কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতির ওপর প্রযোজ্য নয়। এই আইন সবার ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। জমিতে ফসল ফলাতে হবে। যে ফসল দেশের মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয়, তাই জন্মাতে হবে জমিতে। বিদেশীর জন্য শস্য চাষ করা চলবে না। তাই চাল, তৈলবীজ, কার্পাসের চাষ বেশি করে করা হচ্ছে।

কিউবার আখ চাষ ছিল মার্কিনদের হাতে। সে সব জমি উদ্ধার করে চাষের ব্যবস্থা হয়েছে কিউবার জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে। পেট্রোলিয়ম খনিগুলো সরকার হাতে তুলে নিয়েছে। এতদিন পেট্রোল ছিল আমেরিকার হাতে। তারাই এর লভ্যাংশ নিয়ে যেত দেশে, কিউবার লোক পেত সামান্য মজুরী। কিউবার

প্রয়োজন পেট্রোল। তার জন্য পেট্রোলের আয়ত্বে আনতে সরকার কোন রকম দুর্বলতা প্রদর্শন করেনি। কিউবার আভ্যন্তরীন প্রয়োজন মেটাতেই পেট্রোলের দরকার। তাই বাইরে রপ্তানী বন্ধ করতে হয়েছে।

খনি সম্বন্ধে কিউবা যে আইন করেছে, তাতে খনি-মজুররা নানাভাবে উপকৃত হয়েছে। খনি-মজুরদের জোর-জুলুম করে কাজ করিয়ে নিত আগের মালিকরা (বেশির ভাগই আমেরিক্যান), কিন্তু নতুন আইনে কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করান অপরাধ। খনিজ পদার্থ বিদেশে রপ্তানী হয়, তাতে কিউবার অর্থ নৈতিক উন্নতি হচ্ছে। বিদেশীরা কিউবার একচেটিয়া খনিজ পদার্থ বিদেশে পাঠাত। সেই একচেটিয়া ব্যবসা একেবারে বন্ধ। Cuba is the symbol of nationality renewed and Fidel Castro the symbol of liberation. তা সম্ভব হয়েছে, কেন না জনসাধারণ যদি সশস্ত্র বিপ্লবের পথ গ্রহণ করে, তাকে রোধ করার সামর্থ্য কারও নেই। বিজয় গৌরব শঙ্কিত করেছে একচেটিয়া পুঁজিবাদীদের।

কিউবার মানুষ সুখে আছে। তা সহ্য করতে পারছে না সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও তার দালালরা। তারা কিউবার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, বলছে, The Cuban situation is very disturbing—সত্যই বড় বিরক্তিকর। মানুষের দারিদ্রকে মূলধন করে যারা টাকার পাহাড় রচনা করে, তাদের কাছে প্রগতিশীল কিউবা বিরক্তিকর ও অসহ্য তো হবেই।

কিন্তু কিউবাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না আমেরিকা। তাদের একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থহানি হয়েছে। তার জন্য দরকার মত অস্ত্র হাতে তুলে নিতে আমেরিকা কোন সময়ই ইতঃস্তত করবে না। মাঝে মাঝেই নামে-বেনামে হামলা করবে কিউবার ওপর।

ঃ আমেরিকার একখানা বিমান কিউবার আকাশে এসেছিল কিউবার সামরিক শক্তির হিসাব নিতে, গোয়েন্দাগিরি করতে।

বিমান ছিল বোমা ভর্তি। বোমা বিমানেই বিস্ফোরিত হওয়াতে বিমানখানি ভেঙে পড়েছিল। পাইলট মারা গিয়েছিল কিন্তু বিমানে যে সব দলিল পাওয়া গিয়েছিল, তা থেকে নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছিল, ফ্লোরিডা থেকে গোয়েন্দাগিরি করতে পাঠানো হয়েছিল এই বিমানটিকে।

ঃ কিউবাকে নানাভাবে আক্রমণ করার এও একটি উদাহরণ মাত্র।

য়্যালাইদা পড়তে পড়তে থামল।

চে তখন গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়েই সে-রাতের মত পড়া বন্ধ করে য়্যালাইদা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে য়্যালাইদাও ভাবছিল কিউবার ভবিষ্যত কি হতে পারে।

সকালবেলায় চে বের হল সঙ্গী খুঁজতে। যারা কিউবার অধিবাসী নয়, যাদের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার নাড়ীর টান রয়েছে, এমন কতকগুলো সঙ্গীর প্রয়োজন। এরা প্রাথমিক অবস্থায় লাতিন আমেরিকায় বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারবে। চে-র আহ্বানে এল কোকো, লোরো, জ্যাকুইন, পাচো, কাম্বা, এল-রুবিও।

সেইদিনই তারা মন্ত্রণা-সভায় বসল।

চে বলল, তোমরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ক্লান্ত।

কোকো বাধা দিয়ে বলল, আমরা ক্লান্ত নই কমরেড। কিউবার মুক্তিযুদ্ধ যদি আরও কিছুকাল ধরে চলত, তা হলে আমাদের অবশ্যই সংগ্রাম করতে হত। আমৃত্যু আমরা ক্লান্ত হতে পারি না।

কিউবায় আমাদের কাজ প্রায় সমাপ্ত। ধরতে গেলে কোন কাজ নেই। যোগ্য অধিনায়ক ফিদেল সুপথে পরিচালনা করতে সক্ষম। আমরা জানি, মার্কিন অসন্তোষের শিকার হল ফিদেল। তার নিপাত ঘটাতে মার্কিনের সব সম্পদ নিযুক্ত। গুয়েতেমালাকে

দখল করতে যে কৌশল অবলম্বন করেছিল মার্কিন রাষ্ট্রনেতারা, ঠিক সেই কৌশল অবলম্বন করেছে কিউবার ক্ষেত্রেও। আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্র যাতে কিউবা সংগ্রহ করতে না পারে, তার জন্য মার্কিন নৌ-বহর ক্যারেবিয়ান জলপথ আটক করে রেখেছে।

লোরো বলল, আমার মনে হয় প্রথম আক্রমণ হবে বিধিবদ্ধ গণতান্ত্রিক ভেনেজুয়েলাতে।

আশ্চর্য নয়। আমাদের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠা শক্ত। দ্বিতীয়ত সারা বিশ্বের দৃষ্টি আছে আমাদের ওপর। হঠাৎ কিছু করা সম্ভব নয় বলেই মনে করি। প্রতি বিপ্লবের ঘাঁটি করতেই ওরা বেশি সচেষ্ট হবে। ভেনেজুয়েলাকে আঘাত করলে লাতিন আমেরিকায় আমাদের সমর্থনকারী আর কোন রাষ্ট্র রইবে না, সেজন্য মার্কিন চেষ্টা হবে ভেনেজুয়েলাকে পর্যুদস্ত করা। এই আশঙ্কাই প্রবল। উপনিবেশবাদী সাম্রাজ্যপ্রসারী শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বলিভিয়া হবে উপযুক্ত ক্ষেত্র। ভেনেজুয়েলার মানুষ জানে, যদি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জয় হয়, তা হলে তাদের অসীম দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। যদি মার্কিন শক্তি অনুপ্রবেশ করতে না পারে, তাহলে তাদের ভবিষ্যত হবে সুখময়। কিউবাকে আক্রমণ করার আগে শত্রুকে চিন্তা করতে হবে। তারা জানে, কিউবার ষাট লক্ষ লোক মাত্র একটি লোক। কিউবায় দুটি মানুষ নেই, একটি মানুষের দেশ কিউবা। এই বিরাট 'এক'-এর বিরুদ্ধে লড়তে সাহস পাবে না শত্রুরা। বিশ্ববাসী মার্কিনের এই আক্রমণকে সহ্য করবে না। তারা নিন্দায় মুখর হবে, সর্বতোভাবে মার্কিনকে বাধা দেবে। আমাদের অস্ত্র নেই, বিমান-বহর দুর্বল, নৌ-বহর অতি সামান্য। আমাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হল গোরিলা যুদ্ধ। আমাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য গোরিলা যুদ্ধকে প্রধান অস্ত্র বলে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস আছে কিউবার যুবশক্তির ওপর। আমরা যা পেয়েছি, তা অপহরণ করার সাধ্য নেই কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির।

আমাদের পরবর্তী কার্যের কেন্দ্র বলিভিয়াতে হওয়াই উচিত মনে করি। বলিভিয়াতে আমাদের সাফল্যলাভ ঘটলে কিউবা, ভেনেজুয়েলা নিরাপদ হবে এবং অন্যান্য লাতিন আমেরিকার দেশ-গুলোও ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

কোকো উৎসাহ সহকারে বলল, আমরাও মনে করছি বলিভিয়াতেই আমাদের দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলা হোক। আমাদের অধিকাংশই লাতিন আমেরিকার অধিবাসী। আমরা চাই লাতিন আমেরিকার মুক্তি। আমরা সর্বতোভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত।

আমরা কিউবা থেকে ভেনেজুয়েলা যাব। সেখান থেকে বনপথে ব্রাজিলের মাঝ দিয়ে বলিভিয়া পৌঁছতে চাই। আমাদের পথঘাট নিরাপদ কিনা, তা স্থির করতে অগ্রগামী একটি দলকে পাঠাতে হবে। আরেক দল যাবে লা-পাজে। মনজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মনজে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রধান। তার মত, তার সমর্থন ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সে বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে আসতে হবে। স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সাহায্য পেলে আমাদের পক্ষে জন-সংযোগ যত সহজে গড়ে তোলা সম্ভব হবে, তা অন্যভাবে হওয়া সম্ভব নয়। আর নতুন করে কিছু করতে গেলে অবশ্যই সময় দরকার হবে। তাতে সময়, অর্থ ও শক্তি ক্ষয় হবে।

লোরো বলল, আমি ইভান ও কোকোকে নিয়ে পথঘাট জানতে যাব। আর জ্যাকুইনকে কয়েকজন কমরেডের সঙ্গে মনজের কাছে পাঠাও।

এল-রুবিও বলল, অস্ত্র রসদের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে মেজর চে। অবশ্য আমরা যাতে বেসরকারী ভাবে শান্তিপ্রিয় নাগরিকরূপে বলিভিয়াতে যেতে পারি, তার জন্য পাসপোর্ট-ভিসা যা দরকার, তার ব্যবস্থা করতে হবে তোমাকে। যত সত্বর তা করা যাবে ততই ভাল।

এসব বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি, তার ব্যবস্থাও হচ্ছে। তোমরা স্থির কর কতজন যাবে এবং কে কে যাবে। আমাদের এই মুক্তি-ফৌজের জনসংখ্যা স্থির হলে, তবেই স্থির করতে পারব কর্মপন্থা।

আগামী দু'তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে খবর দেব। আমরা কে কোথায় আছি, তা পরস্পরের অজানা। খোঁজ খবর করে আমরা সম্মিলিত হব। তারপর স্থির হবে কে কে যাবে বলিভিয়াতে।

অচিরেই প্রস্তুতি শেষ।

অগ্রগামী দল চলে গেছে পথঘাটের নিশানা তৈরী করতে। আরেক দল গেছে বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

ফিদেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে ডাক্তার চে গুয়েভারা। তাকে জানিয়ে এসেছে আগামী দিনের কার্যক্রম। সব শেষ করে চে প্রস্তুত হল বলিভিয়া যেতে।

আমি বলিভিয়া যাচ্ছি য়্যালাইদা।

জানি। আমিও প্রস্তুত তোমার সঙ্গে যেতে।

তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারব না। তোমাকে এখন এখানেই থাকতে হবে।

কেন? চিরকাল আমি তোমার পাশে পাশে থেকেছি। আজ কেন আমাকে পেছনে রেখে যাবে? আমি তাতে রাজি নই।

আমিও রাজি নই, কিন্তু আরও কিছু করার আছে তোমার। তুমি তো শুধু আমার স্ত্রী নও, তুমি আমার সন্তানদের জননী। সন্তানদের বড় করার গুরু-দায়িত্ব রয়েছে তোমার ওপর। আমার অবর্তমানে তুমি ওদের পিতা-মাতার অভাব পূরণ করে মানুষ করে তুলতে পারবে।

য়্যালাইদা পাথরের মত শক্ত হয়ে চে-র মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অতি সন্তর্পণে য়্যালাইদাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে আবেগের সঙ্গে তাকে চুম্বন করে বলল, জন্ম মৃত্যু তো কারও ইচ্ছার

দাস নয়। এই আছি, পরমুহূর্তে নেই—এই তো জীবন। তার জন্য এত চিন্তা করছ কেন? তুমি মায়ের কর্তব্য পালন করলে যথেষ্ট দেশ-সেবা করা হবে। আমি আমার পথে চলতে চাই। তুমি দুঃখিত হোয়ো না য়্যালাইদা। কঠিন কর্তব্য তোমাকে এখানে আটকে রাখবে, কঠিন কর্তব্য আমাকে টেনে নিয়ে যাবে কর্মক্ষেত্রে। এর জন্য মোটেই দুঃখিত বা চিন্তিত হোয়ো না।

য়্যালাইদা চে-র বুকে মাথা রেখে বলল, তোমার নির্দেশ কোন দিন অমান্য করিনি, আজও করব না।

আমার যাবার জন্য সব কিছু প্রস্তুত করে রেখ। আমি কাল সকালের বিমানে সদলে চলে যাব ভেনেজুয়েলাতে। হয়ত আর দেখা হবে না। তবে বিশেষ দুঃখ পেলেও সহ্য করার ক্ষমতা যেন তোমার থাকে।

পরদিন সকালে হাভানা বিমানক্ষেত্র থেকে চে-কে সকলে কোলে নিয়ে যাত্রীবাহী বিমান ছাড়ল ভেনেজুয়েলার পথে। যাত্রীদের নাম গোত্র অজ্ঞাত রইল বিমান কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে। তাদের এই যাত্রা শুধু লিপিবদ্ধ রইল কিউবার গোয়েন্দা বিভাগের খাতায়। সে খাতাও শুধুমাত্র সর্বোচ্চ নেতারাই দেখতে পায়। তার ওপরে লেখা ঃ 'TOP SECRET'.

বিমানক্ষেত্রে দুটি সন্তান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল য়্যালাইদা। যাবার সময় সন্তান ও স্ত্রীকে আদর করে ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা বেনামে বিমানে উঠল। শিশুরা ঠিক বুঝতে পারল না কি হয়ে গেল, কিন্তু তাদের জননীর গাল বেয়ে অসাড়ে নামল অশ্রুর বন্যা। রুমাল দিয়ে চোখ মুছে ধীরে ধীরে ফিরে এসে লাউনজে বসল য়্যালাইদা। সরকারী উচ্চপদস্থ একজন কর্মচারী এসে বলল, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য অপেক্ষা করছেন প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো তার চেম্বারে। আসুন।

বিমানে বসে চে ভাবছে তার অতীত।

ডাক্তারী পাশ করে চে ভেবেছিল জনগণকে সেবা করাই তার ব্রত। কিন্তু এর চেয়ে বড় ব্রত অপেক্ষা করছিল তার জন্য। চে বলিভিয়া, পেরু, ইকোয়াডোর ঘুরে এসে বুঝতে পেরেছিল আসল রোগ কোথায়। অনাহার আর শোষণকে রোধ করতে পারলেই সব রোগ নিরাময় হবে। হাতের ছুরি ছেড়ে তলোয়ার তুলে নেবার সময় হয়েছে।

ঘুরতে ঘুরতে চে এসে থামল গুয়েতেমালায়।

তার কর্মক্ষেত্র বোধহয় এখানেই। এখানেই অনাহারী মানুষরা যন বেশি ধুঁকছে। একচেটিয়া মুনাফাবাজ মার্কিন ধনিকতন্ত্র দেশীয় শাসককে হাতের মুঠোয় রেখে অবাধ শোষণ চালাচ্ছে। এই অবস্থা থেকে মানুষকে বাঁচানই হল তার ডাক্তারী শিক্ষার প্রথম কাজ। সেদিনের সেই করুণ দৃশ্য বর্ণনা করতে চে বলেছিল: I came into close contact with proverty, hunger and disease. সেইদিন থেকেই চে চিন্তা করেছে, আমি কি হব।

ডাক্তার, বিপ্লবী ডাক্তার, অথবা বিপ্লবী। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন ভেবেছে চে। ভাবতে ভাবতে স্থির করেছে, আমি বিপ্লবী হব। বিপ্লব বিনা অবহেলিত অত্যাচারিত মানুষদের মুক্তি নেই।

গুয়েতেমালায় এসে চে পরিচিত হল প্রেসিডেন্ট জ্যাকব আরবেনজের সঙ্গে। চে-র মত আরবেনজ ভাবছিল, কি করে জনতার মুক্তি সম্ভব। একচেটিয়া পুঁজিকে বাজেয়াপ্ত না করলে জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা কমবার কোন উপায় নেই। আরবেনজ মার্কিন মূলধনী United Fruit Company-র সব সম্পদ জাতীয়করণ করল। আরবেনজ "dicided to press forward with agrarian reform".

ইয়াঙ্কী স্বার্থ বিপন্ন। একেই মার্কিন মূলধন বাজেয়াপ্ত করেছে আরবেনজ। তার ওপর আবার ভূমি-সংস্কার! সক্রিয় হল 'সিয়া'।

চে তখন গুয়েতেমালায়।

থার্ড এভিনিউতে বাস করত চে।

এখানে পরিচয় হয়েছিল একটি তরুণীর সঙ্গে। এই তরুণী বিপ্লবীদলের একজন সদস্য ছিল পেরুতে। প্রতিক্রিয়াশীল পেরু সরকার যখন বিপ্লবীদের ওপর অত্যাচার শুরু করল, তখন এই তরুণী পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল গুয়েতেমালায়।

তরুণী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও সক্রিয় বিপ্লবী। তরুণীর চরিত্রের সঙ্গে ভালভাবে পরিচয় হয়েছিল চে-র। তরুণী ফিদেল কাস্ত্রো সম্বন্ধে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। তার কাছেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাস্ত্রোর কর্মপদ্ধতি জেনে নিয়েছিল চে।

তরুণী একদিন নিয়ে গেল তাকে মোনকাডা দুর্গে। এখানে বিপ্লবীরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে এসে নতুন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হল চে। আরবেনজের কার্যাবলী অনুধাবন করে চে তার প্রতি আকৃষ্ট হল। এই তরুণীই প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল কিউবার বিপ্লবীদের সঙ্গে।

আরবেনজ নিশ্চিন্ত মনে তার কাজে এগোতে পারল না। 'সিয়া' সক্রিয় হল। হণ্ডুরাস ও নিকারাগুয়া থেকে মার্কিন সাহায্য-পুষ্ঠ বেনামী মার্কিন ফৌজ লুঠেরার মত প্রবেশ করল গুয়েতেমালায়। বিশ্বাসঘাতকতা করল আরমাস।

চে আরবেনজকে বলেছিল, জন-সংগঠন গড়ে তুলে আরমাসকে বাধা দেওয়া উচিত।

আরবেনজ বিশ্বাস করতে পারেনি জন-সংগঠনের ওপর।

চে বলল, দেশবাসী প্রস্তুত। মরণপণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ওরা। তুমি শুধু তাদের নেতৃত্ব দান কর। জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দাও। তাতেই আরমাসকে বিতাড়িত করতে পারবে তারা।

আরবেনজ শঙ্কাভরে বলল, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। জনতার হাতে অস্ত্র তুলে দিলে বিপরীত ফল ফলতে পারে। তার চেয়ে··· ।

তার চেয়ে আত্মসমর্পণ করে একচেটিয়া মুনাফা-শিকারীদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চাও ?

আমার চেয়ে যোগ্য হল কর্ণেল ডিয়াজ। তার হাতে তুলে দিতে চাই দেশের দায়িত্ব।

আরবেনজ কর্ণেল ডিয়াজের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে আর্জেন্টিনার দূতাবাসে আশ্রয় নিল। চে-ও আশ্রয় নিল সেখানে। কিন্তু তার জন্মভূমির দূতাবাসে তাকে স্থান দেওয়া হল বিশেষ অনিচ্ছার সঙ্গে। যেহেতু চে আর্জেন্টিনার লোক, ডাক্তার এবং ভেনেজুয়েলার সহকারী হাসপাতালে কাজ করে, তাই তাকে সামরিক আশ্রয় দিল দূতাবাস, কিন্তু সন্দেহ ছিল তার ওপর।

ডিয়াজ কিন্তু শাসন ক্ষমতায় থাকতে পারল না। মার্কিনপন্থী শক্তমানুষ পিউরিফয়কে মনে করেছিল তার বন্ধু। পিউরিফয় ঘোরতর কম্যুনিষ্ট বিরোধী এবং আরমাসকে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করছিল। কিন্তু কর্ণেল ডিয়াজকে মোটেই পছন্দ করত না সে। তার ইচ্ছা ছিল কর্ণেল এলফেগো মনজন ক্ষমতালাভ করুক। কর্ণেল মনজনকে ক্ষমতায় বসিয়ে কর্ণেল ডিয়াজকে জোর করে বেয়নেট ধরে টানতে টানতে বের করে দিল পিউরিফয়।

আরমাস শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার পেল 'সিয়ার' কাছে। কারণ ডালেসের দয়া। United Fruit Company-র বড় অংশীদার হসটার ডালেস। তারই ভাই এলেন ডালেস হল 'সিয়ার' অধিকর্তা। স্বরাষ্ট্র সচিব ফসটার ডালেস আর সিয়ার অধিনায়ক এলেন ডালেস উভয়ে একযোগে মার্কিনের সব শক্তি নিয়োগ করে আরবেনজকে ক্ষমতাচ্যুত করে কায়েমী স্বার্থকে বহাল করল।

আরমাস খুব পাকা লোক। যাদের মনে করল কায়েমী স্বার্থের পরিপন্থী, তাদের বেছে বেছে গ্রেপ্তার করে জেলখানা ভর্তি করে ফেলল। এই সঙ্গে গ্রেপ্তার হল সেই তরুণী। বিচার-ব্যবস্থা নেই, বিনা বিচারে জেলখানায় পচতে থাকে বন্দীরা। নিরুপায় বন্দীরা অনশন করল। প্রথমে সরকার বিশেষ গ্রাহ্য করেনি এই অনশনকে। জেলখানায় বন্দীরা অনাহারে মরবে, এ তো ভাল কথা নয়। বিশেষ করে নিজেদের সভ্য বলে পরিচয় দিতে হলে কিছুটা সভ্যবিধি মেনে চলা উচিত। তাই অনশনকারী বন্দীদের মুক্তি দিল আরমাস। সেই তরুণীও মুক্তি পেল বন্দীশালা থেকে। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসেও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেনি সেই তরুণী। তার ওপর কড়া নজর রেখেছিল পুলিশ। একদিন সুযোগ বুঝে তরুণী নদী সাঁতরে গুয়েতেমালা পরিত্যাগ করে মেক্‌সিকোতে হাজির হল।

মেক্‌সিকো তখন বিপ্লবীদের একমাত্র আশ্রয় স্থল। তরুণী আশ্রয় নিল এই গোপন ঘাঁটিতে।

চে শুনতে পেল তরুণীর পলায়ন-কাহিনী। আর্জেনটিনার দূতাবাসে নজরবন্দী থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল চে। সে-ও খুঁজছিল নিরাপদ আশ্রয়। তরুণীর পলায়ন-সংবাদ শুনে চে-ও স্থির করল, সে-ও পালিয়ে যাবে মেক্‌সিকোতে।

গোপনে গুয়েতেমালা পরিত্যাগ করে চে চলল মেক্‌সিকোর পথে। তার মতই গোপন পথে পালাচ্ছিল আরেকজন বিপ্লবী। সে যাচ্ছিল মেক্‌সিকোতে আশ্রয়ের আশায়। পথেই পরিচয় দুজনের।

একটা ঘর ভাড়া করে দুজনে সাময়িক আশ্রয় তৈরী করে নিল।

নতুন বন্ধু কাসারি বলল, বন্ধু, তুমি ডাক্তার। একটা ক্লিনিক খুলে দাও। তাতে আমাদের পেটের চিন্তা থাকবে না।

চে হেসে বলল, যখনই আমি সাইনবোর্ড টাঙাব ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা, তখনই নজর পড়বে সিয়ার দালালদের। আমরা নিরাপদে বাস করতে পারব না।

একটা কিছু উপায় স্থির করতে হবে। নইলে পেটও চলবে না, ঘর ভাড়াও দিতে পারব না।

আছে উপায়। আমাদের যেতে হবে গ্রামে গ্রামে।

তাতে লাভ ?

নিশ্চয় লাভ হবে। আমাদের একটা ক্যামেরা আছে। গ্রামে গিয়ে ছবি তুললে কিছু উপার্জন হবেই। তাতেই আমাদের দিন চলে যাবে।

কিন্তু ক্যামেরাটা যে ভাঙা !

তাতে কি, ম্যানেজ করতেই হবে।

সেইদিন থেকে দুজনে বেরিয়ে পড়ল ছবি তুলতে। চে মাঝে মাঝে যেতে পারত না। হাঁপানীর টানে বিছানায় কাত হয়েই থাকতে হত কয়েকদিন। কাসারি একাই বের হত উপার্জনের ধান্দায়।

তাদের এই আস্তানায় মাঝে মাঝে আসত সেই তরুণী। তার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করত দুজনে। অসুস্থ চে-কে সেবাও করত। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল তাদের।

যখন সুস্থ হত, তখন বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করত চে। এই ভবঘুরে জীবনে পরিচয় হয়েছিল ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে। এই পরিচয় লাতিন আমেরিকার ভাগ্যাকাশে নতুন ইঙ্গিত দিয়েছিল। কথায় ও কাজে চে-র বুদ্ধিমত্তা ও বলিষ্ঠতা লক্ষ্য করেছিল ফিদেল। তাদের পরিচয় পরিণত হল গভীর মিত্রতায়।

ধীরে ধীরে উভয়ের চিন্তা ও কার্যক্ষেত্র একপথ ধরল। ফিদেল তাকে সঙ্গী করে নিয়েই এগিয়েছিল কিউবার মুক্তিযুদ্ধে।

নিরাপদ নয় মেক্সিকোর এই আস্তানা। মেক্সিকোর গোয়েন্দারা যেমন উৎপাত করত, তেমনি 'সিয়া'র দালালরা পেছনে লেগে থাকত সব সময়। কিন্তু তাদের এগোতে হবে কিউবাকে মুক্ত করতে। তার জন্য ট্রেনিং নিত তারা। তাদের শিক্ষিত করে তুলল জেনারেল বেয়ো।

চে-কে পুলিশের হাতেও পড়তে হয়েছিল কয়েকবার। হাঁপানীতে মাঝে মাঝেই শয্যাগত হত চে। তখন সেই তরুণী এসে সেবা করত তাকে।

তরুণী বলত, তোমার একজন সঙ্গী না হলে বিপ্লবকে সার্থক করতে পারবে না ডাক্তার। তুমি যে ভাবে অসুস্থ হও মাঝে মাঝে, তোমাকে সেবা করার জন্যও একজন সঙ্গী দরকার।

আমার সঙ্গীর তো অভাব নেই।

কিন্তু দরদ না থাকলে কে তোমার দায়িত্ব নিয়ে সেবা করবে?

এমন একজন কোথায় পাব?

তাই তো।

চে হাসতে হাসতে বলল, তোমাকেই বলতে ইচ্ছে ছিল কিন্তু আমার এই রুগ্ন দেহটা নিয়ে তোমাকে সারা জীবন কষ্ট পেতে হবে। তাই সাহস করে তোমাকে কিছু বলতে পারিনি।

আমিও অনেক দিন ভেবেছি ডাক্তার, তোমাকে একা থাকতে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আমাদের দুজনেরই তো ছন্নছাড়া জীবন। তাই সাহস করে তোমাকে আমার কাছে ডেকে নিতে পারিনি।

পারবে তুমি আমার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবন জড়িয়ে নিতে?

পারব, পারব ডাক্তার।

সত্যিই পেরেছিল এই তরুণী।

সেদিনও তাকে মেক্সিকোতে রেখে চে গুয়েভারাকে যেতে হয়েছিল কিউবার মুক্তিযুদ্ধে। পেছনে রয়ে গেল তার স্ত্রী সেই তরুণী হিলদা। স্ত্রী তখন গর্ভবতী। ভাগ্যের ওপর তাকে ছেড়ে দিয়ে চে চলে গিয়েছিল কিউবাতে। সেটা হল ছাপান্ন সাল। সেদিনও তার স্ত্রী রুমাল দিয়ে চোখ মুছে রুগ্ন স্বামীকে যেতে দিয়েছিল বৃহত্তর যজ্ঞে আহুতি দিতে।

আজও য়্যালাইদাকে পেছনে রেখে আসতে হয়েছে। আজও হিলদার মতই য়্যালাইদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছেছে।

চে গুয়েভারা ভাবছিল সেই অতীতের দিনগুলো।

সিয়েরার জঙ্গলে যখন সে মুক্তিযুদ্ধের পরিকল্পনা করছিল, তখন সংবাদ পৌছল তার স্ত্রী প্রথম সন্তান প্রসব করেছে মেক্সিকোতে। মৃদুহাসি একবার মাত্র ফুটে উঠেছিল চে-র ঠোঁটে, তারপরই নিজের কাজে ডুবে গিয়েছিল।

কিউবাকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছে চে। কোন সময় কোন যুক্তিকে গ্রাহ্য না করে গুরুতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, আহত হয়েছে। তবুও সহকর্মীদের সঙ্গে ফ্রন্ট লাইনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। কখনও ত্বরিতগতিতে পালিয়েছে, কখনও অতর্কিতে আক্রমণ করেছে ক্লান্তিহীন এই বীর যোদ্ধা।

সিয়েরা থেকে এগিয়ে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করেছে।

ফিদেল সব সময় তার কাজে খুশী হয়েছে। কিন্তু সব সময় চিন্তা করেছে যে রকম দুঃসাহসিক কাজে এগিয়ে চলেছে চে গুয়েভারা, তাতে তার জীবন বিপন্ন হতে পারে যে কোন সময়। তাকে সতর্ক করেছে, তাকে বিশ্রাম করতে বলেছে, কিন্তু কোন কথাই শোনেনি চে গুয়েভারা। সে যেন উন্মাদ। উন্মাদের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে শত্রুর ওপর। আবার বিপদ দেখলে আত্মগোপনও করেছে।

এস-কেমব্রে দখল করে মুক্তিফৌজকে নিরাপদ করেছে চে।

ফিদেল উচ্চ প্রশংসা করেছে তাকে। বলেছে, আমি তোমাকে চিকিৎসক মনে করেছিলাম। ভেবেছিলাম, মুক্তিফৌজের সঙ্গে একজন চিকিৎসক থাকলে আহত মুক্তিযোদ্ধারা মানবোচিত সেবা পাবে। এখন দেখছি তুমি তার চেয়ে অনেক বড়। বন্ধু, তুমি দুঃসাহসী কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে যেভাবে তুমি শত্রুদের পর্যুদস্ত করেছ, তা বহু অভিজ্ঞ সামরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেও হয়ত সম্ভব ছিল না। নির্ভুল তোমার আক্রমণ এবং অসাধারণ তোমার আত্মরক্ষার কৌশল। তোমার কাছে কিউবার যে ঋণ, তা কোনদিনই শোধ করা সম্ভব নয়।

এই ঘোরতর যুদ্ধের মাঝে নতুন জীবন আরম্ভ হল গুয়েভারার।

লা-ভিলায় শত্রুকে আক্রমণ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। এই যুদ্ধে তার পাশে এসে দাঁড়াল আরেকটি নারী। মানডকা দুর্গ আক্রমণের সময় দেখা হয়েছিল এই নারীর সঙ্গে। চে-র পাশে দাঁড়িয়ে লা-ভিলা অভিযানে এই নারী যুদ্ধ করেছে।

হিলদা তখন অনেক দূরে। তার শূন্যতা পূর্ণ করল য়্যালাইদা। বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে হিলদা। তার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে সত্যকার কর্মসঙ্গিনী য়্যালাইদাকে বিয়ে করল চে।

কিউবার জীবনে য়্যালাইদা হল তার সব সময়ের সঙ্গী।

যুদ্ধ শেষে বিজয়ীর মুকুট মাথায় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা প্রবেশ করল হাভানায়। সেদিন য়্যালাইদার হাত ধরে লা-কাবানা দুর্গের দায়িত্ব তুলে নিল চে গুয়েভারা। দেশের লোককে ডেকে বলল, কৃষক বন্ধুরাই কিউবার মুক্তি এনেছে। তারাই হল কিউবার নমস্য জন। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের গড়তে হবে দেশকে। আজ মনুষ্যত্বের সেবা করতে হবে আমাদের।

হাঁপানীর টানে ক্লান্ত হয়ে পড়ে চে।

চে ছুটে যায় বিশ্রাম নিতে তার পল্লী-ভবনে। পাশে থাকে তার স্ত্রী য়্যালাইদা।

সেই য়্যালাইদাকে পেছনে রেখে চে আবার ছুটেছে বিশ্বমুক্তির নেশায়। সেদিন হিলদা চোখ মুছেছে, আজ য়্যালাইদা চোখ মুছছে।

কিন্তু চে-র চোখে জল নেই। বুকভাঙা একটা নিঃশ্বাস শুধু বেরিয়ে এল।

ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা অতীতকে ভাবছে।

তাইতো। ফিদেল তাকে দিয়েছে সম্মানীয় স্থান। বৈপ্লবিক ভূমি-বণ্টন-ব্যবস্থা করেছে চে। কিউবার টাকায় নিজের নাম লিখে দিয়েছে চে অর্থমন্ত্রীরূপে। মানুষ যতটা চায়, তার চেয়েও বেশি সে পেয়েছে। তবুও পরিতৃপ্ত নয়।

এত পেয়েও তো চে খুশী নয়। নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন-ধ্বনি বারবার তার কানে এসে বাজছে। চে ছুটে বেড়িয়েছে সারা দুনিয়াতে। দেখেছে দেশ বিদেশের মানুষের অবমানিত জীবন। ছুটে গেছে এশিয়াতে, ছুটে গেছে আফ্রিকাতে, ছুটে গেছে ইউরোপে। চুক্তি করেছে সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে। ফিদেলের দক্ষিণ হস্ত সে। তবুও খুশী নয় চে। মানসিক আলস্য এসেছে। তবুও ছুটে গেছে তার পল্লী-ভবনে। ডেকে নিয়েছে গ্রামবাসীদের তার পাশে। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে নিজেকে। অবসর সময় কাটায় মার্কস-লেলিনের লেখা পড়ে, তার ভাষ্য লেখে, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে। আবার থামতে হয় তাকে। দুরন্ত হাঁপানী তাকে শয্যাশায়ী করে। য়্যালাইদা তার সেবাপরায়ণ হাত দুটো এগিয়ে দেয় তার দিকে। য়্যালাইদাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে গভীর আবেগে তার সারা দেহে হাত বুলিয়ে দেয়, আদর করে।

চুরুট ধরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে চে। মন তার উড়ে চলে সেই দূর দেশে, যেখানে মানুষের পুঞ্জীভূত বেদনা তাকে হাতছানি দেয়। দিবারাত্র কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও ভুলতে পারে না চাষী-শ্রমিকদের। এত কাজের মধ্যেই ছুটে গেছে চাষীদের পাশে। তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ফসল ঘরে তুলতে সাহায্য করেছে।

তার এত বেশি কর্মক্ষমতা ও দরদভরা হৃদয় কি করে বিকশিত হল, তা চিন্তা করেছে তার সহচররা। সবাই বলেছে হিলদা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে মুক্তিযুদ্ধে, আর য়্যালাইদা তাকে এত বড় করেছে প্রেম ও মমতা দিয়ে। তার প্রেরণা এসেছে তাদের কাছ থেকে।

বিমানে বসে ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছে চে। মনে পড়ছে আরও কত কথা।

যে ব্যক্তির কর্মময় জীবন কিউবার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে সেই ব্যক্তিকে

চেনে ক'জন? যারা তাকে চেনে ও জানে, তাদের সে নিষেধ করেছে তার সম্বন্ধে প্রচার-ব্যবস্থা মুখর করতে। বড়ই লাজুক, বড়ই প্রচারবিমুখ। তার কর্মময় জীবনের আলেখ্যও দেখাতে সে রাজি নয়।

রাতের পর রাত জেগে ভেবেছে কি করে কিউবার উন্নতিসাধন সম্ভব। অর্থনীতি, রাজনীতি নিয়ে চিন্তা করেছে দিনের পর দিন। আবার যখনই খবর পেয়েছে মার্কিন দালালরা সিয়ার সহযোগে কিউবার উপকূলে প্রতি-বিপ্লবের ঘাঁটি করেছে, তখনই সে ছুটে গেছে হাতিয়ার নিয়ে। তার রাইফেল গর্জে উঠেছে শত্রুকে নিপাত করতে।

আবার ছুটতে হয়েছে মার্কিন ডলারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে। লাতিন আমেরিকার 'উন্নতির জন্য সৌখ্য' (Alliance for progress) এই ধোঁকাবাজির ফাঁদে যাতে কেউ পা না দেয়, তার জন্য সে প্রচার চালিয়েছে উরুগুয়েতে ও অন্যান্য লাতিন আমেরিক্যান দেশে। সবাই বিমুগ্ধ হয়ে শুনেছে তার বক্তব্য। একমত না হলেও তার যুক্তি খণ্ডন করতে সাহস পায়নি অথবা খণ্ডন করার সামর্থ্যও ছিল না অনেকেরই।

চে-কে দেখতে ছুটোছুটি। কিন্তু কোথায় চে! এতো অতি সামান্য পোষাক পরিহিত অতি সামান্য একটি লোক। ঠোঁটে চুরুট, চোখ দীপ্তিময়। চুরুট আর বাঁকা টুপি দেখেই তাকে চিনেছে অনেকেই। নইলে কোন বিশেষত্ব নেই চে-র সর্বাঙ্গে। ঠিক এই বেশেই চে হাজির হয়েছে জাতিসঙ্ঘে মানুষের ইতিহাস বিবৃত করতে, আর মার্কিন পুঁজিবাদী নীতির সর্বনাশা পরিণতি বিবৃত করতে।

না, ভাল লাগেনি এই জীবন। সংসার, স্ত্রী-পুত্র কেউ তাকে আটকে রাখতে পারেনি। সাফল্য তাকে গর্বিত করেনি। কর্মে অনীহা জন্মায়নি। চে আবার ঘরের মায়া ছেড়ে ছুটে বেরিয়েছে।

চে গুয়েভারা অক্লান্তভাবে পড়েছে। অবসর সময় যাপন

করেছে মার্কস ও লেলিনের কেতাব পাঠ করে, পাঠ করেছে বিশ্বের তাবৎ গ্রন্থ যা তার হাতের কাছে সে পেয়েছে। বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, গণিত, অর্থশাস্ত্র, সমাজনীতি, ইতিহাস—কিছুই বাদ দেয়নি সে। চে বুঝেছিল, The world must not only be interpreted, it must be transformed. তাই গোঁড়া মার্কসবাদী ছিল না চে, মার্কসীয় চিন্তাধারাকে সময়োপযোগী করে তুলতেও চেষ্টা করেছে সব সময়। চে নিজেই বলেছে, We are simply adjusting ourselves to the predictions of the scientist Marx as we travel this road of rabellion, struggling against the old structure of power, supporting ourselves in the people for destruction of this structure—আমরা মার্কস প্রদর্শিত পথেই চলেছি কিন্তু বিপ্লবের ধারাকে আমরা নিজের প্রয়োজন মতই পরিচালনা করেছি।

চে ভোলেনি কাউকেই।

বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ করেছে তার কর্মক্লান্ত দিনের শেষে। পিতাকে জানিয়েছে তার মনের ইচ্ছা। সুদীর্ঘ দশ বছর পর চে পত্র লিখেছে তার বাবাকে। দশ বছর আগে মনের অভিলাষ জানালেও সে অভিলাষ পূর্ণ না হওয়া অবধি পরের পত্র লেখেনি। পিতাকে কত বেশি ভালবাসত তা জানা গেছে তার সেই পত্রে, "I love you so dearly, but I know not how to express this love". তারপর চিরবিদায়ের বাণী শুনিয়েছে চে। কোথাও তার দুর্বলতা নেই, মমত্ব ও ভালবাসা ফুটে উঠেছে তার পত্রের প্রতিটি শব্দে।

তবুও তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারেনি তার এই মমত্ববোধ। সামান্যের চেয়ে বৃহতের দিকে তার লক্ষ্য। আরও মহান কর্তব্য ও মমত্ববোধ তাকে টেনে নিয়ে চলেছে আজ।

চিন্তায় বাধা পড়ল।

বিমান পৌঁছে গেছে ভেনেজুয়েলাতে।

মন স্থির করতে পারেনি চে তখনও। মাটিতে পা দিয়ে স্থির করল, না, আরও দেরী আছে। সংবাদ পাঠাল তার সহচরদের কাছে। তারপর অপর বিমানে চেপে চে গুয়েভারা সেইদিনই পরিত্যাগ করল ভেনেজুয়েলার ভূমি। কিন্তু কোথায় গেল! কোন্ অজ্ঞাত স্থানে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল, তা কেউ-ই জানতে পারল না।

চে আত্মগোপন করেনি।

ফিদেলকে পত্র দিয়েছে কখনও আলজেরিয়া থেকে, কখনও ভিয়েতনাম থেকে, কখনও লাওস থেকে। আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীনতাকামী মানুষের পাশে দেখা গেছে চে গুয়েভারাকে। অদম্য মনোবল নিয়ে চে ছুটেছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

মার্কিন গোয়েন্দাবাহিনী তৎপর হয়েছে চে গুয়েভারার সংবাদ সংগ্রহ করতে। তাদের শত শত কেন্দ্রে ব্যস্ততা। কেউ বলেছে এই দেখলাম চে-কে, না, এ তো চে নয়। তা হলে সে গেল কোথায়!

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসনও ব্যস্ত। জনসনও জানে চে হল আগ্নেয়গিরি। কোন্ সময় কোথায় সে অগ্নি উৎগীরণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করবে, তার কোন স্থিরতা নেই। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে, প্রয়োজনে গোপনে হত্যা করতে হবে জহ্লাদকে দিয়ে। কিন্তু ব্যর্থ তাদের চেষ্টা। এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ খুঁজে হয়রান হয়েছে 'সিয়া' আর মার্কিন নৌ-দপ্তরের গোয়েন্দারা।

সবার আতঙ্ক আবার গুয়েতেমালায় ফিরে গেছে চে। United Fruit Company হাজার হাজার সশস্ত্র পেয়াদা এনেছে স্বদেশ থেকে চে-র মোকাবিলা করতে। যে সব সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও শোষক লাতিন আমেরিকায় জনপীড়ন করছে, তারা চিন্তিত। যে কোন সময় যে কোন স্থানে চে আবির্ভূত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ

করতে পারে। কিন্তু আতঙ্কই তাদের পাগল করেছে। চে-কে খুঁজে পায়নি কেউ-ই।

অজ্ঞাত স্থানে বসে রয়েছে চে।

প্রতীক্ষা করছে বুঝি সুযোগের।

না। চে সারা বিশ্বপরিক্রমা করে ফিরে এসেছে লাতিন আমেরিকায় সবার অলক্ষ্যে।

পুলিশ ও ফৌজের ছুটোছুটি শুরু হয়েছে। সিয়ার এজেন্টরা সংবাদ পেয়েছে, চে গুয়েভারাকে দেখা গেছে বলিভিয়ার কোন জঙ্গলে। সংবাদ পৌঁছেছে প্রেসিডেন্ট বারিয়নতোসের কাছে। মাথায় হাত দিয়ে বসেছে বারিয়নতোস। নানা ছল চাতুরী করে পাজকে ক্ষমতাচ্যুত করে গদীতে বসেছে বারিয়নতোস। মার্কিন উপদেষ্টার দয়াতে গদীকে শক্ত করার প্রভূত চেষ্টাও করেছে কিন্তু একি! কিউবা থেকে সোজা পথে কলম্বিয়া, ইকোয়াডোর না গিয়ে বাঁকা পথে চে কেন এল বলিভিয়াতে!

সামরিক বাহিনী সংবাদ সরবরাহ করেছে, বলিভিয়ার জঙ্গলে গোরিলারা তৎপর হয়েছে, তাদের নেতা ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা।

বিনিদ্র রজনী যাপন করছে বারিয়নতোস। ঢালাও আদেশ দিয়েছে, খুঁজে বের কর সব কম্যুনিষ্টদের। আটক কর তাদের। জীবিত অথবা মৃত চে-কে গ্রেপ্তার কর। পুরস্কার লক্ষ পেসোস।

গোপনে সলা-পরামর্শ হল স্থানীয় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে। তারা বলল, আমাদের সঙ্গে এই গোরিলা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা সশস্ত্র বিদ্রোহকে মুক্তিযুদ্ধ মনে করি না। কিউবায় গোরিলারা সাফল্য লাভ করেছে। সেখান থেকে তাদের গোরিলা যুদ্ধের কৌশল রপ্তানী করেছে শান্তিপূর্ণ বিদেশী রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা

নষ্ট করতে। আমরা সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা হিংসায় বিশ্বাস করি না।

কিছুটা নিশ্চিন্ত হল বারিয়নতোস।

'কিন্তু' থেকে গেল পেছনে। বাহান্ন সালে জনমুক্তির শপথ নিয়ে পাজ বসেছিল গদীতে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল পাজ, কিন্তু জনতার যাতে মুক্তি হয়, সে দিকে নজর দেয়নি। সেদিন রাজনৈতিক চেতনা এত প্রখর ছিল না বলিভিয়ার মানুষের মনে। পাজের অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে বারিয়নতোস গদী দখল করলেও আসল সমস্যা একটুও সমাধান করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই তার মনে সব সময় শঙ্কা। মার্কিন সহায়তায় গদী আঁকড়ে ধরার চেষ্টা তার বেশি। তার প্রগতিবাদী মুখোস অনেক আগেই খুলে গেছে। এমন তার যে চেহারা লোকে দেখেছে তাতে মার্কিন দালালের নোংরা ছবিই ফুটে উঠেছে। নিশ্চয়ই এই ছবি দেখতে চায়নি তার দেশের লোক।

বারিয়নতোস শঙ্কিত ও মানসিক ভারসাম্যহারা।

সংবাদ চে গুয়েভারার কাছেও পৌছল। বারিয়নতোস যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাও জানতে পারল। রাজধানীতে যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থা পাকা করেই রেখেছিল চে। তার সংবাদ সরবরাহ ও যোগাযোগ রক্ষা করতে যারা সক্রিয়, তাদের মধ্যে প্যাপীও এবং গনজালেস অন্যতম।

ভাগ্যতাড়িত প্যাপীও এবং গনজালেস যেদিন শুনতে পেল মুক্তি-যোদ্ধারা সক্রিয় হয়েছে বলিভিয়ার দুর্গম অঞ্চলে, তখন তারাও স্থির করল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষার চেয়ে দাবী আদায় করা হল বড় কাজ। আর দাবী আদায়ের জন্য মেজর চে গুয়েভারার পথই একমাত্র পথ। তারা অনেক আলোচনা করে স্থির করল তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি। অবশেষে অনেক কষ্টে সাক্ষাত পেল চে গুয়েভারার এবং তার সহকর্মীরূপে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বলিভিয়ার সর্বত্র এক কথা। সবাইয়ের মুখে চে গুয়েভারার

বীরত্বের কাহিনী। কিন্তু কেউ চোখে দেখেনি চে-কে। সিয়ার গোয়েন্দাদের সংগৃহীত তথ্য থেকেই বারিয়েনতোস স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে। তারাও দেখেনি সাক্ষাতভাবে।

সিয়ার গুপ্তচর, বারিয়েনতোসের গুপ্তচর সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে বনে জঙ্গলে। সবাই ব্যস্ত সত্যই চে গুয়েভারার নির্দেশে বলিভিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা কাজ করছে কিনা জানতে। সংবাদ আসছে পরস্পর বিরোধী। হাইতি, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, ভেনেজুয়েলা, ইকোয়াডোর, গুয়েতেমালায় যারা রক্তপাত ঘটাচ্ছে দেশের মুক্তির জন্য, তারাও বলছে চে তাদের পরিচালনা করছে। কোনটা সত্যি!

কিন্তু চে কোথায়?

বারিয়েনতোস জানে চে-র কৃতিত্ব। ভয় পায় তার সংগঠনকে, কর্ম ক্ষমতাকে। আরও জানে কিউবার মুক্তিযুদ্ধে চে শুধু একজন সৈনিক ছিল না, স্বাধীন কিউবার অর্থনীতি, সমাজনীতি ও ভূমি সংস্কারে চে-র প্রত্যক্ষ দান রয়েছে। কূটনীতির আড়ালে চে যদি বলিভিয়াতে আসে, তা হলে তাকে সাদর অভ্যর্থনা করাই রাষ্ট্রের ধর্ম। কিন্তু চে তো কিউবার প্রতিনিধি হয়ে আসেনি বলিভিয়াতে। কিউবার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেই সে এসেছে। বর্তমানে যদি চে এসে থাকে বলিভিয়াতে, তার জন্য তাকে অনুপ্রবেশকারী ভিন্ন কিছু মনে করার নেই। তাকে গ্রেপ্তার করাই হল বলিভিয়ার বর্তমানে প্রধান কাজ। কিন্তু কোথায় চে! পরস্পর বিরোধী সংবাদগুলো যাচাই করছে সিয়ার গুপ্তচররা। সব সংবাদ যাচাই করে তারা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে, চে বলিভিয়াতেই আছে। আছে কোন গোপন স্থানে, কোন পাহাড়ে অথবা বনে।

নতুন জীবনে পদক্ষেপ করেছে চে গুয়েভারা। ছদ্মবেশে কোচ-বামবা থেকে গোপন পথে হাজির হল সদলে। খুবই সাবধানে

আসতে হয়েছে তাদের। স্থানীয় জমিদাররা মনে করেছে কোকেনের চোরা কারবারী এই আগন্তুকরা। বলিভিয়ার সাম্যবাদীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেই কাজ এগিয়েছে চে, কিন্তু বলিভিয়ার সাম্যবাদীরা তখনও একমত নয়। সশস্ত্র বিপ্লবের কেউ স্বপক্ষে, কেউ বিপক্ষে।

চে-কে চিনতে পেরেছিল বিগোটেস।

খবর পেয়ে চে-র সঙ্গে দেখা করতে এল। চে-ও আশা করছিল বলিভিয়ার কম্যুনিষ্টরা যোগাযোগ করবে।

আমি তোমাদের মনের কথা জানতে চাই বিগোটেস। তোমরা সক্রিয়ভাবে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক কিনা, তা বললেই আমি আমার কর্মধারা ঠিক করতে পারি।

বিগোটেস বলল, ডাক্তার চে, তুমি তো জানো আমরা চাই একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তি পেতে।

কিন্তু কোন্ পথে মুক্তি আসবে, তা কি তোমরা স্থির করতে পেরেছ?

পেরেছি। শক্তিশালী শোষকের কাছে আবেদন-নিবেদন নিষ্ফল। আমাদের হাতে তুলে নিতে হবে হাতিয়ার। বুকের রক্ত দিয়ে রাঙা করতে হবে দেশের মাটি। তবেই আসবে মুক্তি।

তাই যদি বিশ্বাস কর, তা হলে আমার এই অভিযানে নিশ্চয়ই তোমরা সাহায্য করবে।

আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

তোমার সহকর্মী কোকো আর রোডোলফো কি তোমার মতের সমর্থক?

নিশ্চয়। তবে আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের নেতা মনজের জন্য। মনজে গেছে বুলগেরিয়াতে। আশা করি, সফর শেষ করে শীগ্‌গির সে ফিরবে। মনজে ফিরে এলে তার সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করছি।

মনজে যদি সমর্থন না করে?

আমরা তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করব। অবশ্য এ বিষয় নিয়ে অন্য কারও সঙ্গে কোন আলোচনা বর্তমানে করতে চাই না। মনজে এলে আমরা এ বিষয় উত্থাপন করব।

চে মাথা নেড়ে বলল, বেশ, তাই হবে।

জঙ্গল।

গভীর জঙ্গল। মশা, উকুন, ফড়িং। উঃ, ব্যস্ত করে তুলল। নিরাপদ আশ্রয় তৈরীর জন্য সবাই প্রস্তুত। চে চেষ্টা করছিল তার বিগত কয়েক দিনের রিপোর্ট লিখতে। কিন্তু এই পোকা-মাকড়ের উৎপাতে নিশ্চিন্তে কোন কাজ করতে পারছিল না।

ক'দিন আগে বলিভিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে চে-র বিরাট একটি প্রবন্ধ বের হয় হাভানার একটি পত্রিকায়। এর ফলেই চে-র বলিভিয়ায় অবস্থিতি সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয় বারিয়েনতোস। জন-সমক্ষে যা ছিল সন্দেহ, তা বাস্তব বলে স্বীকার করে নেয় প্রেসিডেণ্ট স্বয়ং। All out আক্রমণ শুরু হবে এ বিষয়ে চে-র কোন সন্দেহ ছিল না। তাই যোগাযোগ রক্ষা করে সর্বপ্রথম বলিভিয়ায় বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে এসেছে সদলে। রাজধানী লা পাজ, কোচাবামবা, কামারি, টিনখলি অঞ্চল। তৈল-শোধনাগার এলাকা দেখে এসে বিপ্লবের মূল কেন্দ্র গড়ে তুলতে পাহাড়ী জঙ্গল বেছে নিয়েছে।

চে মাঝে মাঝেই লোকদের পাঠাত খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করতে। এতে লোকজনের সন্দেহ জাগত। সেজন্য গভীর বনে আস্তানা করাই নিরাপদ মনে করে চে তার সঙ্গী পাচুনগো, পোমবা, সোয়াফিন, তুমাইনিকে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল।

তুমাইনিকে চে বলল, আরও লোক চাই বন্ধু। যারা আমাদের নিজস্ব লোক, তাদের এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। অবশ্য

অপরের দৃষ্টি এড়িয়ে এবং যাতে কারও মনে কোনরকম সন্দেহ না জাগে সেইভাবে। আমরা এখানে স্থায়ী ক্যাম্প তৈরীর চেষ্টা করছি। আরও ছয় জন আসবে বলে সংবাদ পেয়েছি। তুমি তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে।

তুমাইনি মাথা হেলিয়ে রওনা হল নিজের কাজে। তাকে মাঝে মাঝেই যেতে হয় আরগানারাজের কাছে খাদ্য সংগ্রহে। তার মনেও যাতে সন্দেহ না জাগে, সে ব্যবস্থাও করতে হয়েছে। সেখানকার নির্লিপ্ত মানুষের মনে হয়েছে, একদল কোকেনের চোরাকারবারী গোপনে কাজ করে চলেছে। সেজন্য গুরুতর কোন চিন্তা তাদের মনে বাসা বাঁধতে পারেনি। বিশেষ করে জনবিরল ঐ সব এলাকায় রাজনীতির ধুঁয়ো তখনও তেমন ভাবে প্রবেশ করেনি।

চে স্থান নির্ধারণ করেছিল উঁচু টিলার প্রায় একশ' মিটার দূরে। পাহাড়ে ছিল কতকগুলো গুহা। তাতে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য রসদ গুদামজাত করার সুবিধা ছিল। সেই সব গুহায় রসদ জমা করে রাখতে ব্যস্ত হল মুক্তিযুদ্ধের সেনারা। আগামী দিনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সবাই অপেক্ষা করতে থাকে তাদের সহকর্মীদের জন্য। আরও অনেক সহকর্মী আসবে—এই আশায় দিন কাটায় সবাই। জন-সংখ্যা নির্ধারিত পর্যায়ে এলে আরম্ভ হবে লড়াই। তখনও যুদ্ধের বাজনা বাজেনি, প্রস্তুতি চলছে।

এবার নিরাপদ বাসস্থান তৈরীর জন্য সুড়ঙ্গ তৈরী আরম্ভ করল।

বাইরে থেকে যাতে বুঝা না যায়, তার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে থাকে। বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়া যাতে কোন রকমেই তাদের বসবাসের অসুবিধা ঘটাতে না পারে, তার জন্য এই বাসস্থান। উপরন্তু শত্রুর চোখে ধূলা দিয়ে বাস করার মত নিরাপদ আস্তানা।

জন-সংখ্যা কম।

মাত্র চারজন।

সামনে পোমবা আর পাচুনগো টানেল কাটে। বিকেলে কাটে তুমাইনি আর চে। সারাদিনে তারা আড়াই গজের মত সুড়ঙ্গ কাটে। আবার তারা অপেক্ষা করে পরের দিনের জন্য। পরের দিন যাতে তারা কাজ শেষ করতে পারে, তার জন্য নতুন উৎসাহে আবার কাজ করে।

দুদিনেই একটা সুড়ঙ্গ তৈরী শেষ।

নিরাপদে বাস করার মত সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গমুখ লোকচক্ষুর অন্তরালে, যাতায়াতের পথও বেশ গোপন। এখানেই রসদ নিয়ে তারা আশ্রয় নিল। প্রবেশমুখ বন্ধ করল ঝোপজঙ্গল কাদা দিয়ে। বাইরে থেকে কারও জানার উপায় নেই এই গোপন আশ্রয়।

আশ্রয় হল। রসদও রয়েছে কিন্তু যাদের আসার কথা তাদের দেখা নেই। অস্থির হয়ে উঠতে থাকে চে। লা-পাজ থেকে লোক আসবে অথবা সংবাদ আসবে। কিন্তু কিছুই আসছে না।

লোকের মনে সন্দেহ জাগতে পারে পোমবা। তোমরা আরগানারাজের কাছে যাও জিনিস কিনতে। আমরা এখন প্রস্তুত নই। আরগানারাজ যদি সন্দেহ করে পুলিশকে খবর দেয়, তাহলে বিপদ ঘটতে পারে। কথাটা উত্থাপন করল চে।

ওর মনে যাতে সন্দেহ না জাগে তাই করতে হবে স্যার।

তোমরা জানো, ওরা ভেবেছে আমরা কোকেনের চোরা-কারবারী। ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে, কোকেনের চোরাকারবারে প্রচুর লাভ। যদি আরগানারাজ আমাদের সঙ্গে চোরাকারবারে হাত মেলায়, তা হলে রাতারাতি বড় লোক হতে পারবে। তার একটা খামার বাড়ি আছে, কিছুদিনের মধ্যেই তা দশটা হবে। এইভাবে কথা চালিয়ে ওর মনে ধাঁধা সৃষ্টি করে রাখতে হবে।

সেইদিনই পোমবা আর পাচুনগো গেল মুরগী কিনতে।

আরগানারাজ মুরগী এনে দিয়ে বলল, তোমাদের দেখছি টাকার অভাব নেই। এত টাকা কোথায় পাও তোমরা ?

পোমবা হাসল, বলল, ধীরে জানতে পারবে কর্তা। এত ব্যস্ত কেন ? টাকা উপায় করতে জানতে হয়। উপায় করতে জানলে টাকা দৌড়ে এসে পকেটে ঢোকে। টাকা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, ধরতে জানতে হয়।

আরগানারাজ মাথা চুলকে বলল, তা ঠিক বলেছ। আমাদের এই খামারটুকুই ভরসা। অন্য কথা ভাবার সময় কোথায় !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, টাকা একটা কপাল।

তা বটে। তদ্বির না করলে তগদীর খোলে না কর্তা। তদ্বির করেছ কি কখনও ?

সময় কোথায়।

তাহলে আমাদের সঙ্গে হাত মেলাও। দেখবে অল্প সময়ে কত বেশি টাকা উপার্জন করতে পার।

তা বটে, তা বটে। তবে ভয় হয় বন্ধু। কোন ফ্যাসাদে যদি পড়ি।

আহা, ফ্যাসাদ তো আমাদের। তোমার আর কি ! দু'চারটে খদ্দের আসবে। তাদের থাকতে দেবে। গোপনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে। এ তো সামান্য কাজ। তবে তৃতীয় কোন ব্যক্তি জানলে তোমারও বিপদ, আমাদেরও বিপদ। আমরা পালিয়ে বাঁচব, কিন্তু তুমি তো ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে পারবে না। তোমার বিপদ আমাদের থেকে কম নয়।

তাহলে তোমাদের ও সবে আমি নেই।

তা ঠিক। তবে ভেবে দেখ, একটি পেসোস তোমাকে ব্যয় করতে হবে না। অথচ মাস গেলে দুই থেকে তিন হাজার পেসোস উপার্জন নিশ্চিত। শুধু লোক জানাজানি করতে পারবে না।

আমি শুনেছিলাম তোমরা কোকেনের কারবার কর। তা হলে সংবাদটা মিথ্যা নয়।

যা রটে, তা কিছুটা বটে। কোকেন তো এদেশে বিক্রি করি না। এখান থেকে আমরা পাঠাই এশিয়া আফ্রিকার নানা দেশে। সেজন্য চোরা পথে খদ্দের আসে। তোমার কাজ হল, এই সব খদ্দেরকে যাচাই করে দেখা। খদ্দের সেজে পুলিশও আসতে পারে। তাই লোক দিয়ে ও নিজে তাদের গতিবিধি নজর রেখে তারপর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই তোমার কাজ। তাতেই পাবে কমিশন। তোমার বিশেষ কোন ভয়ের কিছু নেই। মালও থাকবে না, বিক্রিও করতে হবে না।

আরগানারাজ চিন্তা করে বলল, মন্দ নয়। তবে কাল তোমাদের বলব।

পোমবা মুরগী নিয়ে ফিরে যেতে যেতে বলল, এ নিয়ে আর কারও সঙ্গে আলোচনা কর না যেন।

না, না। সে সব চিন্তা কর না।

ফিরে এসে পোমবা বলল, তোমার কথামত কাজ করেছি। কথাবার্তায় বুঝলাম, ওরা আমাদের কোকেনের চোরা-কারবারী বলেই জানে। আমাদের কাজের সুবিধা হবে বলেই মনে হচ্ছে।

আশ্রয় হল।

আহার্য হল।

কিন্তু রাজধানী লা-পাজ থেকে কোন খবর এল না।

চারজনের জীবন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে উঠতে থাকে। সেই মশা আর মাছি, সেই উকুন আর পোকা। এদের কামড়ে উত্যক্ত হয়ে উঠল চারজনেই। শেষ রাতে বেশ ঠাণ্ডা। কম্বল মুড়ি দিয়ে কোনরকমে এই সব বন্যজ উৎপাত থেকে দেহকে রক্ষা করতে থাকে দিনের পর দিন। অপেক্ষা করতে থাকে লা-পাজ থেকে লোক অথবা খবর আসার।

আশার আলো দেখা দিল।

মারকোস আর রোলাণ্ডো এল অবশেষে। চারজনের জায়গায় এবার ছ'জন হল।

তোমাদের এত দেরী হল কেন? জানতে চাইল চে।

তোমরা যে এখানে আছ এ সংবাদ আমরা জানতাম না।

আশ্চর্য! আমরা অনেক আগেই, প্রায় দু সপ্তাহ আগে সংবাদ পাঠিয়েছি।

মারকোস বলল, মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে সংবাদ পেয়েছি। আমরা দৌড়তে দৌড়তে এসেছি। পথ তো কম নয়, সানপাবলোর পথে আসতে হয়েছে। আত্মগোপন করে আসা তো সহজ নয়। দিনের বেলায় পথ চলতে পারিনি, রাতের বেলায় আকাশের তারাকে কম্পাস মনে করে ছুটতে ছুটতে এসেছি।

আর কেউ আসবে কি?

নিশ্চয় আসবে। তবে দেরী হবে।

কত দেরী হবে?

সম্ভবত এক সপ্তাহ। তার আগে কমরেডরা এখানে পৌছতে পারবে বলে ভরসা পাচ্ছি না। আমরা সংবাদ পাঠিয়েছি। তারা সংবাদ পেয়েছে নিশ্চয়। তাদের কাছ থেকে কোন খবর পাবার আগেই আমরা রওনা হয়েছি।

এবার আস্তানা নিরাপদ কর। কাজের প্রোগ্রাম কর।

করব। বিগোটেস আমাদের সংবাদ দিতে দেরী করেছে। বলল রোলাণ্ডো।

আমার সেই রকমই আশঙ্কা ছিল। তাকে স্থির চিত্ত ভাবতে পারিনি। তার কাজের সবকিছু যেন নির্ভর করছে মনজের ওপর। বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির কি মত?

পার্টির মত আমরা জানি না। এ নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি। আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সমর্থন করি সশস্ত্র বিপ্লবকে। তাই আমরা ছুটে এসেছি।

আমাদের জনসংখ্যা কত কম, তা তো দেখতে পাচ্ছ। এ নিয়ে কাজে এগোনো বুদ্ধিমানের কাজ হবে কি ?

আরও আসছে কমরেড, কোন চিন্তা করতে হবে না। কাজ আরম্ভ হলে উৎসাহ সৃষ্টি হবে জনমনে। তারাও এগিয়ে আসবে আমাদের সাহায্য করতে। কিন্তু তুমি এখানে আছ—এ সংবাদ কি করে জানল বিগোটেস, তা ভেবে পাচ্ছি না।

বিগোটেসকে এই সংবাদ দিয়েছে প্যাপি এবং কোকো। আমার বিশ্বাস, আমাদের গোপনীয়তার শপথ ভঙ্গ করেছে তারা। অমার্জনীয় অপরাধ। কেন, ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে ঈর্ষা।

হয়ত তাই। বিগোটেস জানে, তোমরা এদেশে এসেছ, কিন্তু এই নির্দিষ্ট স্থানে আছ, তা প্যাপি আর কোকো জানে। তারা বোধহয় গিয়েছিল সাচ্চা জঙ্গী কম্যুনিষ্টদের এখানে পাঠাতে কিন্তু তারা তা না করে বিগোটেসকে জানিয়েছে তোমার অবস্থান। এটাই জানাজানির কারণ।

চে কোন কথা না বলে নবাগত দুজনকে খেতে পাঠিয়ে দিল।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল চে।

মুখের চুরুট হাতের আঙুলে পুড়তে থাকে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।

পোমবা এসে দেখে গেছে, কোন কথা বলতে সাহস পায়নি। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ। নিরুপায় হয়ে রোলাণ্ডো এসে ডাকল, কমরেড, খাবে না ?

চে হুঁস ফিরে পেয়ে বলল, দাও। রোডোলফো এসেছে কি ?

হাঁ এসেছে। বলল পোমবা।

আচ্ছা।

খেতে থাকে চে। গভীরভাবে চিন্তা করছে। খাওয়া যেন গৌণ কাজ।

আশ্রয় তৈরী হয়েছে। জনসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু কাজে এগোতে পারছে না চে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। সুড়ঙ্গের নিরাপদ আস্তানায় বসে বসেই দিন কেটে যাচ্ছে। যা কিছু প্রোগ্রাম, তা কাজে লাগাতে পারছে না কেউ-ই। বাইরে থেকে কিছু কিছু অস্ত্রশস্ত্র আসতে আরম্ভ করেছে। এবার অস্ত্র বিতরণ শুরু হল। যে যেমন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তাকে সেই রকম অস্ত্র দেওয়া হল।

বৃষ্টি পড়তেই মুক্তিযোদ্ধার প্রথম দল এগিয়ে গেল য়্যাকৃশানে।

প্রথম আঘাতেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হল সরকারী ফৌজ। সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছতেই ব্যাপক ফৌজী অপারেশন আরম্ভ হল গোরিলাদের নির্মূল করতে।

কিন্তু কোথায় গোরিলা?

উত্তরে।

উঁহু। দক্ষিণে আক্রমণ চলছে।

তবে যাও, ছুটে যাও দক্ষিণে।

উঁহু। এ যে পশ্চিমে। তাইতো! গোরিলাদের অবস্থান কোথায়?

সান জুয়ান দেল্ পোত্রেরো আক্রান্ত হল।

সরকারী ফৌজ ছুটছে। কিন্তু...।

কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধে সরকারী ফৌজ পরাজিত। একজন কর্ণেল মৃত, পনরজন আদার র‍্যাংক। সংবাদ শুনে সামরিক কর্তাদের ঘুম ছুটে গেল। প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

যেখানে পাবে গোরিলাদের নির্মূল কর। আদেশ দিল কর্তারা।

কিন্তু কোথায় গোরিলা? এরা আলেয়া। পেছনে ছুটছে সরকারী সৈন্য কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না কাউকেই।

বন্দীদের সংবাদ পৌঁছল চে গুয়েভারার কাছে।

কি করা হবে বন্দীদের? বিচার? মৃত্যুদণ্ড? কারাদণ্ড?

চে বলল, না। সসম্মানে মুক্তি দাও ওদের। ওদের পরিচয়-পত্র বাদে সবকিছু মুক্তিযোদ্ধাদের দপ্তরে জমা দিয়ে ওদের পৌঁছে দাও নিরাপদ এলাকায়। ওরা যখন যুদ্ধ করে, তখন ওরা প্রতিক্রিয়া-শীলদের ভাড়াটিয়া লোক। ওদের অপরাধ যুদ্ধ নয়, ওদের অপরাধ দাসত্ব। ধনতন্ত্রী সমাজে ওরা নিরুপায়। ব্যক্তিগতভাবে ওরা অপরাধী নয়। ওদের মুক্তি দাও।

চে-র আদেশ প্রচারিত হল। মুক্তি পেল কর্ণেল সহ পনরজন সৈনিক। তাদের জানিয়ে দেওয়া হল, মুক্তিফৌজ হত্যার নেশায় নামেনি, মুক্তিফৌজ শ্রেণীহীন সমাজে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার ব্রতে ব্রতী। তারা যখন অস্ত্র ব্যবহার করে, তখন তা ব্যবহার না করে দ্বিতীয় পথ থাকে না।

সরকারী সামরিক বিভাগ অপারেশন সিংতিয়া গঠন করেছে 'সিয়ার' সহায়তায়, কিন্তু কোথায় গোরিলা? কোথায় হবে অপারেশন? এই তো সানজুয়ান দেল পোত্রোর যুদ্ধ হয়ে গেল। আবার সেদিন এল কোরাদো অঞ্চলে কঠিন আঘাত করেছে গোরিলারা। তাদের আক্রমণ-কৌশল স্তম্ভিত করে দিয়েছে পেশাদারী সৈন্যদের। 'সিয়ার' পরামর্শে য়্যান্টি গোরিলা ওয়ার ট্রেনিং চলছে সরকারী ফৌজী ব্যারাকে কিন্তু কোথায় এই ধূমকেতুর দল। এরা আক্রমণ করে পরাজিত করছে সরকারী বাহিনীকে, আবার বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পুলিশ ও ফৌজ খুঁজে বেড়াচ্ছে গোরিলাদের। তাদের গোয়েন্দারা সাদা পোষাকে ঘুরছে উপদ্রুত এলাকায় গোরিলাদের ঘাঁটি আবিষ্কার করতে। সন্দেহভাজন যাকে মনে করছে, তাকেই টেনে নিয়ে আসছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে, প্রয়োজন মনে করলে আটকে রাখছে। অপ্রয়োজনীয় মনে করলে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু সত্যিই যে কে গোরিলা বাহিনীর লোক, তা স্থির করতে পারছে না তাদের শক্তিশালী গোয়েন্দা-দপ্তর।

এই গোয়েন্দারা গ্রেপ্তার করল একদিন তিনজনকে।

স্থানটির নাম ময়ুপম্পা।

ছোট গ্রাম।

গ্রাম ছেড়ে তিনজন লোক যাচ্ছিল বনের দিকে। পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

আশ্চর্য হয়ে গেল গোয়েন্দাবাহিনী। যাদের গ্রেপ্তার করল, তারা বাধা দিল না কেউ। অতি সাধারণ অসামরিক ব্যক্তি। কোন হাতিয়ার নেই। দিনের বেলায় অতি সাধারণ মানুষের মতই তারা চলাফেরা করছে। অথচ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে সন্দেহে। টানতে টানতে তাদের আনা হল গ্রামে। গ্রাম তখন সামরিক বাহিনীর হেপাজতে। তারা খবর পাঠাল, কেন্দ্র থেকে বন্দীদের কামিরিতে নিয়ে যাবার।

কামিরিতে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের অন্যতম ইংরেজ ফটো-গ্রাফারকে ছেড়ে দিল। আটক করা হল আর্জেন্টিনার চিত্রকর বুস্তস ও ফরাসি সাংবাদিক দ্যবরেকে।

চে তখন ব্যস্ততার পরিকল্পনা নিয়ে। তার ডাইরিতে লিখল: "To wait to the rest of the men, to increase number of Balivians to atleast 20 and to begin operation. We still have to find out what Monje's reaction will be and how Guevara's people are behaving". বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বলিভিয়ার লোক দরকার। তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হলে তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

চে বলিভিয়ার সহকর্মীদের ডেকে বলল, আমরা চাই এ দেশের কমরেড। তোমাদের কাজ হবে কম করেও বিশ জন পেরুর কমরেডকে আমাদের অপারেশনে অংশ গ্রহণ করতে পাটান।

অবশ্যই আমরা তা করব।

আমাদের বর্তমান কাজ হবে আরও কতকগুলো নিরাপদ

আশ্রয় তৈরী করা। আমাদের আশ্রয়-সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে আমরা নিরাপদে চলতে ফিরতে পারব।

আমরা বিশ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার পর পর সুড়ঙ্গ তৈরী করছি।

জলের অভাব যেন না থাকে। পানীয় জলের অভাব যেন না ঘটে, সেদিকে নজর রেখে আশ্রয় তৈরী করবে। আর আশ্রয়-গুলোকে নিরাপদ করতে অবশ্যই যত বেশি সতর্কতার প্রয়োজন, তা গ্রহণ করবে।

চে হিসাব করে দেখল তার সহকর্মীর সংখ্যা কত।

জনসংখ্যা সামান্য, কিন্তু লা-পাজ থেকে আরেক জন ইতিমধ্যেই কোকোর সঙ্গে এসে দলের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এদের সঙ্গে রয়েছে জ্যাকুইন, উরবানো এবং বলিভিয়ার একজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আরনেসতো। কোকো আবার ফিরে গিয়ে নিয়ে এল ব্রাউনি, মিগুয়েল এবং বলিভিয়ান ইনতিকে। কোকোকে নিযুক্ত করা হল জন-সংযোগ রক্ষা করতে।

নতুন করে সংবাদ এসেছে।

এল, চিনো খবর পাঠিয়েছে বিশ জন কমরেড যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসতে চাইছে। কোকো তাদের নিয়ে আসতে চায় কিন্তু পথ খুব সহজ নয়।

চে কোকোকে পাঠালো চিলিতে। সান্তা ক্রুজে বিশজন সহকর্মী কোকোর সঙ্গে সাক্ষাত করবে। সেখান থেকে গোপন পথে মুক্তিযোদ্ধাদের কেন্দ্রে আনা হবে তাদের।

ক্রমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমেই শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। যুদ্ধ, যুদ্ধ আর যুদ্ধ! বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে মুক্তিফৌজ। অল্পক্ষণের মধ্যে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে আবার কোথায় আত্মগোপন করল।

মন্ত্রণাসভা বসল কর্মপদ্ধতি আর পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য।

চে প্রস্তাব করল, বর্তমান অবস্থায় আমাদের অগ্রগতির বিষয় কিউবাকে জানাতে হবে, তার জন্য একজনকে হাভানায় যেতে হবে।

চিনো এই দায়িত্ব গ্রহণ করে বলল, আমি যাব হাভানায়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে সব বিষয় জানিয়ে আসব।

আমাদের জনসংখ্যা কিন্তু প্রয়োজন মত নয়। বলল চে গুয়েভারা।

আমরা সে বিষয়ে বিশেষ নজর দিয়েছি। পেরু থেকে পাঁচজন শীগ্‌গির আসবে আমাদের সাহায্য করতে। তাদের মধ্যে একজন রেডিও টেকনিসিয়ান, অপর একজন ডাক্তার। এখন কিছু অস্ত্রের দরকার মেজর।

অস্ত্র যথেষ্ট নেই চিনো। তবে এখন তোমাকে একটা বন্দুক, কিছু মর্টার, পিস্তল আর হাতবোমা দিতে পারি। এই অস্ত্র বাদেও কিছু কেনার জন্য টাকাও দিচ্ছি। তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে। আর পেরু থেকে যারা আসবে, তাদের জন-সংযোগে নিযুক্ত করলে তারা টিটীকাকা থেকে গোপনে অস্ত্র আমদানী করতেও পারবে।

পেরুতে মুক্তিযোদ্ধারা সক্রিয় কিন্তু তাদের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয়নি। তবে সব খবর নির্দিষ্ট ভাবে দিতে পারছি না। কারণ ঐ এলাকায় অনেকদিন যেতে পারিনি। খবর নিয়ে দেখতে হবে, অবস্থা কতটা আমাদের অনুকূল। আমি এখন লা-পাজে যাচ্ছি।

তা যাও। সেখানে প্রধান প্রচার সচিবের সঙ্গে দেখা করবে। সে হল ইনতির ভগ্নীপতি। আমার মনে হয়, এই ভদ্রলোক আমাদের সাহায্য করতে পারেন। আমাদের বর্তমান যে সংগঠন তাতে ভরসা করে এগোনো যাবে কিনা, তা ভেবে দেখতে হবে। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজন। জন-সংযোগ যেমন দরকার, সহকর্মী যোদ্ধার দরকার তার চেয়ে কম নয়, অস্ত্রেরও প্রয়োজন রয়েছে। তোমরা এসব দিকে নজর রাখবে। লা-পাজে বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট

পার্টির হালচালও ভাল করে জানতে হবে। ওদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে পারছি না।

আমার সামর্থ্য মত কোন কাজে কোন ত্রুটি রাখব না।

আমাদের কতকগুলো বিশেষ নিয়ম জানা দরকার। আমরা যুদ্ধ করতে এসেছি। এ যুদ্ধ মধ্যযুগীয় যুদ্ধ নয়, এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ নয়। সেজন্য মুক্তিযোদ্ধারা শুধুমাত্র যুদ্ধ করবে, তা নয়। তাদের সঙ্গে স্থানীয় লোকের গভীর সৌখ্য যাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে। তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে কেন আমরা এই যুদ্ধ করছি। বলিভিয়ার বহু কমরেড আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে। তাদের সম্বন্ধেও আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। এরা নতুন, এরা সশস্ত্র সংগ্রামের রাজনীতি জানে না। তাদের বিশেষ শিক্ষা দেবার যেমন দায়িত্ব আমাদের রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দেবার দায়িত্ব। এদের হাতেই তুলে দিতে হবে ভবিষ্যতের বলিভিয়াকে। সেজন্য যথেষ্ট শিক্ষণের প্রয়োজন। আমরা, যারা লড়াই করতে করতে এতদূর এগিয়েছি, আমাদের কাজ হবে এদের শিক্ষিত করে তোলা।

সবাই সায় দিল চে-র প্রস্তাবে।

দিনগুলো অলস গতিতে চলেছে। কাজও বিশেষ এগোচ্ছে না। একঘেয়ে জীবন। তার মধ্যে একমাত্র কাজ হল পাহাড়ের গুহা খুঁজে নিরাপদ আশ্রয় তৈরী, আর সুড়ঙ্গ কেটে নিজেদের রসদের জন্য গুদাম তৈরী।

খাবারের বড় অভাব।

দু'তিন জন বেরিয়ে গেল হরিণ শিকারে। হরিণ শিকার করতে পারলে অন্তত দুদিনের খাবার সংগ্রহ হবে। যতক্ষণ বাইরে থেকে খাবার না আসছে, ততক্ষণ এইভাবে বনের পশু মেরে খেতেই হবে।

একজন বলল, আমি লা-পাজে যাব।

কষ্ট সহ্য করতে পারছ না বুঝি?

না মেজর সাহেব, আমার পারিবারিক কিছু ব্যাপার আছে। সে সব মিটিয়ে আসতে চাই।

নিশ্চয়। কিন্তু যদি তোমার কোথাও কোন অসুবিধা হয়ে থাকে, তাও বলতে পার। যদি তুমি মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ভয় পাও, তাও বলতে পার॥

না, না, বলে চীৎকার করল আপোলিনার।

আমি ভয় করি না। কিন্তু যদি মৃত্যু হয়, তখন আমার পরিবারে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। সেগুলো আমি জীবিত কালেই মিটিয়ে যেতে চাই। নইলে উত্তরাধিকারীদের নিয়ে বহু ঝামেলা করবে বারিয়েনতোস।

চে অনুমতি দিল তাকে লা-পাজে যেতে।

যাবার আগে আপোলিনার আর মিগুয়েল বেছে বেছে একটা ভাল জায়গায় নতুন একটা সুড়ঙ্গ কাটতে লেগে পড়ল। হাতিয়ার নেই মাটি অথবা পাথর কাটার। তবুও তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে মোটামুটি ছোট্ট একটা সুড়ঙ্গ তৈরী করে হাঁপাতে লাগল। যারা শিকারে গিয়েছিল, তারা খালি হাতে ফিরে এল। আহার্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। সেজন্য সবাই ঘাবড়ে গেল। এতগুলো লোকের খাবার দরকার। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। এমন সময় উরবানো বেশ একটা মোরগ সংগ্রহ করে ফিরে এল ক্যাম্পে।

আরও জনসংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে ধীরে ধীরে।

একটা জিপে করে ছদ্মবেশে অনেকেই আসতে থাকে, তাদের মধ্যে অনেকেই বলিভিয়ার লোক। এই যাতায়াতে অনেক সময় হয়ত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, সন্দেহ জাগতে পারে।

চে পাপিকে ডেকে বলল, এভাবে জিপে করে আসা-যাওয়া করলে সন্দেহ জাগবে।

জানি। তবে এখনও এমন কিছু ঘটেনি।

আর ট্রিপ দিয়ে কাজ নেই।

আমাদের শহরের আস্তানা ও গুদাম ঘর বিক্রী করে দিতে হবে মেজর। হাজার ডলার দাম পেয়েছি। টাকাটা নিশ্চয় আমাদের কাজে লাগবে। আর রেনান ও তানিয়াকেও আনতে হবে। তারা আসার জন্য প্রস্তুত। এর জন্য একটা ট্রিপ, আর অস্ত্রশস্ত্র আনতে আরেকটা ট্রিপ।

চে মাথা নেড়ে বলল, উঁহু। একটা ট্রিপেই সব কাজ শেষ করতে হবে। নইলে পুলিশের নজর পড়বে। আমরা প্রস্তুত হবার আগেই আমাদের কর্ম পণ্ড হতে পারে। সেজন্য বেশি ট্রিপ নয়।

বেশ, তাই হবে। আমি যাচ্ছি বলেই পাপি বিদায় নিল। রওনা হল লা-পাজের পথে।

চিনো কদিন অপেক্ষা করছিল কিউবা যাবার জন্য। সে-ও সুযোগ বুঝে কিউবার পথ ধরল।

কোকো।

ইয়েস স্যার।

তোমাকে কামিরি যেতে হবে। আমাদের খাবার দরকার। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার নিয়ে আসতে হবে তোমাকে। প্রস্তুত হও।

আমি সব সময় প্রস্তুত।

পোসব ছুটে এসে বলল, আমাদের পায়ের দাগ দেখে একজন শিকারী এসেছে।

চে চমকে উঠল।

এত অসতর্ক হওয়া উচিত হয়নি। তোমাদের আরও সতর্ক থাকতে হবে।

তখনই সঙ্কেত দেওয়া হল সবাইকে। আরও বেশি সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার নির্দেশ দেওয়া হল।

কিন্তু ইনতির কথা শুনে চে গম্ভীর হয়ে গেল।

কারলোসকে বিশ্বাস করা উচিত নয় মেজর সাহেব।

কারণ ?

তার কথায় ভরসা করতে পারছি না। কারলোস বলছে, বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে কিউবানরা কেন এসেছে। তার বক্তব্য হল, যদি বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি এই সংগ্রামে যোগ দেয়, তবেই সে অংশ গ্রহণ করবে।

তারপর ?

তারপর তাকে ফেরত পাঠাতে হয়েছে।

যাচাই না করে কাউকে এখানে আসতে দিও না ইনতি। এই ছেলেটা আমাদের গোপন কার্যালয় দেখে গেছে, আমাদের কাজের ধারা সম্বন্ধে কিছুটা জেনে গেছে। এরা যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে কাজের প্রারম্ভেই আমাদের হার মেনে নিতে হবে।

রোদোলফো কারলোসকে পাঠিয়েছে। তাই বিশ্বাস করে নিতে হয়েছে।

ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ নিশ্চয়ই ঘটেছে। এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করে কাজ করা উচিত। সামান্য ভুলের জন্য অধিক মাশুল যেন দিতে না হয়।

চে ডেকে পাঠাল সকল সহকর্মীদের।

তোমরা সবাই জানো, আমরা বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছি। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া দালাল বারিয়েনতোস যে ভাবে জনতার ওপর অত্যাচার ও শোষণ চালাচ্ছে ইয়াঙ্কী সাম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে, তার অবসান আমরা ঘটাতে চাই। আমরা চাই শ্রেণীহীন সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। তার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

চে-র বক্তব্য শুনে সবাই বলল, আমরা প্রস্তুত।

আবার বলতে থাকে চে : যারা বলিভিয়ান, তারা নিশ্চয়ই জানে যে, আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধকে বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি সমর্থন করে

নি। বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি নামেই কম্যুনিষ্ট। আসলে তারা শোষণবাদী সাম্রাজ্যবাদের দালাল। তাই যে সব বলিভিয়ান সহকর্মী এখানে আছে, তারা যেন মনস্থির করে। কারণ ভবিষ্যতে তারাই বলিভিয়ার ভাগ্য নির্ণয় করবে। যুদ্ধ একটা গুরুতর ঘটনা। তাতে দরকার শৃঙ্খলাবোধ ও আনুগত্য। তার সঙ্গে ঐক্য হল অপর ধর্ম। এই তিনটি সম্বন্ধে সকলে যদি একমত হতে না পারা যায়, তাহলে বিপ্লবকে আমরা সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে পারব না। যারা এইভাবে চলতে পারবে না, তারা ফিরে যেতে পারে। যারা সমর্থ তারাই থাকবে আমাদের এই মুক্তিফৌজে।

সবাই সমস্বরে বলল, আমরা রাজি।

তাহলে আমাদের পরবর্তী যে কার্যক্রম হবে, তার জন্য শ্রম-বিভাগ প্রয়োজন। আমি প্রস্তাব করছি, সমর বিভাগের দ্বিতীয় স্থানে রইবে জ্যাকুইন, রোলাণ্ডো, আর ইনতি সমর বিভাগের কমিশনার। য়্যালে-জান্দ্রো সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান, পোমবো হবে সরবরাহ বিভাগের কর্তা। ইনতিকে দেখতে হবে আর্থিক বিষয়, স্যাটো রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্রের দায়িত্বে থাকবে, আর বর্তমানে মোরো চিকিৎসা বিষয়ে প্রধান রূপেই কাজ করবে। তোমাদের কারও কোন বক্তব্য থাকলে অথবা অন্য কোন প্রস্তাব থাকলে বলতে পার।

কেউ-ই নতুন কোন প্রস্তাব দিল না, কোন বক্তব্যও রাখল না। সবাই সম্মত হল চে-র এই প্রস্তাবে। নতুন সমর পরিষদ গঠিত হল।

তানিয়া বলেছিল চে গুয়েভারাকে ঃ তুমি বলিভিয়া যাবার আগেই আমি তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করে রাখব। তোমাকে আর নতুন করে লা-পাজে সংগঠন করতে হবে না।

চে গুয়েভারা বলিভিয়া এসেই লা-পাজেতে তানিয়ার সঙ্গে গোপনে দেখা করেছিল। তানিয়া তখন বলিভিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারী ভবনের প্রেসে চাকরি করছে।

বিশ্বাস হল তো ? বলল তানিয়া।

অবিশ্বাস কোন সময়ই করিনি। তুমি আমার আগেই এসেছ, কাজও গুছিয়ে নিয়েছ।

সহজে কি হয়েছে। সুপারিশের জোরে হয়েছে। আর্জেনটিনার মেয়ে আমি, স্প্যানিশ আমার মাতৃভাষা। আমার পক্ষে পাশপোর্ট সংগ্রহ মোটেই কঠিন হয়নি। কারণ আমার আগের পরিচয় ঢাকা দিয়ে নতুন পরিচয় সৃষ্টি করতে হয়েছে। প্রথমে এসে কিছুকাল স্কুলে চাকরি করেছি। তখন থেকেই সমাজে স্থান করে নিতে পেরেছি। মেয়েদের মন জানার মত সামর্থ্য ক'জনের আছে বলতে পার মেজর ? আমার মত রূপসী তরুণী, তার ওপর উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে কাজ গুছিয়ে নিতে পারে যে কোন সময়।

স্কুল থেকে একেবারে বারিয়েনতোসের বাড়িতে।

খুব সহজে হয়নি। মার্কিন সহায়তায় সম্ভব হয়েছে। আমেরিকার ধুরন্ধর কূটনৈতিকদের কণ্ঠস্বর দিয়ে আর চাহনি দিয়ে কাবু করতে হয়েছে। তাদের সুপারিশেই এখানে স্থান পেয়েছি। প্রেসের অধ্যক্ষ মুনোজোকে প্রভাবান্বিত করেছে মার্কিন কর্তারা। তাই বিনা সনাক্তিতে সোজা প্রবেশপথ পেয়েছি এখানে। এখানকার সংবাদ যথা সময়ে তোমার কাছে পৌঁছবে এবার।

কিন্তু তুমি তো বলিভিয়ার নাগরিক অধিকার এখনও লাভ করতে পারনি।

তাও করতে হবে। তার জন্যও সতর্ক হয়েছি। আমি বিয়ে করব ঠিক করেছি।

বিয়ে! কেন ?

কোন বোকা অথচ উচ্চপদের বলিভিয়ানকে বিয়ে করলে নাগরিক অধিকার পেতে তো কোন কষ্ট হবে না। তারপর সুযোগ বুঝে বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিতে পারব।

সত্যই তানিয়া বিয়ে করেছিল য়্যালভারেজকে।

নাগরিক অধিকার লাভ করেই তানিয়া গোটা বলিভিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটতে থাকে। আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে আদিবাসী এলাকায় রাতের পর রাত কাটাতে থাকে। ছুটির সময়টা তানিয়ার কাটে লা-পাজের বাইরে।

আবার লা-পাজে ফিরে এসে নিজেকে ডুবিয়ে দেয় কাজে। তানিয়াকে কখনও দেখা যায় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর গাড়িতে, কখনও দেখা যায় বিদেশী দূতাবাসের বড় বড় কর্মচারীদের সঙ্গে। কখনও কখনও কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিসেও যেত তানিয়া। সেখানে সে খুঁজে বের করেছিল উগ্রপন্থীদের। তাদের গোপন কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থাও করত তানিয়া।

স্বামী য়্যালভারেজ পছন্দ করত না স্বাধীন ভাবে এই ঘোরাফেরা। য়্যালভারেজ জানত না যে, তার স্ত্রী কি বস্তু বা প্রাণী। আগুনের ফুলকি দেখতে পায়নি য়্যালভারেজ, তাই মাঝে মাঝেই ঝগড়া করত, মাঝে মাঝেই অশান্তি করত। তানিয়ার তখন কাজ প্রায় শেষ। আর প্রয়োজন ছিল না তার স্বামীর ঘর করার। একদিন বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় নিল তানিয়া। য়্যালভারেজের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল।

বিদেশী যাদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিল চিত্রকর বুস্তক ও সাংবাদিক দ্যবরে। এই দ্যবরে হল Revolution within Revolution-এর লেখক। এরা মস্কোর শোধনবাদী নয়া ফর্মূলাকে মোটেই পছন্দ করত না। এরা বিশ্বাস করত ফিদেলের 'ওলাস' (OLAS) সংস্থার কার্যাবলী।

চে গুয়েভারার বৈপ্লবিক কাজ আরম্ভ হতেই তানিয়া দ্যবরে আর বুস্তককে নিয়ে গেল তেলের খনি অঞ্চলের শহর কামিরিতে। সেখান থেকে যোগাযোগ করে তারা হাজির হল চে গুয়েভারার গোরিলা যুদ্ধের কেন্দ্র এই পার্বত্য বনাঞ্চলে।

তানিয়াকে পেয়ে চে-র শক্তি বৃদ্ধি পেল, কিন্তু দ্যবরে ও বুস্তকের

মতবাদ চে-র মনঃপূত হয়নি। চে তাদের সানন্দে বিদায় দিয়েছিল। তারা যাতে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে পারে, সেজন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে এই দুইজনের কোনই ভূমিকা ছিল না। অথচ এদের গ্রেপ্তার করে অমানুষিক অত্যাচার করতে মোটেই ত্রুটি করেনি বারিয়েনতোসের গোয়েন্দা-দপ্তর।

কিন্তু জার্মান থেকেই যে বিপ্লবের বীজ বহন করে এনেছিল হাভানায়, সেই বিপ্লবকে রপ্তানী করতে তানিয়ার ভূমিকা যথেষ্ট মূল্যবান। চে আর তানিয়া কিউবা থাকাকালীন তাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছে এবং কাজের প্রথমেই তানিয়া সংগঠন গড়ে তুলতে ছুটে এসেছিল বলিভিয়াতে।

লা-পাজেতে চে মাঝে মাঝে সাক্ষাত করেছে তানিয়ার সঙ্গে। সেই সময় কর্মসূচিও মোটামুটি স্থির হয়েছিল। সেই কর্মসূচি অনুসারেই এগিয়ে চলেছিল দুজনে।

প্যাপীও এবং গনজালেস এসেছিল কামিরিতে।

তানিয়া অপেক্ষা করছিল কামিরিতে জিপের জন্য। জিপে মাল যাবে, লোক যাবে। তখনও জিপ পৌঁছায়নি। পাপির আসার কথা। কেন দেরী করছে ঠিক বুঝতে পারছে না।

হোটেলে তানিয়া লোরা গুতিয়েরেজ বেউয়ের নাম নিয়ে ঘর ভাড়া করে রয়েছে। হোটেল থেকে বের হবার পথে দুজন ভবঘুরে শ্রেণীর যুবককে দেখে কেমন সন্দেহ হল তানিয়ার। প্রথমে মনে হল নিশ্চয়ই পুলিশের লোক। বুস্তককে বলল, এদের গতিবিধির দিকে একটু নজর দাও বুস্তক। মনে হচ্ছে পুলিশ।

দুজনকে শেষ করে দিলেই হয়।

পাগল হয়েছ! আমাদের অস্ত্র নেই, তার ওপর মানুষ মারলেই

পুলিশ আমাদের সহজে ছাড়বে না। যে কাজে এসেছি, তা করাই হবে না।

তা হলে?

নজর রাখ। পুলিশ না-ও হতে পারে। হয়ত আমাদেরই কোন সহকর্মী।

পরের দিন বুস্তক বলল, না, পুলিশ নয়। কাজের আশায় ঘুরছে দুটো জোয়ান ছেলে।

কি রকম মনোভাব?

ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে পেটের দায়ে যে কি করবে, ওরা নিজেরাই বোধহয় জানে না।

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ কর। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।

একদিন প্যাপীও আর গনজালেসকে বুস্তক হাজির করল তানিয়ার সামনে।

তোমাদের চালচলন দেখে সন্দেহ হচ্ছে। বলল তানিয়া।

প্যাপীও মনে করল পুলিশের খপ্পরে পড়েছে। ভয়ে ভয়ে বলল, আমরা তো কোন অপরাধ করিনি ম্যাদাম। আমরা পেটের দায়ে কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছি।

পথে পথে ঘুরলে কাজ জোটে কি কখনও?

আমরা নবাগত। কারুর সঙ্গে পরিচয় নেই। যদি একটা কাজ দিতে পারেন…।

কাজ। হুঁ। কি কাজ করতে পার?

যে কাজ দেবেন।

তোমরা কেন খেতে পাচ্ছ না, তা কি জান? জান না। ঐ যে বড় বড় বাড়ি দেখছ, ঐ বাড়ির মালিক যারা, তারা তোমাদের খেতে দেয় না। তোমরা মেহনত করে যা পাও, তার একশ' গুণ ওরা পায় বিনা মেহনতে। ওদের ঐ একশ' গুণ টাকা যতক্ষণ না

আদায় করে জনসাধারণের মাঝে বিলিয়ে দিতে পারা যাবে, ততক্ষণ তোমাদের ঘুরতে হবে অনাহারে পথে পথে।

ঠিক বুঝলাম না ম্যাদাম। ওরাই তো কাজ দেয়।

কাজ দেয় বললে ভুল হবে বন্ধু। ওদের কাছে তোমরা মেহনত বিক্রী কর। কত কম পয়সা দিয়ে কাজ করায় ওরা, তা তুমি বুঝতে পারবে না। যাক ওসব কথা। একটা কাজ করতে পারবে?

কি কাজ?

ওরা যে বেশি পয়সাটা নিচ্ছে বিনা মেহনতে, তা যদি বিশ্বাস কর, তা হলে তা ছিনিয়ে নিতে হবে ওদের কাছ থেকে।

ডাকাতি করতে পারব না ম্যাদাম।

ডাকাতি নয়। ন্যায্য আদায়। ওরা হল ধনী। ধনবান গরীবকে বঞ্চনা করে ধন সঞ্চয় করে। আমরা চাই ওদের ধন কেড়ে নিয়ে গরীবদের মাঝে বণ্টন করতে শ্রমের হিসাবে। তোমরা পারবে এই বণ্টন-কার্যে সাহায্য করতে?

পারব। ওদের অনেক আছে, কেড়ে নিতে পারব। বলল গনজালেস।

বুস্তস বাধা দিয়ে বলল, লুঠ করার উদ্দেশ্যে লুঠ করা নয় বন্ধু। মানুষের প্রতি যদি দরদ না থাকে, তাহলে এটা হবে ডাকাতির সমান। আমরা ডাকাতি করি না, যারা ডাকাতি করে তাদের সমর্থনও করি না। আমরা চাই দেশকে শোষকের হাত থেকে রক্ষা করতে। তার জন্য বুকের রক্ত দিয়ে শেষ চেষ্টা করতে হবে। পারবে কি?

পারব।

সম্মতি জানিয়েই প্যাপীও-র চোখের সামনে ভেসে উঠল তার বাল্যজীবনের দুঃখভরা দিনগুলোর কথা। মনে পড়ল সেই অনাদৃত ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান এলির কথা। তাই তো! শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আছে বলেই নীচুতলার মানুষকে সইতে হচ্ছে এত কষ্ট ও ব্যথা। এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে হলে প্রয়োজন পরোপজীবীদের ধ্বংস করা।

তানিয়া বলল, কি ভাবছ ভাই, তোমরা হয়তো জান, The base of capitalism is personal property in the means of production, which yeild rentier income and gives private enterprise control over economic development. Similarly, the base of socialism is state ownership and control of industry (Joan Rabinson)—আমরা চাই সমাজ-তন্ত্র। আমরা চাই সবকিছুর ওপর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সমান অধিকার দেবে রাষ্ট্রয়ত্ব সম্পদ ভোগ করতে। পারবে এই বিশ্বাস নিয়ে চলতে ?

পারব।

বেশ।

বুস্তস বলল, আজ চে-র আসার কথা আছে।

ভালই হবে। তার সঙ্গে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হবে বেস ক্যাম্পে।

সেইদিন বিকেলে আত্মগোপন করে এসেছিল চে। চে-র সঙ্গে কি কথা হয়েছিল, তা ওরা দুজন বাদে আর কেউ জানত না। যাবার সময় চে প্যাপীও অথবা গনজালেসকে নিয়ে যায়নি। তাদের রেখে গেছে তানিয়ার হেপাজতে। নির্দেশ দিয়ে গেছে, ওদের সঙ্গে করেই তানিয়া যেন যায় তার গোপন ঘাঁটিতে।

তানিয়া ছিল সর্বগুণান্বিত বিদুষী মহিলা। তার গুণের অন্ত নেই। অন্ত নেই বলেই সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ ছিল যথেষ্ট। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তানিয়ার মত পাকা বিপ্লবী মোটেই ত্রুটি করেনি।

বুস্তস জানতে চেয়েছিল, তুমি বিয়েই বা করলে কেন আর বিচ্ছেদই বা ঘটালে কেন ?

জীবনকে পরখ করলাম। দেহের ক্ষুধা কতটা তার পরিমাপ করে নিলাম।

এটাই কি শেষ কথা ?

না। আমি যদি একজন বলিভিয়ানকে বিয়ে না করতাম, তা হলে

নাগরিক অধিকার পেতাম না। আর তা যদি না পেতাম, তা হলে আমাদের কাজ পিছিয়ে পড়ত।

আর বিচ্ছেদ এত তাড়াতাড়ি ?

য়্যালভারেজ লোকটা বেশ ভালই ছিল। তাকে তো ভালবাসতে পারিনি কখনও। দ্বিতীয়ত সে সব সময় অভিভাবকের ভূমিকা নিয়ে শাসন করার চেষ্টা করত। তৃতীয়ত আমি কাজকর্ম করে রাত্রে ক্লান্ত হয়ে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন তার কামনা পরিতৃপ্ত করতে দেহের ওপর যা অত্যাচার করত, তা সহ্য করতে পারতাম না। দু'একদিন যা সম্ভব, প্রতিদিন তা সম্ভব নয়। তাই বিবাহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়েছিল। চতুর্থত য়্যালভারেজ আমাকে সন্দেহ করত। তার সন্দেহ ছিল আমার চরিত্রের ওপর।

বুস্তস আর কোন প্রশ্ন করেনি কখনও।

সংবাদ এল ঃ জিপ প্রস্তুত। যেতে হবে গোপন ঘাঁটিতে। একই জিপে নিয়ে যেতে হবে বহু অস্ত্রশস্ত্রও। এগুলো তানিয়া সংগ্রহ করেছিল নানাভাবে।

একদিন গোপনে চারজন লা-পাজ ছেড়ে রওনা হল চে-র আস্তানা খুঁজতে। যেদিন তারা পৌঁছল, সেদিন তাদের খুঁজে বের করতে হয়নি আস্তানা। পাপি গাড়ি থেকে মালপত্র নামিয়ে গোপন পথ ধরে তাদের নিয়ে গিয়ে হাজির হল চে-র গোপন আস্তানায়।

সবাই খুশী।

চে যেন আরও শক্তি পেল মনে। তানিয়ার মত সহকর্মী পেলে কে না উৎসাহিত হয়। তানিয়া যেন একটা প্রকাণ্ড অপরিহার্য ঝঞ্ঝা। তার সঙ্গে কাজ করেও সুখ।

চে বলল, য়্যালভারেজকে আনতে পারলে না তানিয়া ?

আদর্শহীন মানুষকে এই বিপদসঙ্কুল জীবনের মধ্যে টেনে আনলে সুফলের বদলে কুফলই বেশি হত। য়্যালভারেজকে তালাক দিয়েছি। তার আসার পথ এই ভাবেই রুদ্ধ করেছি ডাক্তার।

ভবিষ্যতে কোন অশান্তি করতে যাতে না পারে, সেইজন্য হাঙ্গামা চিরকালের মত মিটিয়ে এসেছি। এখন আমি মুক্ত-বিহঙ্গের মত ইচ্ছামত স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে পারব।

বুস্তস ও ছবরেকে সম্মানে স্থান দেওয়া হল। প্যাপীও এবং গনজালেসকে শিক্ষণ-শিবিরে পাঠান হল। চারিদিকে চলছে প্রস্তুতি।

তানিয়া জানতে চাইল, কি ভাবে কাজে এগোচ্ছ তুমি?

এ বিষয়ে কোন বাঁধা-ধরা প্রোগ্রাম নেই তানিয়া। সব কিছু নির্ভর করছে পরিবেশের ওপর। যেখানে যে অবস্থায় আমরা কাজ করব, সেখানে সেইভাবে আমাদের কার্যক্রমও স্থির করব। আমরা কেবলমাত্র আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে ব্যবহার করব। আমাদের মনে রাখতে হবে, নতুন নতুন অবস্থায় নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

কি পরিমাণ সৈন্য থাকবে আমাদের প্রত্যেক বাহিনীতে, তার কি কোন হিসেব করেছ?

চে তার চিরাচরিত গাম্ভীর্য রক্ষা করে বলল, না। যে সব স্থান আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক, সেই সব স্থানে যে সংখ্যক লোকের প্রয়োজন আর যে সকল স্থান আমাদের পক্ষে উপযোগী কম, সে সব স্থানে জনসংখ্যার তারতম্য হবেই হবে। আমাদের কিউবা মুক্তি-যুদ্ধ যে ভাবে পরিচালনা করেছি, তার ধারা লক্ষ্য কর। ছোট ছোট দলপতি আমাদের ছিল না। আমাদের সবার ওপর ছিল একজন অধিনায়ক। আমরা কর্পোরাল সারজেণ্ট পদ তুলে দিয়েছিলাম। তেত্রিশ সালে ফুলগেনাসিও বাতিস্তা ক্ষমতা দখল করেছিল জেরারডো মাচাদোর কাছ থেকে বলপ্রয়োগে আর সেই বলপ্রয়োগে মুখ্য অংশ গ্রহণ করেছিল সারজেণ্টরা। সেজন্য সারজেণ্ট বা তৎস্থানীয় পদ আমরা সৃষ্টি হতে দিইনি। তবে আমাদের দল যত ছোট হবে, ততই কাজ করার সুবিধা হবে (to function in small groups makes the squad the true unit).

আমাদের এই নতুন কার্যক্রম পরিচালনার কি-কি ব্যবস্থা করেছ, তা একবার দেখে আসতে চাই।

তার আগে আমাকে জানতে হবে, যোগাযোগ রক্ষার জন্য তুমি লা-পাজ, কামিরি প্রভৃতি স্থানে কি-কি ব্যবস্থা করে এসেছ ?

তানিয়া হেসে বলল, নিশ্চিন্ত থাকতে পার। আমার ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি পাবে না কোন সময়েই। তবে স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বিধাগ্রস্ত। যারা আমাদের কাজ সমর্থন করেছে, তাদের একটি বৃহৎ অংশ ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে এসে গেছে, কিন্তু রয়েছে পেছনে আমাদের কাজ পরিচালনার জন্য। আর যারা আমাদের সমর্থক নয়, তারা গণতন্ত্রের বুলি শোনাচ্ছে।

কিন্তু লোরো খবর দিয়েছে মনজে আসছে এখানে।

তা হলে তো সব বিষয়ই ভাল ভাবে আলোচনা করা যাবে। জানা যাবে বলিভিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধানরূপে তার অভিমত কি।

বৎসরের শেষ দিনটিতে মনজে এল চে-র সঙ্গে দেখা করতে। তাদের আলোচনা চলল বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে।

মনজে বলল, তোমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হলে আমাকে পার্টির সেক্রেটারী পদ থেকে বিদায় নিতে হবে, তা হলে স্থানীয় পার্টি আমাদের কাজ সমর্থন না করলেও কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না। আমাদের যারা সহচর, তারা এই মুক্তিযুদ্ধে তখন বিনা বাধায় যোগ দিতে পারবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের সঙ্গে আসতে পারি, পার্টির কথা বলতে পারি না।

চে বলল, তুমি পার্টির সেক্রেটারী। তুমি সেক্রেটারী পদ ছাড়তে চাইলে আমার কিছু বলার নেই। এটা তোমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। তবে আমার মনে হয়, সেক্রেটারী থাকলে

তুমি যেভাবে কাজ করতে পারতে, সেক্রেটারীর পদ ছাড়লে আর সেভাবে কাজ করতে পারবে না। তোমার প্রভাব নষ্ট হলে আমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। তোমার পদত্যাগ বোধহয় ভুল হবে।

মনজে বলল, কিন্তু পার্টির সবাই তো একমত নয়। আর যদি আমরা জয়লাভ করতে না পারি, তা হলে পার্টির দিক থেকে ক্ষতি হবে। আমি সেক্রেটারী রয়েছি—এই অজুহাতে অত্যাচার চলবে। আমি পার্টির কেউ নই—এটা জানলেই অন্য সব কমরেডরা অত্যাচার থেকে বাঁচবে।

চে প্রতিবাদ করে বলল, আমাদের কেবল মাত্র মনজেকে দরকার নেই। গোটা পার্টির সহযোগিতা দরকার। যদি পার্টি ভেতরে ও বাইরে কাজ না করে, তা হলে একজন লোককে নিয়ে আমরা কি এই বিরাট কাজে এগোতে পারি! তা পারব না। তোমাকে যদি পার্টির সেক্রেটারীরূপে পাই, তা হলে গোটা পার্টি কাজ করবে। আমার মনে হয়, তোমার পদত্যাগ ভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। আমরা পিছিয়ে পড়ব।

তানিয়া আলোচনায় যোগ দিয়ে বলল, তোমার যুক্তি ঠিক নয় কমরেড মনজে। এ যুক্তি যেন মনে হচ্ছে সুবিধাবাদী অস্থিরচিত্ত ব্যক্তির যুক্তি। যারা প্রকৃত কম্যুনিষ্ট, তাদের পক্ষে মার্কসবাদ ভিন্ন অন্য কোন তথ্য স্বীকার করাই হল ভুল। আর মার্কসবাদ বাস্তব ঘটনা ও যুক্তির ভিত্তিতে মানতে প্রস্তুত। সেই মানসিক গঠন ও প্রস্তুতি তোমার নিশ্চয় আছে।

চে বলল, এসব বিষয়ে হঠাৎ কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়। কমরেড মনজে, তুমি আরও ভাল করে চিন্তা করে দেখবে। আমার মনে হয়, পদত্যাগের পথটা ঠিক নয়। অবশ্য কাজের ফল না দেখে কিছুই সঠিক বলা যায় না। তুমি ভেবে দেখ।

মনজে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বেশ। তবে দক্ষিণ

আমেরিকায় বিভিন্ন দেশে যে সব কম্যুনিষ্ট পার্টি আছে তাদের সহায়তা লাভের জন্য আমি যোগাযোগ করব।

অবশ্যই সে কাজ তুমি করতে পার। যত বেশি বিভিন্ন পার্টির সাহায্য আমরা পাই, ততই ভাল। তবে তুমি যদি কারও ওপর বেশি আস্থা পোষণ কর, তা হলে তুমি নিশ্চিত ভুল করবে। ভিন্ন রাষ্ট্রের পার্টির গঠনের দিকে নজর রেখে এসব করতে হবে। তবুও আমরা কোন রকম আপত্তি করব না।

মনজে খুশী মনেই বলল, তা হলে আমার শেষ সর্তটি শোন।

বল।

রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্ব থাকবে আমার হাতে। যতদিন বলিভিয়ার জমিতে মুক্তিযুদ্ধ চলবে, ততদিন আমিই রইব সুপ্রীম অথরিটি।

শুনেই চে চমকে উঠল।

তানিয়া প্রতিবাদ করে বলল, এই গুরুতর কাজে নেতৃত্ব লাভের আগে তোমাকে চিন্তা করতে হবে, নেতৃত্ব দেবার মত যোগ্যতা তোমার আছে কিনা। যোগ্যতা সৃষ্টি করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, সে অবস্থায় তুমি এসেছ কিনা, তাও ভেবে দেখ।

মনজে অসন্তুষ্ট হল। আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। বলল, এই কথার প্রতিবাদ করছি।

কিন্তু তুমি যদি নেতৃত্ব দেবার যোগ্য লোক হতে, তা হলে কি বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধ এত পিছিয়ে থাকত। এতদিন বলিভিয়ার মাটিতে মুক্তিসেনারা তাদের যোগ্য স্থান গড়ে নিতে পারত নিশ্চয়ই। তা যখন হয়নি, তখন তোমার যোগ্যতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক।

মনজে ক্রুদ্ধভাবে বলল, তোমাদের ইচ্ছা কি, তা বুঝতে পারছি না। আমাকে কি ধোপার গাধা মনে কর তোমরা?

সামরিক বিষয়ে তোমার ওপর মোটেই নির্ভর করতে পারি না।

বিশেষ করে গোরিলাযুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞানই নেই। সামরিক বিষয়ে তোমাকে নির্ভর করতে হবে সর্বতোভাবে চে-র ওপর। সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে তার হাতে।

মনজে চুপ করে গেল তানিয়ার কথা শুনে।

তানিয়া বলল, এসব বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। রাজনৈতিক বিষয়ে একটা কমিটি গঠন করে তার হাতেই সমস্ত ভার দেওয়া উচিত। অবশ্য তাতে তুমিও একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য বলেই বিবেচিত হবে।

মনজে বলল, তোমাদের বক্তব্য শুনলাম। আমি একাই এ বিষয়ে মত দেবার অধিকারী নই। আমাকে আমাদের পার্টির সঙ্গে কথা বলে তবেই মতামত জানাতে পারব। আশা করি এ বিষয়ে তোমাদের কোন আপত্তি নেই।

নিশ্চয়ই নেই। ব্যক্তির মতামতের ওপর কোন কাজ কখনও নির্ভর করে না, নির্ভর করে সমষ্টির ওপর। সমষ্টির মত নিয়ে কাজ করা আমাদেরও ধর্ম। বিশেষ করে নীতি নির্ধারণে আমাদের সেই কাজই করতে হয়, তুমিও করবে।

বক্তব্য শেষ করে তানিয়া উঠে গেল।

মনজে সে-রাতে চে-র সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ল।

সকাল বেলায় চে-র সঙ্গে কোন আলোচনা না করে হঠাৎ বলল, আমি সেক্রেটারী পদে ইস্তফা দেব।

আর কিছু কি তোমার বলার অথবা করার নেই ?

না। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

মনজে বিদায় নিল।

কোকো আসতেই চে তাকে জিজ্ঞেস করল, মনজেকে খুব সুবিধার মনে হল কি ?

না, তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তার গতি ও প্রকৃতিতে আমার সন্দেহ রয়েছে ডাক্তার। আমি তাকে বলেছি, গুরুতর ও

গোপনীয় বিষয়ে তাকে প্রবেশ করতে দেওয়া আমাদের স্বীকৃত নীতি নয়। আমরা তাদের সঙ্গেই সবকিছু আলোচনা করি অথবা আমাদের নীতি স্থির করি, যারা কাজ দিয়ে বুঝিয়ে দেয় তাদের ঐকান্তিকতা ও নিষ্ঠা। এ কথার পরই মনজের মেজাজ বদলে গেছে।

চে বলল, আমাদের যে সব কমরেড এখানে উপস্থিত আছে, তাদের সবাইকে আজ বিকালে এখানে ডেকে আনতে হবে। তাদের সামনে আমি মনজে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য পেশ করব। কমরেডদের মত আমাকে শুনতে হবে। ভবিষ্যতে কেউ হয়ত দোষারোপ করতে পারে। সেজন্য আমার বক্তব্য তাদের সামনে রাখা উচিত মনে করি।

কোকো তখনই খবর দিতে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের সামনে চে গতদিনের ঘটনা বিবৃত করল, মনজের বক্তব্যও পেশ করল। সব বলার পর জিজ্ঞেস করল, আমি যেভাবে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করেছি, তা কি অন্যায় হয়েছে ?

সবাই বলল, মোটেই না। আমরা মনজের অভিসন্ধি জানি না, দ্বিতীয়ত মুক্তিযোদ্ধারূপে মনজের ভূমিকা যে কি হবে, তাও জানি না। এরূপ ক্ষেত্রে তাকে গুরুতর ও গোপন বিষয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া চরম ভুল হবে। বিশেষ করে সামরিক বিষয়ে তার নেতৃত্ব কল্পনাও করা যায় না।

সভার শেষে চে তানিয়াকে ডেকে বলল, তোমাকে আরজেন-টিনায় যেতে হবে তানিয়া।

তোমার নির্দেশ পেলে নিশ্চয়ই যাব।

আরজেনটিনায় গিয়ে মাউরিসিও এবং জোঝামির সঙ্গে দেখা করবে। আমার কথা তাদের বলবে, আমি তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে উৎসুক। তাদের এখানে নিয়ে আসতে পারলেই ভাল হয়।

আশা করি, তুমি আমার সঙ্গে এখানে তাদের দেখা করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারবে।

চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না ডাক্তার।

চে কোকোকে বলল, তুমি সান্তাক্রুজ চলে যাও। সেখানে কারলোর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবে। হাভানা থেকে তিনজন সহকর্মী আসছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা যেন কারলোর ভাই করে। তাদের এখানে আসার ব্যবস্থাও যাতে হয়, সেদিকে নজর রাখতে বলবে। আর লোয়ালো, তোমাকে আর্থিক ব্যাপারের সব দায়িত্ব নিতে হবে। আশী হাজার পেসোস পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। এ থেকে বিশ হাজার পেসোস কানভিমন্টেকে দেবে একটা ট্রাক কিনতে। তুমি মিটো শুক্রেতে যাও। সেখানে উপযুক্ত স্থান দেখে আশ্রয় তৈরী করে নেবে। তারপর পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবে।

সবাইকে এইভাবে কাজ ভাগ করে দিয়ে সেদিনের সভা-শেষে চে কাগজ কলম নিয়ে বসল ফিদেল কাস্ত্রোকে তার কার্য-বিবরণী লিখে পাঠাতে।

চে চিন্তিত হল সহকর্মীদের মধ্যে পরস্পর কতকগুলো ঝগড়াঝাটি হতে দেখে।

একদিন রিকার্ডো এসে বলল, ইভান আমাকে অপমান করেছে।

চে বিস্মিতভাবে বলল, কেন?

জানি না। ম্যাদাম তানিয়া উপস্থিত ছিল। তার সামনেই ইভান আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে।

ইভান এসেও অভিযোগ করল, রিকার্ডো তাকে অপমান করেছে।

কেন?

ম্যাদাম তানিয়া সব জানে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

তানিয়া এখানে নেই। তোমাদের কথা তোমরা বলতে পার।

অকারণে আমাকে গালিগালাজ করেছে, এমন কি আমাকে জিপ থেকে নামিয়ে দিয়েছে।

চে গম্ভীরভাবে বলল, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করলে কি ফল হয় জান? These disagreeable incidents among the comrades are spoiling our work—সহকর্মীদের মধ্যে অশান্তি হলেই কাজ নষ্ট হয়। এ কথা তোমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে কি? মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে সবচেয়ে বড় নীতি হল শৃঙ্খলা মেনে চলা। আমাদের প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হলে পার্টির প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলাবোধ দৃঢ় হওয়া দরকার। যারা তা পারবে না, তারা পার্টিতে থাকার যোগ্য নয়।

তারপরই চে তার বিভিন্ন দলনেতাদের ডেকে আলোচনায় বসল। তাদের বুঝিয়ে বলল, আমাদের উদ্দেশ্য কি, তা তোমরা সবাই জান। আমরা যে আদর্শ স্থাপন করব, তাই মেনে চলবে আমাদের অনুরাগীরা। সেজন্য আমাদের চরিত্রকে তৈরী করতে হবে ইস্পাতের মত শক্ত। আশা করি, তোমরা তা করবে। নিজেদের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি যাতে না হয়, সেদিকে বেশি নজর দেবে। বর্তমানে আমাদের বাসপোযোগী করে নিরাপদ আশ্রয় তৈরী করে নেওয়া হল কর্তব্য। পানীয় জলের ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, রসদ জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা, স্থানান্তরে চলাচল করার জন্য ঘোড়া অথবা অন্য কোন জন্তু রাখার ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য তোমরা সচেষ্ট হও। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ী ঝরণা আছে। চলাচলের জন্য এইসব ঝরণার ওপরে সাঁকো তৈরী করার ব্যবস্থাও করবে।

সে-রাতে চে তার সহকর্মীদের জন্যে নির্দেশ লিখল: আমাদের সৈন্যবাহিনীর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হল খাবার। আর সেই

খাবার সবাইকে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। কে বড়, কে ছোট— এই বিবেচনায় খাদ্যের কোনরূপ তারতম্য করা যেন না হয়। সাধারণত আমাদের খাবারের স্বল্পতা থাকবেই কিন্তু অন্য কিছু থাকুক বা না থাকুক, খাবার হল নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। যাদের বিচারবুদ্ধি আছে, তারা কোন সময় একজন অপরজনকে বঞ্চিত করে বেশি আহার্য গ্রহণ করতে চাইবে না এবং যাতে কোন রকম তারতম্য না হয়, তার দিকে সবাই নজর রাখবে।

খাবার যা দেওয়া হবে তার পরিমাণ ও খাদ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধেও সজাগ থাকতে হবে, প্রয়োজন মত তা পরীক্ষা করতে হবে।

এর পরই পরিধেয় সমস্যা। পরিধেয় হল ব্যক্তিগত ব্যবহারের বস্তু। আমাদের যে পরিমাণ পরিধেয় থাকবে, প্রয়োজন থাকবে তার চেয়ে অনেক বেশি। সেজন্য মুক্তিবাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের কার্যকাল ও উৎকর্ষতা বিচার করে পরিধেয় দেওয়া হবে। অবশ্য কার্যকাল ও উৎকর্ষতা বিচার করা খুবই কঠিন। সেজন্য যে পরিধেয় দেবার দায়িত্ব নেবে, তাকেই বিশেষ বিবেচনা করে কাজ করতে হবে।

অন্যান্য দ্রব্য দেবার সময়ও কাউকে বেশি, কাউকে কম দেবার চেয়ে একটি সাধারণ নিয়ম ও নীতি মেনে চলতে হবে। এমন কি তামাক, চুরুট প্রভৃতিও সবাইকে সমান হারে সাধারণ নিয়ম ও নীতি অনুসারে দেওয়া হবে। একজন বেশি অথবা একজন কম যেন না পায়।

এই সব বণ্টন-ব্যবস্থা খুবই দায়িত্বপূর্ণ। যার ওপর এই দায়িত্ব থাকবে, সে সেনাবাহিনীর প্রধানের নির্দেশমত চলবে। যারা দলের অধ্যক্ষ তাদের বেশি দায়িত্ব এবং তাদের বেশি ভারবহন করতে হবে সাধারণ সৈনিকের চেয়ে। অধ্যক্ষকে অন্য যে কোন সুবিধাই দেওয়া হোক না কেন, খাদ্য বিষয়ে তারা সমান অংশীদার হবে সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে।

লেখা শেষ করে চে কম্বলে গা এলিয়ে দিল।

পরদিন থেকে রাস্তাঘাট, ভৌগলিক অবস্থান, বনপথে চলা, পাহাড়ে ওঠা—এই সবের ট্রেনিং আরম্ভ হল। আত্মরক্ষার সকল ব্যবস্থায় নজর দিয়ে চে কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

ইতিমধ্যে সংবাদ পেল মারকোস ক্ষুব্ধ হয়েছে।

জ্যাকুইন বলল, মারকোসের সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত মেজর সাহেব।

বেশ, আমিই বলব। মারকোসকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে।

মারকোস আসতেই চে বলল, শুনলাম তুমি নাকি ক্ষুব্ধ হয়েছ?

কে বলল?

তাতে দরকার কি। তবে ক্ষোভ জানাবার সময় এখনও হয়নি বন্ধু।

আমাকে কিছু যদি তোমার বলার থাকে, তা হলে আমাকে গোপনে ডেকে বলবে ডাক্তার। তুমি বলিভিয়ানদের সামনে আমার কাজের সমালোচনা করেছ। তাদের চোখে আমি কতটা ছোট হয়ে গেছি, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো। এতে দুঃখিত হওয়া কি আশ্চর্য? আমি সত্যিই ক্ষুব্ধ ডাক্তার।

তুমি যা বলছ, তার কোন যুক্তি নেই মারকোস। আমার সহকর্মীরা সবাই সমান। কেউ ভুল করলে তার সমালোচনা করার অধিকার সবার আছে, এমন কি আমি ভুল করলেও। এতে তোমার অভিমান জন্মাতে পারে কিন্তু তা তো আমাদের পক্ষে সাজে না। অভিমানকে আমি সম্মান করি, কিন্তু অযৌক্তিক কাজকে আমি সমর্থন করি না।

তুমি জান, য়্যালেজান্দ্রো আমার সম্বন্ধে অশালীন মন্তব্য করেছে?

চে বলল, তুমি সব কিছুকে গুরুত্ব দাও কেন? কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ কিছু বলেনি, এমন কি আমিও বলিনি। সেজন্য দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। তুমি যদি কদর্থ কর, তার জন্য তোমারই মনে দুঃখ হবে। আমাদের ওপর ক্ষুব্ধ কেন হবে? কথা মাত্রেই মূল্যবান হয় না। ছোট জিনিষকে বেশি মূল্য দিলে, তা হয় অশান্তির কারণ।

মারকোস যেন বুঝতে পারল তার ভুল। চুপ করে বসে রইল।

চে বলল, মন পরিষ্কার করে নিজের কাজ করে যাও মারকোস। আমরা যে কী ভীষণ পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তা তুমি নিশ্চয়ই জান। এই বিপদকে মাথায় নিয়ে মান অভিমান করার সময় আমাদের নেই। আমরা সৈনিক, আমাদের কাজ হল—করা অথবা মরা। এর বেশি আমরা জানি না।

এর পরই মারকোস তার সঙ্গীদের নিয়ে চলে গেল নিজেদের আশ্রয় তৈরী করতে। তার সঙ্গীদের মধ্যে পেছনে রয়ে গেল বেনিগলো। মারকোস তার সঙ্গীদের নিয়ে দুপুরেই ফিরে এল ঘাঁটিতে। অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য তারা অগ্রসর হতে পারেনি।

জ্যাকুইন তখন ট্রেনচ্ কাটতে ব্যস্ত। চে বেরিয়ে গেল লোরো, ইনতি, উরবানোকে নিয়ে রাস্তা তৈরী করতে। কিন্তু অত্যাধিক বৃষ্টিপাতের জন্য কোন রকম কাজই সেদিন আর করা গেল না। সবাই ফিরে এল ঘাঁটিতে।

চে জ্যাকুইনকে বলল, শহরের সঙ্গে ক্রমেই আমরা যোগাযোগ ছিন্ন হতে চলেছি। যারা শহরে আছে, তাদের কাছে আমাদের নির্দেশ পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

তুমি লিখে দাও মেজর সাহেব। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। শহরের কমরেডরা মনে হচ্ছে ক্রমেই ঝিমিয়ে পড়ছে। তাদের রক্ত চলাচল কি বন্ধ হয়ে গেছে!

তাই তো! বেশ, আমি লিখছি, তুমি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর।

চে তার হাতে চিঠি দিয়ে নিভৃতে কাগজ কলম নিয়ে বসল। সেদিন কোন কাজ ছিল না। সঙ্গীরাও বিশ্রাম নিচ্ছে। এই অবসরে চে লিখল নিজের কথা :

আটাশ সালের চোদ্দই জুন আমার জন্ম। জন্মস্থান রোসারিও। আরজেনটিনার বেশ বড় শহর এই রোসারিও।

লিখতে লিখতে য়্যালাইদার কথা মনে পড়ল। য়্যালাইদা থাকলে সে-ই লিখতে পারত তার জীবন-কাহিনী। চে মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ ভাবল। তখনই মনে পড়ল বিপ্লবের যারা নেতা তাদের জন্য There is no life outside revolution—বিপ্লব ভিন্ন অন্য কোন জীবন নেই তাদের। তবুও অতীতের কথা মনে পড়ে মাঝে মাঝে। তাই কলম হাতে তুলে নিয়ে তার লিখতে ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে। চে আবার লিখল : আমার বাবা আরনেসতো গুয়েভারা লিঞ্চ ছিলেন স্থপতি, মা সিনিয়া দ্য লা সেরনা ছিলেন আইরিশ ও স্প্যানিশের মিশ্রিত বংশোদ্ভূত।

ছোট বেলা থেকে হাঁপানীর রুগী আমি। আমার বয়স যখন দু'বছর, তখন থেকেই হাঁপানী আমাকে কাবু করে রেখেছিল। কোন রকমেই আমার হাঁপানী যখন আরাম করা গেল না, তখন আমার বাবা-মা আমাকে নিয়ে বুয়োনেস আয়ারে যাওয়া স্থির করলেন।

আমার হাঁপানী বেশি কষ্ট দিত আমার বাবাকে। সারা রাত বাবা জেগে থাকতেন। আমার বুকে হাত বুলিয়ে দিতেন। আমি বাবার বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকতাম। চিকিৎসকরা শেষপর্যন্ত অভিমত দিল, এই রোগের কোন উপশম হতে পারে না, সেজন্য স্থান পরিবর্তনই একমাত্র পথ।

চিকিৎসকের অভিমত অনুসারে বাবা-মা আমাকে নিয়ে এলেন করডোবা শহরে। এখানে আমার স্বাস্থ্যের কিছুটা উন্নতি ঘটল। আমাকে নিয়ে বাবা-মা নানা স্থান পরিভ্রমণ করে শেষপর্যন্ত আলতা গ্র্যাসিয়াতে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।

আমার বয়স তখন আট বছর। বাড়িতে বসেই সামান্য লেখাপড়া শিখছি। হঠাৎ আমার মায়ের কাছে চিঠি এল শিক্ষা বিভাগ থেকে: তোমার ছেলের বয়স আট বৎসর অথচ আজও তাকে স্কুলে পাঠাও নি। এ দেশের আইন অনুসারে শিশুকে লেখাপড়া শেখান বাধ্যতামূলক। তুমি তোমার ছেলেকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাও।

চিঠি পেয়ে মা খুব খুশী হলেন। মা তখুনি চিঠি দিলেন: আমার ছেলে বাড়িতেই পড়াশোনা করছে। কঠিন হাঁপানী রোগে ভুগছে সে। তাকে স্কুলে পাঠান সম্ভব হচ্ছে না।

অবশ্য আমাকে পাঠান হয়েছিল বিদ্যালয়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে নিয়মিত যাতায়াত করেছি কিন্তু পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় নিয়মিত যেতে পারতাম না। আমার ছোট ভাই বোনেরা আমার পড়াগুলো লিখে দিত।

আমাকে যেতে হল হাইস্কুলে। করডোবায় যেতে হত রোজ। মা ছোট একটা গাড়িতে করে আমাকে অন্য সবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন স্কুলে।

আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ছিল স্বচ্ছল। আমরা সম্ভ্রান্ত পল্লীতে বাস করতাম। হঠাৎ আমাদের আর্থিক বিপর্যয় ঘটল। আমার মায়ের যে খামার বাড়ি ছিল শহরের উপকণ্ঠে, তা বিক্রি করে দিতে হল। আমরা আলতা গ্র্যাসিয়া থেকে করডোবা শহরে এসে বাড়ি নিলাম।

আমাদের সংসার চলত কায়ক্লেশে। প্রয়োজনীয় ব্যয় করার মত অবস্থা আমাদের ছিল না। আমি স্কুলে পড়ার সময়ই চিন্তা করেছি কি করে অর্থোপার্জন করা যায়।

আমি কৈশোর অতিক্রম করেছি, স্বাধীনভাবে চলাচল করতে অভ্যস্ত, সব সময় সতর্কভাবে চলি। আমার আকর্ষণ শুধু বই। আর আমি যা করতাম, তা নিষ্ঠার সঙ্গে ও স্থিরবিশ্বাস নিয়ে করতাম।

প্রথমেই আমি আমার রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলাম। ব্যায়াম খেলাধূলা করে দেহটাকে মজবুত করতে সচেষ্ট হলাম। আমার ভাই রোবারটো, আরও কয়েকজন আমার সঙ্গী। এ বাদেও আমার অপর দুই বোন ও এক ভাই ছিল। তাদের সঙ্গেও দৌড়াদৌড়ি খেলাধূলা করতাম। আমার বোন সেলিয়া, মারিয়া এবং ভাই মার্টিন বয়সে অনেক ছোট হলেও তারা আমার সঙ্গ পেলে খুব খুশী হত।

এই খেলাধূলার মাঝ দিয়েই দেহকে মজবুত করেছিলাম, রোগকে দমন করেছিলাম। মাঝে মাঝে হাঁপানীর উৎপাত আরম্ভ হলে খোলা আলো বাতাসে ঘুরে বেড়াতাম।

একচল্লিশ সালে পাঠ্যাবস্থায় একজন বন্ধুকে পেয়েছিলাম অতি অন্তরঙ্গভাবে। এই বন্ধু গ্র্যানাডোস ছিল বাইওকেমিষ্ট্রির ছাত্র। অনেক দুঃসাহসিক কাজ করতে আমরা দুজন এগিয়েছি। সে কথা পরে বলব।

অঙ্কশাস্ত্রে আমার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। আমার বন্ধুরা বলত, তুই ইনজিনিয়ারিং পড়বি। আমি তাদের আশ্চর্য করে ডাক্তারী পড়তে গেলাম। ডাক্তার হবার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছিলেন আমার বাবা। তিনি চেয়েছেন, আমার মত রুগ্নদেহী নিজের রোগকে যদি শায়েস্তা করতে চায়, তা হলে ডাক্তার হওয়াই হল সব চেয়ে বড় কাজ। আমিও ভাবলাম, দেশের যদি সেবা করতে হয়, তা হলে চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্তে আনা উচিত। এতে যেমন জনসেবার সুযোগ আছে, তেমনি আছে অর্থ উপার্জনের সুযোগ।

আমার মনে ছিল দেশ ভ্রমণের প্রবল নেশা। আরও জানব, আরও দেখব, আরও লিখব—এই ছিল আমার মনের ইচ্ছা। আমি দেশের উত্তর-দক্ষিণে ঘুরে বেড়িয়েছি কুষ্ঠরোগী ও ট্রপিক্যাল রোগের চিকিৎসা বিষয় জ্ঞানলাভ করতে। এই সময় আমার কোন যান বাহনের দরকার হয়নি। আমার একটা সাইকেল ছিল। সেই সাইকেল চড়েই চারদিকে ঘুরে বেড়াতাম।

একান্ন সালের ডিসেম্বরে গ্র্যানাডোসের সঙ্গে পরামর্শ করলাম গোটা মহাদেশ বেড়াবার। গ্র্যানাডোস কেমিস্ট, আমি ডাক্তার। আমাদের পক্ষে কি ভাবে যাওয়া উচিত, তা নিয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণার পর স্থির হল, আমরা মোটর-সাইকেলে মহাদেশ পরিক্রমায় বের হব।

তারপর দিন স্থির করে উনত্রিশে ডিসেম্বর দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমাদের কারও পকেটে যথেষ্ট পয়সা ছিল না। পথ চলতে যে অর্থের প্রয়োজন, তার জন্য আমরা মোটেই চিন্তা করিনি। যখন পয়সা ফুরিয়ে গেল, তখন দুই বন্ধুতে কাজে নেমে পড়লাম। কখনও চাকরের কাজ, কখনও কুলির কাজ, কখনও নাবিকের কাজ, কখনও ডাক্তারের কাজ, আবার কখনও হোটেলে বাসন মাজার কাজ করে অর্থ সংগ্রহ করতাম। আমাদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী রসায়নবিদ, আরেক জন কিছুকালের মধ্যে চিকিৎসা বিদ্যায় ডিগ্রীলাভ করবে—এসব কথা ভুলে গেলাম দুজনেই। আমরা অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে দিলাম—"This gave us an opportunity to know people"—মানুষকে জানার সুযোগ পেলাম এইভাবে কাজ করতে করতে। যদি এই সুযোগ না পেতাম, তা হলে মানুষের দুঃখ বুঝতে পারতাম না কোনমতেই।

অবশেষে আমরা পেরুতে পৌঁছলাম।

আমাদের সমস্যা তখন অনেক। আমাদের আইনানুগ ছাড়পত্র ছিল না, টাকা ছিল না, প্রতিদিনকার নানা প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব ছিল। এই সব নিয়েই চলছিলাম। শেষপর্যন্ত গ্র্যানাডোস ফুটবল কোচ হয়ে খেলা শেখাতে আরম্ভ করল। তা থেকে অর্থ উপার্জন করে আবার ফিরে এলাম স্বদেশে।

এরপরই চাঁদা তুলে আমরা ভেনেজুয়েলা গেলাম। আমি চুপ করে মালবাহী বিমানে মার্কিন মুলুকের মিয়ামি ঘুরেও এলাম।

আমার পয়সা ছিল না। কি করে দিন চলবে ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। শেষে দুধ আর কফি খেয়ে দিন কাটাতাম। নইলে ফিরতি ভাড়ার পয়সা হয়ত থাকত না।

আবার ফিরে এসে ঠিক করলাম এবার সামরিক বাহিনীতে যোগ দেব। কিন্তু তারা আমাকে মোটেই গ্রহণ করল না। বলল, ডাক্তারী পাশ করে এলে চাকরি দেব।

মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তার হয়ে বের হলাম তিপান্ন সালে। আমার বয়স তখন পঁচিশ বছর। ছাত্রজীবন থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রচণ্ড ক্ষমতা ছিল আমার। আমার বন্ধুরা প্রায়ই বলত, অপরের কাজে নাক গলিয়ে কি লাভ ? তার চেয়ে শান্তশিষ্ট ছেলের মত লেখাপড়া শেখাই ভাল।

শান্তশিষ্ট কোন দিনই আমি হতে পারিনি।

আমার কানে এসে পৌঁছত লাতিন আমেরিকার ইনডিয়ানদের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ঘটনাবলী। আমি স্থির করলাম, এদের মধ্যেই কাজ করতে হবে আমাকে। আমি একদিন পয়সাকড়ি না নিয়েই ট্রেনে চেপে বসলাম। বুয়োনেস আয়ার ত্যাগ করে কারা-কাসে যাওয়া স্থির করেছিলাম। গ্র্যানাডোসের সঙ্গে মিলিত হয়ে কুষ্ঠরোগীদের সেবা করার ইচ্ছা ছিল মনে। ইকোয়াডোরে এসে আইনজীবী রিকার্ডো রোজের সঙ্গে পরিচয় হল। পয়িচয় ক্রমেই বন্ধুত্বের স্থষ্টি করল। রোজ বলল, কাজ করার উপযুক্ত স্থান গুয়েতেমালা। মানবসেবা ও মানবতার সেবা করার জন্য তোমার মত লোকের গুয়েতেমালা যাওয়াই উচিত।

আমিও মত বদলে ইকোয়াডোর থেকে গুয়েতেমালায় হাজির হলাম।

গুয়েতেমালায় তখন বড়ই হাঙ্গামা। প্রেসিডেণ্ট আরবানজের বিরুদ্ধে মার্কিন আক্রমণ চলছে। আমিও হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়লাম। শেষপর্যন্ত পালিয়ে যেতে হল মেকসিকোতে। এখানেই

আমার সঙ্গে পরিচয় হল ফিদেল কাস্ত্রোর। জীবনের গতি গেল বদলে। আমি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ শোষকদের হাত থেকে মানবজাতিকে মুক্ত করার শপথ নিলাম। এতদিন এক বা দুই বা চার জন রুগীর চিন্তা করেছি, দুনিয়াব্যাপী যে রুগী রয়েছে তাদের কথা মনেও পড়েনি। আমি বিশ্বের রুগ্ন মানবতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করলাম। গ্রামনা জাহাজে সোয়ারী হয়ে এলাম কিউবাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে।

তারপর বহু বৎসর কেটে গেছে। কিউবা মুক্ত হয়েছে। পেয়েছি অনেক কিছু, কিন্তু পরিতৃপ্তি নেই। আমার কানে বাজছে সময়ে অসময়ে মানুষের ক্রন্দন। সেই ক্রন্দন যাতে নিশ্চুপ হয়, তার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি। আমি বিপ্লব চাই। আমি বিপ্লবী, আমার ধর্ম হল, I am not after present to hear my children's first hesitant words, my wife must also share in my sacrifice of the revolution, is to reach its goal, my friends are to be found only among my comrades in revolution—আমি সন্তানের পিতা, স্ত্রীর স্বামী, সহকর্মীর বন্ধু, কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বিপ্লব আমার ধর্ম। তার সঙ্গে যার সংযোগ নেই সে আমার কেউ নয়।

লেখা বন্ধ করে চে ভাবতে থাকে। কোথায় যেন বিরাট ফাঁক থেকে গেছে। শূন্যস্থান পূর্ণ করার দায়িত্ব নিতে হবে।

সংবাদ এল : মিগুল জ্বরে বেহুঁস।

ম্যালেরিয়া। মশার কামড়ে পীড়িত হচ্ছে সহকর্মীরা। চে চিন্তিত হল।

আবার সংবাদ এল : আরগানারাজ ও এল-ভেলাগ্র্যাণ্ডিলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

চে ডাকল য়ালিসেটোকে।

আরগানারাজের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে তুমি। সন্দেহ হচ্ছে এই ব্যক্তিটি আমাদের সর্বনাশ করতে শত্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

য়ালিসেটো আদেশ পেয়েই নিজের কাজে গেল।

পেড্রোর সঙ্গে কোকো এল।

কি সংবাদ কোকো ?

মোটামুটি ভাল।

আমি ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় শত্রুদের খপ্পরে পড়েছ। মনজে কি বলল জানো ?

আমি জানি না, তবে শুনেছি। মনজে সহকর্মীদের গোরিলা-যুদ্ধে যোগ দিতে নিষেধ করেছে। পার্টি সেক্রেটারীর পদেও সে ইস্তফা দেয়নি।

চে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, আমার এ রকমই আশঙ্কা ছিল। শেষ অবধি মনজে আমাদের শত্রুতা করতে পারে, সে আশঙ্কাও নেহাত কম নয়।

তানিয়ার একটি চিঠি আছে মেজর।

দাও।

চে চিঠি খুলে পড়তে থাকে। তানিয়া লিখেছে :

প্রিয় ডাক্তার, আমি নিরাপদে এসেছি, গন্তব্য স্থলে পৌঁছেছি। ইভান গুরুতর অসুস্থ। তাকে নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। তার একখানা চিঠি দিলাম। তোমার নির্দেশমত যোগাযোগ করেছি। রসদ ও অস্ত্রের জন্যও চেষ্টা করছি। আশা করি, সাফল্যলাভ করব। মনজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী নয়। সে সহকর্মীদের বলছে, গোরিলা যুদ্ধ মানেই ডাকাতি। ডাকাতি করে কোনদিন জনমুক্তি সম্ভব নয়। তাদের নিষেধ করছে এই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকার সময় উপস্থিত।—তানিয়া।

চে সব সহকর্মীদের ডেকে সভা করল সেই রাতেই। তাদের মতামত জানতে চাইল। সামনে যুদ্ধ। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। সেজন্য সবার মত না নিয়ে এই গুরুতর কাজে হাত দেবার সে পক্ষপাতী নয়। অবশ্য সব সহকর্মীই তার মত সমর্থন করল। সেদিন যে নতুন তিনজন এসে দলে যোগ দিয়েছে তারাও পূর্ণ সমর্থন জানাল। তাদের মধ্যে কৃষক সন্তান এবং দলের সর্বকনিষ্ঠ ওয়ালটার জোর দিয়ে কাজে নেমে পড়তে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বলিভিয়ানদের নেতা গুয়েভারা আর নেত্রী লোয়োলা এসে যোগ দিল চে-র কাজে। চে সর্বাগ্রে কতকগুলো সর্ত আরোপ করল। সহযোগিতা করার আগে সেগুলো স্থির করার জন্য অনুরোধ জানাল।

দল ভাঙাতে পারবে না। যেমন এখন আমাদের দল উপদল অর্থাৎ ফৌজি বিভাগ আছে, তাকে বজায় রেখে কাজ করতে হবে।

লোয়োলা বলল, অবশ্যই তা করব।

দলে কোন শ্রেণী থাকবে না। সবাইকে সমান মনে করতে হবে। যার যা কাজ সে সেই কাজ করবে।

আমাদের কোন আপত্তি নেই।

দলে বর্তমান কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার বন্ধ থাকবে। মুক্তিযোদ্ধারা শুধু মুক্তির জন্যই লড়াই করবে, দলীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তোমরা অবশ্যই এ কাজ থেকে বিরত থাকবে।

আমরা তোমার সঙ্গে একমত।

আমাদের কাজ কোন বিশেষ জাতির জন্য নয়। জনমুক্তি সবার জন্য। সেজন্য কে কিউবার, কে বলিভিয়ার, কে আর্জেনটিনার—এ নিয়ে কোন রকম আলাপ-আলোচনা করা চলবে না। অর্থাৎ সম্প্রদায় শ্রেণী জাতি নিয়ে কোন আলোচনা চলবে না।

এতেও আমরা রাজি।

লোয়োলাকে মনে হল খুবই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না মহিলা। তার কথা থেকে চে-র মনে হল মেয়েটি বৈপ্লবিক কাজের উপযোগী। অল্পবয়সী ভদ্রমহিলাটি তার কাজকে যে ভাবে গ্রহণ করল তাতে স্বতঃই চে-র মনে হল, এরকম শক্ত মেয়ে না হলে তাদের কাজে অনেক অসুবিধা দেখা দিত। বলিভিয়ার যুব-আন্দোলনের সঙ্গে লোয়োলা যুক্ত কিন্তু তাকে যুব-আন্দোলনের নেতারা পছন্দ করছে না। তাকে দল থেকে বের করে দেবার জন্য চেষ্টা করছে। তাকে ইস্তফা-পত্র দেবার জন্য পীড়াপীড়িও করছে।

কারণ লোয়োলার বৈপ্লবিক মতবাদ। এই মতকে ওরা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না।

সহকর্মীরা এসে বলল, টাকার বড় অভাব।

চে চিন্তিতভাবে বলল, তাই তো। টাকা বাইরে থেকে তো আসছে না। বর্তমানে টাকার সমস্যা সমাধান করতে হলে আমাদের একটা জিপ বিক্রি করতে হবে।

কোকোকে বল, একটা জিপ বিক্রি করতে।

কোকো বলল, এতে আমাদের কাজের অসুবিধা হবে মেজর।

তার জন্য সব রকম ব্যবস্থা তোমাকেই রাখতে হবে কোকো। যোগাযোগের যাতে অসুবিধা না হয় তার বিকল্প ব্যবস্থা না করলেই নয়। সে সব পরে ঠিক হবে, কিন্তু জিপ বিক্রি না করে উপায় নেই। টাকা না থাকলে এতগুলো লোকের রসদ কোথায় পাবে ?

কোকো মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

চে তার ডায়েরীতে লিখল, "As to be expected Monje's attitude was evasive at first and latter on treacherous."

বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি আমাদের বিরোধী। তারাই আমাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস মনজের বর্তমান ভূমিকা আমাদের উপকারই করবে।

তানিয়ার কাছ থেকে কোন সংবাদ না আসতে চে চিন্তিত। আরজেনটিনা থেকেও কোন সংবাদ আসছে না। ইতিমধ্যে বলিভিয়ার বহু যুবক আসতে আরম্ভ করছে। তাদের যথোপযুক্ত ট্রেনিং দেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে বলিভিয়ার যুবকরা এগিয়ে এসেছে দেখে চে খুবই খুশী। চে অপেক্ষা করছে 'জিরো' আওয়ারের।

চে মোটেই শান্তিতে ছিল না। কজন কমরেড মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। বিশেষ করে পাচো আর মারকো কেউ কাউকে সহ্য করত না।

পাচো এসে অভিযোগ করল, মারকো অপমান করেছে, তার মুখে বন্দুকের কুঁদো দিয়ে আঘাত করেছে।

চে গম্ভীর হয়ে গেল আভ্যন্তরীণ এই অশান্তির ঘটনা শুনে।

মারকোকে ডেকে পাঠাল। বলল, পাচোর অভিযোগ কি সত্য ?

মারকো কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝলাম। তোমাদের অনেকবার বলেছি আমাদের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা না থাকলে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য কখনই আসবে না। তোমাদের এই আচরণ খুবই আপত্তিজনক।

পাচো আমাকে অপমানজনক কথা না বললে নিশ্চয়ই তাকে আঘাত করতাম না।

কিন্তু আইন নিজের হাতে কেন তুলে নিয়েছিলে বলতে পার ? আমরা চাই না এভাবে একজন আরেকজনকে অপমান করবে অথবা একজন আরেকজনকে আঘাত করবে। মারকো, তোমার অপরাধ গুরুতর। আর পাচো, তুমিও একেবারে নির্দোষ নও।

সহকর্মী আরও কজনকে সামনে ডেকে চে বলল, এদের এই অপরাধ গুরুতর। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি করার মত লজ্জাজনক ঘটনা আর কিছু নেই। এদের আচরণ মোটেই

মুক্তিযোদ্ধাদের মত নয়। শৃঙ্খলা ও আনুগত্য না থাকলে কোন কাজেই সাফল্যলাভ করতে পারা যায় না—এ তো তোমরা জান। এ রকম ঘটনার জন্য কমবেশি দুজনকেই আমি দায়ী করছি। বন্ধুগণ, এবার তোমাদের বিচার কি তাই বল ?

মিগুয়েল ও লোরো সমস্বরে বলল, মারকোই অধিক দোষী।

এর প্রতিবিধান কি ?

দল থেকে বহিষ্কার।

লোরো বলল, সরাসরি বিচার না করে এদের অনুতপ্ত হবার সময় দিলে ভাল হয় মেজর। এদের সাবধান করে দেওয়া হোক। ভবিষ্যতে এরকম হলে নিশ্চয়ই মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে এদের নাম কেটে বিদায় করে দেওয়া হবে।

লোরোকে সমর্থন করে চে উভয়কেই সাবধান করে বিদায় দিল।

কারলোস বলল, বলিভিয়ান কমরেডদের মতামত ভালো করে জেনে নেওয়া উচিত মনে করছি মেজর।

ঠিকই বলেছ। তাদের সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। তাদের ডেকে পাঠাও।

কারলোস বলিভিয়ান কমরেডদের ডেকে আনতেই চে বলল, বন্ধুগণ, আমরা বর্তমানে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের জীবন দিয়ে দেশের ঋণ শোধ করার সময় উপস্থিত। তোমাদের কারও মনে কোন রকম দুর্বলতা থাকলে আমাকে বলতে পার। যদি তোমরা এই কঠিন কাজে আসতে ভয় পাও, তাও বলতে পার। আমাদের শোবার জায়গা নেই, খাবার নেই, অস্ত্র নেই, বলতে গেলে কিছুই নেই অথচ আমরা চলেছি শক্তিমান শত্রুর মোকাবিলা করতে। কতটা সাফল্যলাভ করব, তা বলতে পারি না। তবে এই কষ্ট সহ্য আমাদের করতে হবে। তোমাদের যদি এই কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা না থাকে, তা হলে আমাকে বলতে পার নির্ভয়ে। আমি তোমাদের ফিরে যেতে দেব।

প্যাপীও বলল, যা তুমি বলছ তার বেশি আর কিছুর ভয় দেখালে না তো।

মৃত্যু !

মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি। দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুকে স্বীকার করেই আমরা মুক্তিযুদ্ধে এসেছি। যে মৃত্যুকে ভয় করে না, সেই অন্য কোন কিছুরই ভয় করে না। আমাদের এ বিষয়ে কোন দুর্বলতা নেই।

বেশ তা হলে তোমরা প্রস্তুত থেক।

চে তার সঙ্গীদের নিয়ে রিও গ্রাঁনদে নদীর কিনারায় হাজির হল। পাহাড়ের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেনজামিন পেছনে রয়ে গেল। তার দেহ দুর্বল, ঠিক ভাল চলতে পারছিল না সে। চলতে চলতে তার পা কাঁপছিল। বার বার তাকে সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও সে ঠিকভাবে চলতে পারছিল না।

নদীতে প্রবল স্রোত। দুপাশে উঁচু পাহাড়ী বনভূমি। চলার পথ নেই বললেই হয়।

বেনজামিনের গলার শব্দ শুনে সবাই পেছন ফিরে দেখল। বেনজামিন নদীর জলে পড়ে গেছে। নদীতে প্রচণ্ড স্রোত। সেই স্রোতের টানে ভেসে চলল বেনজামিন। বার বার চেষ্টা করছিল সে বাঁচতে কিন্তু কোন রকমেই সে সামলাতে পারছিল না। বেনজামিন সাঁতার জানত না। সেজন্য তার বাঁচার চেষ্টা নিষ্ফল হল। রোলাণ্ডো লাফিয়ে পড়ল জলে তাকে বাঁচাতে কিন্তু কোথায় অতলে তখন বেনজামিন অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। চে-র এই অভিযানে প্রথম প্রাণ উৎসর্গ করল বেনজামিন নদীর জলে। রিও গ্রাঁনদে নদীতে প্রথম চে-র সঙ্গী প্রাণ হারাল। বলিভিয়ান মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ বেনজামিন।

সেদিনের যাত্রা বন্ধ করে সবাই ফিরে গেল ক্যাম্পে।

রাতের বেলায় ক্যাম্পে বসেছিল চে একাকী। ধীরে ধীরে গনজালেস এসে দাঁড়াল।

কি খবর কমরেড ?

কয়েকটা বিষয় জানতে চাই। আমরা কার বিরুদ্ধে লড়াই করব ? আর কেন করব ?

বলিভিয়ার মুক্তির জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব। শ্রেণীহীন সমাজে সর্বহারার একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আমরা চাই।

বলিভিয়ার প্রশাসকরাও সেই কথাই বলছে।

ওটা ওদের স্বভাব। তোমরা নিশ্চয়ই বেলজিয়ামের নাম শুনেছ। বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্মান যখন বেনজিয়াম আক্রমণ করেছিল তখন দেশপ্রেমিক বেলজিয়ামরা জার্মানকে প্রতিরোধ করতে দলে দলে প্রাণ দিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের পর বেলজিয়াম তার উপনিবেশ কংগোতে যে বর্বর অত্যাচার করছে তার তুলনা হয় না। যারা স্বদেশপ্রেমের ধ্বজা তুলে ধরেছিল, তারাই উপনিবেশের স্বদেশ-প্রেমীদের হত্যা করছে। তাই বলছি এটা ওদের স্বভাব। কিউবার পক্ষ থেকে আমি ছিলাম রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধি। বেলজিয়াম-কংগো সমস্যা নিয়ে আমি যা বলেছিলাম, তা হল ঐতিহাসিক ঘটনা। পাশ্চাত্য সভ্যতা যে কত নিকৃষ্ট তার পরিচয় কংগোতে পাবে বন্ধু। এরা দানব সাম্রাজ্যবাদী। আমরা এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে চাই জনতার মুক্তির জন্য। আশা করি তুমি আমাদের উদ্দেশ্যে বুঝতে পেরেছ।

গনজালেস চুপ করে বসে শুনছিল চে-র কথা। কথা শেষ হতেই বলল, কমরেড তোমার কথা তো বুঝলাম কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধে তো বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টি মোটেই অংশ গ্রহণ করছে না। এতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বিঘ্ন হবে না কি ?

বিঘ্ন যে হবে না এমন নয়। আমরা চেষ্টা করছি মনজেকে স্বমতে আনতে কিন্তু ঠিক সাফল্যলাভ করব এমন ভরসা পাচ্ছি না।

কিন্তু সরকারী সৈন্য তো অত্যাচার করবে নিরীহ মানুষের ওপর।

তাও ঠিক। সৈন্যদের কোন জাত নেই, ধর্ম নেই, কোন বিবেক নেই সাম্রাজ্যবাদী দেশে। সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশেই সৈন্যদের একই চরিত্র। তারা পেশাদার ভাড়াটিয়া, বন্য পশুর মত ওরা নর-হত্যায় মেতে ওঠে। ওরা অত্যাচার করবে সেটা স্বাভাবিক। আমাদের কাজ হবে ওদের বাধা দেওয়া।

বাধা দিতে প্রস্তুত হল চে সদলে।

চলার বিরাম নেই।

নতুন নতুন আস্তানা তৈরীর শেষ নেই।

কিন্তু রাজধানী ও অন্যান্য শহরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেছে। এদিকে দেখা দিয়েছে খাবারের অভাব। বনের পাখী মেরে খাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। তাও পাওয়া দুষ্কর। বন্দুকের আওয়াজে আকৃষ্ট হবে স্থানীয় লোকেরা। সন্দেহ জাগবে তাদের মনে।

পাহাড়ী নদী পেরিয়ে চলতে চলতে ক্লান্ত সবাই। পথ-ঘাট প্রস্তুত, আশ্রয় তৈরী করতে ব্যস্ত অথচ খাবার নেই। মালবাহী ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দেখল চে।

হাঁ, তোমাদের খাদ্যের অভাব পূরণ করতে হবে। ঘোড়ার মাংস বিনা আর কোন খাদ্য তো আমাদের নেই।

আদেশ দিল চে একটা ঘোড়াকে হত্যা করার।

ঘোড়ার মাংস পুড়িয়ে সে রাতের খাওয়া শেষ করল। এ যেন রাজকীয় ভোজ। সবাই তৃপ্তির সঙ্গে উদ্গার তুলতে তুলতে ভোজন-পর্ব শেষ করল।

নদী অতিক্রম করতে তাদের হারিয়ে গেল বহু অস্ত্র। ভেসে গেছে নদীর স্রোতে।

তবু তাদের মনোবল ভাঙেনি। বিশেষ করে বলিভিয়ার যারা কমরেড, তারা যেন আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে। তারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে সব রকম ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তানিয়া ফিরে আসেনি। তার জন্য অপেক্ষা করছে চে কিন্তু প্রতিদিনই নিরাশ হচ্ছে।

সংবাদ এল চে-র কাছে, পুলিশ সন্দেহ করেছে।

দুজন দল ছেড়ে পালিয়েছে।

বেনিগনো খাদ্য সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করছে। খাবার শেষ হওয়াতে তিনদিন আগে বেনিগনো খাবার সংগ্রহে গিয়েছিল। আশা করছে শীগ্‌গির পৌঁছে যাবে।

খামার বাড়িতে ছয়জন পুলিশ আক্রমণ করেছিল। পেরুভিয়ান ডাক্তার নেগ্রো এই আক্রমণ চাক্ষুষ দেখে এসে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে। তবে সে সময় যাদের সেখানে থাকার কথা তারা কেউই ছিল না। কোকো গিয়েছিল কামরিতে, আরেক দল গিয়েছে বলিভিয়ানদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পুলিশ আসার খবর পেয়েই আনটোনিও খামার থেকে গোপন পথে পালিয়ে ছিল।

অনেকদিন পর আজ সবাই পেট ভর্তি ভাত তরকারী খেতে পেল। খাবার পৌঁছেছে অনেকদিন পর।

তানিয়া বেস ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার নিয়েই সে এসেছে।

চে উৎসাহভরে তাকে ডেকে পাঠাল।

কদিন পরে সংবাদ এল দ্যবরেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ও সাদা পোশাকের ফৌজী গোয়েন্দারা। তার সঙ্গে গ্রেপ্তার হয়েছে বুস্তস ও রথ।

রথ ইংরেজ, খবরের কাগজের লোক।

মুয়ুপম্পায় ধরা পড়েছে। তাদের দলিলপত্র সন্দেহজনক।

সংবাদ নিয়ে জানা গেল এরা মুক্তিফৌজদের সদস্য বলে সন্দেহ করেছে। এরা মুক্তি পাবে কিনা সন্দেহ।

তানিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসল চে।

মনজে আমাদের সাহায্য করবে না। সংবাদ এনেছে এল-ফ্রাঁসেস। বলল তানিয়া।

আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ ছিলাম। বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শ হল, বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সমর্থন করা। অর্থাৎ শোষণ কায়েম রাখাই তাদের কাজ। এমত ক্ষেত্রে গণমুক্তির স্বপ্ন দেখা তাদের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এল-ফ্রাঁসেস বলছে, সে আমাদের সঙ্গেই থাকবে।

চে প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, আমাদের কাজের ক্ষেত্র এখানে সীমাবদ্ধ রাখতে পারি না। এল-ফ্রাঁসেসকে ফ্রান্সে ফিরে যেতে নির্দেশ দাও। সেখানে অনেক কাজ। সে কাজ করার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। সে যেন কিউবার পথে ফ্রান্সে ফিরে যায়।

এল-ফ্রাঁসেস যদি রাজী না হয়?

নিশ্চয় হবে তানিয়া। ফ্রাঁসেস চায় সংসার করতে। সে বিয়ে করবে, সন্তান হবে। এই তো চায় এল-ফ্রাঁসেস। তাকে বলে দাও, সে গিয়ে যেন অর্থ-সংগ্রহে মন দেয়। বলিভিয়ার এই মুক্তি-যুদ্ধে বহু অর্থের প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মেটাতে সে যেন সাহায্য করে।

আমাকে জোজামি নিয়ে এসেছে। আমি একদিনের বেশি থাকতে পারব না।

কিন্তু অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। এখন তোমার ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে কি?

চেষ্টা করতে হবে। যুদ্ধ তো এখানে। যুদ্ধকে চালু রাখতে হলে ফৌজ ও অর্থ প্রয়োজন। পেছন থেকে এগুলো সংগ্রহ করে

যদি দিতে না পারি তোমার এই অভিযান ব্যর্থ হবে। এই যে লোয়োলা, কি খবর ?

হিসাব নিয়ে এসেছি। মেজর সাহেবকে হিসাবটা দেব।

চে বলল, বস। কত টাকার হিসাব ?

গত নয়ই ফেব্রুয়ারী অবধি পনর শ' ডলার পেয়েছি আমি। তারই হিসাব। এই দেখ।

হিসাব দেখতে দেখতে চে বলল, লোরো কোন সংবাদ দিয়েছে কি ? সরকারী ফৌজের সঙ্গে কাল সংঘর্ষ হয়েছে, তাতে একজন সৈন্য মারা গেছে।

খবরটা যাচাই হয়েছে কি ?

লোরো মিথ্যা বলবে কেন নিজের কৃতিত্ব দেখাতে ? কিন্তু আমাদের দরকার বন্দুক। সেই মৃত সৈন্যের বন্দুক এনেছে লোরো।

বেলম্যান এসে বলল, লা-পাজ থেকে কাল রাতের বেতার-সংবাদে প্রকাশ ; একজন সৈন্য মারা গেছে কোন আততায়ীর হাতে। আবার আজ দুপুরে বলছে মারা যায়নি।

চে গম্ভীরভাবে বলল, মারা গেছে। লোরোর হাতেই মরেছে। আচ্ছা যাও।

ইনতি বলছে, মারকোসের আচরণ মোটেই সুবিধাজনক নয়।

চে বলল, এর আগে দুবার সে ঝগড়া মারামারি করেছে। তাকে সাবধান করে দিয়েছি। বলেছি, আমাদের দল থেকে তাকে বের করে দেব। তাও যদি না শোনে কোর্টমার্শাল করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলতে পার। আমি আর এইসব অন্যায় সহ্য করতে রাজি নই।

তানিয়া গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল। বোধহয় মারকোসের সন্ধানেই গিয়েছিল।

জ্বরের সংবাদ এল।

সারাদিন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুদ্ধ চলেছে।

এই যুদ্ধে সরকার পক্ষ পরাজিত হয়েছে। যুদ্ধের ফলে বহু অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, সাতজন সরকারী ফৌজ নিহত হয়েছে, চারজন আহতসহ চোদ্দজন বন্দী হয়েছে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে কোন খাবার পাওয়া যায়নি।

বন্দীদের আনা হল চে-র সামনে।

বন্দীদের একজন মেজর।

সরকার পক্ষের মেজরকে চে বলল, আমরা বন্দীদের ওপর কোন অত্যাচার করি না, তা বোধহয় জানো। আমি তোমাকে বেলা বারটা অবধি সময় দিলাম। তোমার সঙ্গী যারা মারা গেছে তাদের মৃতদেহ নিয়ে যেতে পার।

মেজর বলল, এতে আমার উৎসাহ নেই।

ভয়ের কিছু নেই মঁসিয়ে মেজর। আমরা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শান্তি রক্ষা করব। আমাদের পক্ষ থেকে একটা গুলিও ছুঁড়বে না কেউ। তুমি মুক্ত। তুমি স্বাধীনভাবে মৃতদেহগুলো সরিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে পার। কেউ কোন রকম বাধা দেবে না।

আমার আর সৈন্য বিভাগ ভাল লাগছে না মেজর চে। আমি অবসর গ্রহণ করব স্থির করেছি। আমি নিজের ঘরে ফিরে শান্তিতে বাস করতে চাই।

চে অপর অফিসারের দিকে চেয়ে বলল, মঁসিয়ে ক্যাপ্টেন, তুমিও মুক্ত। মেজরের সঙ্গে তুমিও ফিরে যেতে পার তোমার সঙ্গীদের নিয়ে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে। তারাও যেতে পারে, আমাদের কোন আপত্তি নেই। তোমাদের প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই।

ক্যাপটেন বলল, আমিও অবসর নেব। আমি অনেকদিন আগেই অবসর নিয়েছিলাম। মাত্র এক বছর আগে আবার ফিরে এসেছি সৈন্য বিভাগে বন্ধু-বান্ধবদের উপরোধে।

তোমরা তো জানো আমরা গণমুক্তির জন্য সংগ্রাম করছি।

বুঝিয়ে বলতে হবে না মেজর চে। আমার একটি ভাই কিউবাতে লেখাপড়া শেখে। তার কাছে তোমার শৌর্যবীর্যের কাহিনী বহুবার শুনেছি। তোমার ওপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। জান তো সামরিক বিভাগে কাজ করলে নিজস্ব মতামতের কোন মূল্য থাকে না।

আমি তোমার সঙ্গে এক মত। যাই হোক, তোমরা ফিরে যাও তোমাদের গৃহে অথবা কর্মস্থলে। তোমাদের যাতায়াতে কেউ বাধা দেবে না। তোমাদের জেনারেল ওভালদো আর প্রেসিডেণ্ট বারিয়েনতোসকে বলবে, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, তারা বলিভিয়ার জাতীয় মুক্তিবাহিনী (Bolivian National Liberation Army). এই বাহিনী চায় শ্রেণীহীন সমাজে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে সাম্রাজ্যবাদ, বুর্জোয়াতন্ত্র ও শোষণকে চিরতরে বলিভিয়া থেকে বিসর্জন দিতে। আশা করি, তোমরা এই আদর্শে বিশ্বাস না করলেও শ্রদ্ধা কর।

আমরা বিশ্বাস করি কিন্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রে এই বিশ্বাসের মর্যাদা কেউ দেয় না। শ্রেণী স্বার্থই এখানে প্রবল, তার ওপর রয়েছে মার্কিনী শোষণ। এই শোষণ স্থায়ী করতে বারিয়েনতোস মার্কিনের পদ লেহন করছে।

সক্রিয় ভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে ক্যাপটেন ?

বর্তমানে সম্ভব নয়। ভেবে দেখতে হবে। ভবিষ্যতে কি হবে, তা বলতে পারি না।

তোমাদের প্রেসিডেণ্ট প্রচার করছে, এই বিপ্লব যারা করছে তারা কেউ বলিভিয়ার লোক নয়। তারা সবাই বিদেশী। তার বক্তব্য হল কাস্ত্রো বিপ্লব রপ্তানী করেছে বলিভিয়াতে। কিউবার রপ্তানী-যোগ্য দুটো জিনিস আছে, একটি চিনি আর একটি বিপ্লব। এই

অসত্যকে মূলধন করে বারিয়েনতোস জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে। আমরা যাতে জন-সংগঠন গড়তে না পারি, তারই জন্য এই চেষ্টা। কিন্তু জনতাকে বেশিদিন বোকা করে রাখা যায় কি! যাক ওসব কথা, তুমি তোমার সহচর নিয়ে যেখানে খুশী যেতে পার। তোমরা মুক্ত।

বন্দীদের ফেরত পাঠাবার দায়িত্ব আনটোনিওর। চে তাকে নির্দেশ দিতেই দান্তন এসে বলল, তানিয়া যে আমাদের দলভুক্ত তা জানতে পেরেছে বারিয়েনতোস।

তুমি কি করে জানলে?

লা-পাজ বেতার-সংবাদে তানিয়ার কথা বলেছে।

চে বিশেষ চিন্তিত হল।

তানিয়াকে ডেকে পাঠিয়ে চে ভাবতে থাকে। তানিয়ার সংবাদ কি করে লা-পাজের সরকারী দপ্তরে পৌঁছল তা ভেবে পেল না।

গত দু বছর ধরে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল তানিয়া তা নিমেষেই ধ্বসে গেল। আর নিরাপদে যাতায়াত করার, অজ্ঞাতে সংগঠনকে জোরদার করার পথ রইল না। অস্ত্রশস্ত্র ও খাবার সংগ্রহেও বেশ বাধা পড়ল।

সব শুনে তানিয়া বলল, আমার এত দিনের পরিশ্রম ব্যর্থ।

আমাদেরই কোন সঙ্গী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মন্তব্য করল চে।

তানিয়া অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, এতেও আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না। গা-ঢাকা দিয়ে আমাকে কাজ করতে হবে। তার জন্য আমি প্রস্তুত। তবে এখান থেকে বের হওয়া খুব সহজ নয়। যারা দল ছেড়ে চলে গেছে অথবা যারা বন্দী হয়েছে তারাই হয়ত বলেছে। কে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তা নির্দিষ্টভাবে বলা কঠিন।

অত চিন্তা করে কাজ করা যায় না। যদি বিপদ আসে, তা হলে তার মোকাবিলা করতে হবে।

চে নতুন করে তার বাহিনী সাজিয়ে নিল।

লা-পাজের শাসকরা চুপ করে বসে নেই। তারা সংবাদ পেয়েছে গোরিলা যুদ্ধের। গোরিলাদের মোকাবিলা করতে কয়েক হাজার সৈন্য নিযুক্ত করেছে। প্রচার-কার্যও বেশ জোরদার করেছে। বেতারে অনবরত সংবাদ দিচ্ছে কোথায় কি ভাবে সরকারী সৈন্য গোরিলাদের ঘায়েল করেছে। এই সংবাদের বেশির ভাগই অসত্য সংবাদ। গোরিলাদের মনোবল ভাঙার পুরাতন পদ্ধতি মাত্র।

চে পিরিবেন্দা-গুতিয়েরেজ দখল করার নির্দেশ দিয়েছিল তার ফৌজকে। তারা পিরাবয় গিরিপথ দিয়ে এগিয়ে চলছিল। সরকারী ফৌজ ও ঘাঁটি আগলে বসেছিল। হঠাৎ তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর। যুদ্ধে দুজন মুক্তি সেনানী নিহত হল। এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী মুক্তিফৌজের এই অগ্রগামী বাহিনী। চে তাদের নির্দেশ দিয়েছিল পিরাবয় গিরিপথকে পাশ কাটিয়ে যেতে কিন্তু তারা সে নির্দেশ অমান্য করে পিরাবয় গিরিপথ দিয়েই অগ্রসর হচ্ছিল।

বেনিগনো পিরাবয় গিরিপথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে পিরিবেন্দা গিয়েছিল। পথের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করে এসে বলেছিল চার ঘন্টার মধ্যে পিরিবেন্দা পৌঁছান যায়।

চে তিনভাগে সৈন্যবাহিনী বিভক্ত করেছিল। অগ্রগামী বাহিনীর দায়িত্ব ছিল মিগুয়েলের ওপর, পশ্চাতের বাহিনী ছিল জ্যাকুইনের অধীনে আর মধ্যভাগে চে নিজেই ছিল। তার সঙ্গে ছিল তানিয়া।

দশই এপ্রিল।

শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখী লড়াই হল সেদিন।

সেদিনের যুদ্ধে সরকারী বাহিনীর একজন নিহত হয়, তিনজন

আহত হয়, ছয় জন বন্দী হয়, চারজন পালিয়ে যায়, একজন অফিসার আহত অবস্থায় মারা যায়। মোট পনের জনের এই দলটি এইভাবে পর্যুদস্ত হয়। কিন্তু চে-কেও বেশ মূল্য দিতে হয়েছিল সেদিন। এল-রুবিও এবং গ্যায়োল সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে মারা যায়।

সরকারী ফৌজের এই পরাজয়-সংবাদ পাওয়া মাত্র বেশ শক্তিশালী আরেকটি বাহিনী নিয়ে একজন মেজর এগিয়ে এল গোরিলাদের নির্মূল করতে।

চে পাঠাল পেমবোকে।

পেমবো খবর নিয়ে এল, সরকারী সৈন্যকে গুরুতর ভাবে পরাজিত করেছে গোরিলাবাহিনী।

অতর্কিত আক্রমণে বহু সরকারী সৈন্য হতাহত হয়েছে আর পরিচালক মেজর বন্দী হয়েছে। গোরিলাদের কোন ক্ষতি হয়নি।

আজকের এই যুদ্ধে সাতজন মারা গেছে, পাঁচজন আহত হয়েছে। আর বাইশজন বন্দী হয়েছে।

বন্দীদের জেরা করে জানা গেল, প্রথম দলটি দ্বিতীয় দলেরই অংশ। আগের যুদ্ধে এরা অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প দখল করেছিল। এই দলে মোট একশত জন ছিল। বর্তমানে কতজন জীবিত, তা ঠিক করে বলতে পারে না তারা।

যুদ্ধ চলছে। চারটে লড়াইতে জয়লাভ করেছে গোরিলা যোদ্ধারা। জয়ের খতিয়ান বেশি, ক্ষয়ের কম। চে কিন্তু চিন্তিত জনসংযোগের অভাবের দরুন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে মোটেই আগ্রহী করতে পারেনি মুক্তিযোদ্ধারা। তাই যুদ্ধের পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে ভাবতে হচ্ছে তাকে।

তানিয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করে। মাঝে মাঝেই কিউবা যুদ্ধের কথা বলেছে, গুয়েতেমালার কথাও বলেছে। অসাফল্য ও সাফল্যের হিসাবে কতটা আকস্মিকতা আছে, তাও আলোচনা করেছে।

বিশেষ করে কিউবার বিষয় আলোচনার সময় জুলিও রোবার তো ব্যাসেরেস ভাল্লের কথায় গদগদ হয়ে উঠত চে। গুয়েতেমালায় ভাল্লের মৃত্যু-সংবাদে কিভাবে মুহ্যমান হয়েছিল চে নিজে তাও বলেছে। চে বলত, ভাল্লেকে আমরা এল, পোটাজো বলে ডাকতাম। বেঁটে এবং গোলগাল চেহারা বলেই এই নামে সবাই তাকে ডাকত। মেকসিকোতে পোটাজো আমাদের বিপ্লব সাধনার প্রথম দিন উপস্থিত ছিল। ফিদেল অবশ্য বিদেশীকে কিউবায় বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে দিতে গররাজি ছিল। কিন্তু আমাকে অংশ গ্রহণ করতে দিয়েছিল।

তানিয়া বলল, আমাকেও দিয়েছিল।

তুমি ভাগ্যবতী আর আমি সম্মানিত। কিন্তু পোটাজোকে আমরা ভুলতে পারিনি। বিপ্লবের পর পোটাজো তার যা কিছু ছিল তা বিক্রি করে কিউবাতে হাজির হল। কৃষি-সংস্কারের প্রধানের পদ তাকে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ পেয়েও পোটাজো মোটেই সুখী হতে পারেনি। সে সব সময় ভাবত কি করে তার মাতৃভূমি মার্কিন দস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

নিশ্চয়ই কিউবার সাহায্য নিতে এসেছিল পোটাজো?

অন্তত আমি তাই মনে করি। আমার সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল আরবেনজোর পতনের পর। আমরা দুজনেই তখন গুয়েতেমালা থেকে পালিয়ে যেতে ট্রেনে উঠেছিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থল তাপা চুলা। সেখান থেকে মেকসিকো সিটিতে যাব স্থির করেছিলাম। আমার চেয়ে বয়সে সে অনেক ছোট, অথচ আমাদের মধ্যে স্থায়ী বন্ধুত্ব ছিল। আমরা চিয়াপাস থেকে মেকসিকোতে এসেছিলাম। দু'জনেই গা-ঢাকা দিয়ে ঘুরছিলাম সব সময় ভয় ও উৎকণ্ঠা। অনিশ্চিত ভবিষ্যত। আমাদের সামনে ছিল একই সমস্যা। আজ সেই পোটাজোকে হারিয়েছি।

চে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড়ই অভিমানী ও জেদী

ছিল পোটাজো। একদিন পোটাজো তার কয়েকখানা কাপড়জামা নিয়ে কিউবা ছেড়ে চলে গেল গুয়েতেমালায়। যাবার সময় কোন সংবাদ দেয়নি। পেছনে চিহ্নও রেখে যায়নি। রেখে গিয়েছিল একটা স্বলিখিত কবিতা ঃ

এই নাও তুমি, এটি আমার হৃদয়
তোমার হাতে তুলে মুঠো করে রাখ,
তারপর যখন সকাল হবে
তখন মুঠো খুলে ধর,
সকালের সূর্যে উত্তপ্ত করে নিও আমার এই হৃদয়কে।

তারপর পেলাম তার মৃত্যু-সংবাদ। পোটাজো স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছে, আমরা আমাদের স্বদেশের মুক্তির জন্য লড়াই করছি। তার মহান দান কিউবা স্মরণ করছে, তারই নামে কোন বিদ্যালয়, হাসপাতাল অথবা কারখানা নামাঙ্কিত হবে। সেখানে বসেই দেশের মানুষ লড়াই করবে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে।

তানিয়া হেসে বলল, আমাদের দান তো অত বড় নয়। আমাদের কথা কি মনে রাখবে কেউ ?

আমাদের কেউ স্মরণ করুক—এটা মনে করে তো আমরা যুদ্ধে আসিনি। আমরা এসেছি দেশের মুক্তি আনতে। হয়ত হারব, নয়ত জিতব। তা দিয়েই কি বিচার হবে আমাদের কাজ ? আমরা যে আদর্শ ও নীতি নিয়ে চলছি, তারই কথা বলবে ভবিষ্যত বংশধররা। অতীত পৃথিবীকে যে সব সভ্যতার আলোক-বর্তিকা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, মধ্যযুগেই তারাই পরিণত হল সাম্রাজ্যবাদীর কামধেনুতে। চীনের ওপর জাপানের আক্রমণ, মানচুরিয়া দখল, ভারতবর্ষকে পদানত রাখল ইংরেজ, আরও এগিয়ে তারা মিশরকে করেছিল কুক্ষিগত। এই আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে ইংরেজ, ফরাসী, স্প্যানিশদের রেস সুরু হল সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশ গড়ার। অবশেষে বর্তমান যুগের নয়া সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনরা হাত বাড়াল

লাতিন আমেরিকাকে কুক্ষিগত করতে। তারা জানে কিউবা কামধেনু। তাই কিউবাকে শোষণ করতে এগিয়ে এসেছিল। এক-কালে স্পেন দখল করে রেখেছিল কিউবাকে। তাদের হাতছাড়া হতেই হাত বাড়াল মার্কিনরা। অসহ্য এই অবস্থা। কিউবার বীর ফিদেল কাস্ত্রোর সঙ্গে মেকসিকোতে আমার পরিচয়। একটা রাত দুজনে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচনার পর আমি স্থির করলাম, বিপ্লব ভিন্ন মুক্তি নেই, আমি বিপ্লবী হব। মুক্তি শুধু কিউবার নয়, সমগ্র লাতিন আমেরিকার তথা বিশ্বের শোষিত জনসাধারণের মুক্তি। তার জন্য জীবনের শেষ দিন অবধি লড়াই করা হল আমার কাজ।

তানিয়া বলল, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় জার্মানীতে। পরবর্তীকালে আমরা একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম কিউবায়। তোমরা যে কি ভাবে মেকসিকোতে দল গড়ে তুলেছিলে, তা জানি না।

দরকার হয়নি। ফলাফল দেখেছ। আর অতীত নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই।

লাভ নেই বললে ভুল হয়। অতীতের শিক্ষাই আমাদের ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

ঠিকই বলেছ তানিয়া। মেকসিকোর জীবন আমাদের মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। বাতিস্তা মেকসিকোর পুলিশকে উৎকোচ দিয়ে বশীভূত করে রেখেছিল। তারা ফিদেলকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আমরা তখন জেনারেল বায়োর কাছে সামরিক শিক্ষা নিয়েছি। আমাকে দলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এমন সময় ফিদেলকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তবে পুরস্কারের লোভে তাকে বন্দী করে রাখল, হত্যা করল না। আমাদের দলের অনেককেই গ্রেপ্তার করল, আমিও বন্দী হলাম। জেলখানায় পাঠিয়ে দিল আমাদের সবাইকে।

জেলখানায় ফিদেলকে বললাম, আমি বিদেশী। আমি

গোপনপথে এদেশে এসেছি। আমার মুক্তি সম্ভাবনা কম। তোমরা ছাড়া পাওয়ামাত্র বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়বে, আমি পরে যেমন করে হোক তোমাদের সঙ্গে যোগ দেব।

ফিদেল বলল, তোমাকে ছেড়ে যাব না, যেতে পারি না।

আমি বললাম, এ তো ছেড়ে যাওয়া নয়। আমি সুযোগ বুঝে তোমার সঙ্গে যোগ দেব। ভাবছ কেন বন্ধু। তোমরা কেন আমার জন্য বসে থাকবে, বরং কাজ আরম্ভ করতে পারবে তার আগেই।

ফিদেল দৃঢ়ভাবে বলেছিল, আমার উত্তর তোমাকে দিয়েছি। আমাদের বৈপ্লবিক কাজ-কর্ম বিলম্বিত হতে পারে কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়ে বিপ্লব সাধনায় আমি মোটেই এগোতে চাই না। তুমি বিদেশী নও, তুমি বিশ্বের নাগরিক। পৃথিবীর সব দেশেই তোমার ঘর। কিউবার মুক্তিযুদ্ধে তোমাকে আমার পাশে চাই।

আমি বহুবার প্রতিবাদ জানালাম। ফিদেল ও আমাদের কিছু সঙ্গী মুক্তি পেল সাতান্ন দিন পরে। বাইরে বেরিয়েই ফিদেল মূল্যবান সময় নষ্ট করে অর্থ সংগ্রহ করে মেকসিকোর জেল থেকে আমাকে খালাস করে আনল, আমার সঙ্গে আরও যারা ছিল তাদেরও মুক্ত করল। ফিদেল ভালবাসে মানুষকে, মানুষও তাকে ভালবেসেছে। ফিদেল মানুষের প্রতি অনুগত, মানুষও তার প্রতি অনুগত। তাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যেকটি সেনা ছিল শত্রুর এক একটা রেজিমেন্টের তুল্য বলশালী।

তবে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম না।

বুর্জোয়া শাসনে মানুষের মেরু-মজ্জা ভেঙে যায়, ব্যক্তিগত লোভ মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। আমাদের মধ্যেও এরকম লোকের অভাব হয়নি। বুঝতে পারলাম এক বা একাধিক বিশ্বাসঘাতক আছে আমাদের মধ্যে। আমাদের কিউবা পাড়ি জমাবার একটা বোট, কিছু অস্ত্রশস্ত্র, কিছু বেতার-যন্ত্র বিক্রি করে দিয়েছিল এই বিশ্বাসঘাতকদের একজন।

তবুও আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। 'গ্রামনা' প্রস্তুত। বোটে আমরা যতদূর সম্ভব খাদ্য ভর্ত্তি করলাম, সংগৃহীত অস্ত্রশস্ত্র তুলে নিয়ে রওনা হলাম কিউবার দিকে।

আলো নিভিয়ে রাতের অন্ধকারে টুক্সপান বন্দর থেকে রওনা হলাম। সেখানকার লোক জানতেও পারল না আমরা কোথায় যাচ্ছি। আমাদের পরিচয় ছিল সবার অজ্ঞাত। হয়ত তারা জেলে মনে করেছিল, হয়ত মনে করেছিল ছোট একটি পাইলটের দল।

আমরা নিকিউরো শহরের পাশে নামার পরিকল্পনা করেছিলাম। সেই অনুসারেই আমরা জ্যামাইকা, গ্র্যাণ্ড কে-ম্যান দ্বীপ ঘুরে ওরিয়েন্ট প্রদেশের নিকিউরোতে পৌঁছলাম।

তানিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, অদ্ভুত, অপূর্ব!

আদর্শ আমাদের টেনে নিয়ে গেছে তানিয়া। মন্তব্য করল চে।

তানিয়া কিছু বলবার আগেই ইনতি এসে বলল, বন্দীদের প্রতি কি নির্দেশ মেজর?

বন্দীদের মুক্ত করে দাও ইনতি। অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ওদের নিরাপদে ফিরে যেতে দাও নিজের নিজের ঘরে।

নির্দেশ পেয়েই ইনতি ফিরে যাচ্ছিল। চে তাকে ডেকে জানতে চাইল, আজকের যুদ্ধের ফলাফল বল।

শত্রুদের দশজন মারা গেছে, তার মধ্যে দুজন অফিসার। একজন মেজর সমেত তিরিশজন বন্দী হয়েছে। এদের মধ্যে ছজন আহত।

আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে?

হয়েছে, কিন্তু ওষুধপত্র খুবই কম। সংগ্রহ করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে।

দেখছি। আচ্ছা, যাও।

তানিয়া বলল, লোয়োলা আসছে।

চে লোয়োলাকে ডেকে পাশে বসাল।

আমাদের বেশ ক্ষতি হচ্ছে মেজর। ধীরে ধীরে বলল লোয়োলা।

চে হেসে বলল, তোমার কথা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। কেন জানো? আমরা আশীজন যখন কিউবার জমিতে পা দিয়েছিলাম, তখনই বাতিস্তার উপকূল রক্ষীরা টেলিগ্রাম করে আমাদের সংবাদ পাঠিয়ে ছিল সৈন্য-বিভাগে। সঙ্গে সঙ্গে বিমান থেকে আক্রমণ সুরু হল। আমরা জঙ্গলে আশ্রয় নিলাম। বিমান থেকে বোমা মেরে আমাদের ক্ষতি করতে না পারলেও পেশাদারী সৈন্যরা আমাদের তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়াতে কসুর করেনি। আমাদের একজন সহকর্মী বলেছিল, পথঘাট সে চেনে, কিন্তু সে মোটেই তা চিনত না। তাই জলাভূমিতে আমরা আটক হয়ে পড়লাম। আমরা পালাতে পালাতে হাজির হলাম আলেগরিয়া ছ পিওতে। আলেগরিয়া কিউবার ওরিয়েন্ট প্রদেশে। বোট থেকে নামার পর আমরা সবাই ছিলাম ক্লান্ত। কাদায় ও জলাভূমিতে চলতে চলতে আমরা তখন নানা রকম রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সমুদ্র-পথে আসাতে বোটের অনেক দোলানিতে পেটের রোগেও ভুগছি। খাবার নেই, পানীয় জল ছিল না এক ফোঁটাও। সমুদ্রের খাড়ি নোনা জলে ভর্তি। এক বিন্দু মুখে দেবার উপায় নেই। এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম আমরা।

আমাদের কয়েকজন বন্ধু আখ ক্ষেত দেখতে পেয়ে খুশী মনে আখ ভেঙে চিবুতে থাকে তৃষ্ণা ও ক্ষুধা নিবারণের জন্য। খোলা মাঠে ছিল তারা। হঠাৎ আকাশ-পথে বিমান দেখা গেল। বিমান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি মারতে থাকে শত্রুরা। এই গুলির আঘাতে মারা গেল লামোতে। আহত অবস্থায় তাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। আমি সার্জেন। গুলি বের করা আমার কাজ। সেদিন সে যখন এগিয়ে গিয়েছিল আখ ক্ষেতের দিকে, তখন সে চলতে পারছিল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন, এমন সময় এক ঝাঁক গুলি এসে লাগল তার গায়ে।

আমি আর বন্ধু মনতানে বসেছিলাম একটা গাছতলায়। আমার প্রথমা স্ত্রীর একটি কন্যা সন্তান হয়েছে জানি। মনতানেরও সন্তান হয়েছে। উভয়ে সন্তানদের গল্প করছিলাম গাছে হেলান দিয়ে, এমন সময় এই আক্রমণ। আমি তখন হাঁপানীতে কষ্ট পাচ্ছি। সমুদ্র পেরিয়ে আসতে আমার হাঁপানী বেড়ে গেছে। উপরন্তু যেমন পরিশ্রম, তেমনি খাদ্য ও পানীয়ের অভাব। তাতে রোগ বৃদ্ধি স্বাভাবিক।

এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে ফিদেল আর আমাদের সহকর্মী য়্যালমেইদা তাদের সৈন্য সাজাতে ব্যস্ত। এমন সময় একজন আমার পায়ের কাছে একটা কার্টিজের বাক্স ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, এ সবের দরকার হবে না। খুবই বিলম্ব হয়ে গেছে। বলেই লোকটা আখ ক্ষেতের মাঝ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে বাতিস্তার ঠগী সৈন্যরা বধ করেছিল এই অনাহত কমরেডকে।

আমার সামনে অনেক সমস্যা। ডাক্তার আমি। আহত সেবার জন্য ওষুধের দরকার। ওষুধ রয়েছে কিছু আমার সামনে আর রয়েছে একগাদা কার্টিজ। একটা ওষুধের বাক্স, আরেক কার্টিজের বাক্স। কোনটা নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করব ভাবছিলাম। আমার সঙ্গে একটা রাইফেলও ছিল। কার্টিজের বাক্স বেশি মূল্যবান অথবা ওষুধের বাক্স? আমি কার্টিজের বাক্সটা নিয়েই পালালাম। বুঝলে লোয়োলা, আমাদের কাছে অস্ত্র হল বেশি মূল্যবান। সব পাবে, অস্ত্র পাবে না প্রয়োজন মত এই সব মুক্তিযুদ্ধে। সেজন্য সব সময় শত্রুর অস্ত্র হস্তগত করাই হল আমাদের প্রধান কাজ।

চারিদিক থেকে শত্রুরা ঘিরে ফেলেছে। আকাশ থেকে গুলি ছুটে আসছে। সামনে শত্রু, তারা গুলি ছুঁড়ছে। কামান, মেসিন-গান ব্যবহার করছে শত্রুরা। আমাদের বন্ধু আরবেনতোসা গুলি ছুঁড়ছিল। সেও আহত হল। চিৎকার করে বলল, শত্রু আমাকে হত্যা করেছে। তাকিয়ে দেখি আরবেনতোস অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে

গুলি ছুঁড়ছে অনবরত। মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও সে শেষ চেষ্টা করছে শত্রু নিপাতের। আমিও আহত হলাম। আমার পাশে ছিল ফাউসটিলো। তাকে বললাম, আমারও মৃত্যু সামনে।

ফাউসটিলো বলল, কিছু হয়নি, গুলি চালাও।

আমি আমার রাইফেল থেকে গুলি চালাচ্ছিলাম আর ভাবছিলাম মৃত্যু আমার সামনে। কি করলে সব চেয়ে সম্মানজনক ভাবে মরতে পারি। মৃত্যুর পূর্বে একজন শত্রুকে যদি না মারতে পারি, তা হলে অমর্যাদা নিয়ে মরতে হবে। তা হতে পারে না। আমার রাইফেল বার বার গর্জে উঠে আমার মৃত্যুর আগে অপরের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করতে থাকে।

বুকে হাঁটতে হাঁটতে একজন আমার পাশে এল। চিৎকার করে বলল, আত্মসমর্পণ নয়, মৃত্যু।

তাকিয়ে দেখলাম, কামিলো। আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু।

আরেকজন সহকর্মী গড়াতে গড়াতে আমার কাছে এল। তাকিয়ে দেখলাম, গুলি তার বুকে লেগেছে। সম্ভবত ফুসফুস ভেদ করে চলে গেছে। বলল, ডাক্তার পালাও।

বললাম, পোন্স আমি আহত, চলতে পারছি না।

পোন্স গড়াতে গড়াতে আখ ক্ষেতের দিকে এগিয়ে গেল, সঙ্গে গেল কয়েক অনাহত বন্ধু। তখন আমি একা।

কামিলোকে আর দেখতে পেলাম না। আশে-পাশে কেউ নেই। একেবারে একলা। সামনে দাঁড়িয়ে মৃত্যু। য়্যালমেইদা আমার কাছে এল। বলল, চল চল, আর এখানে থেকো না।

আমার যন্ত্রণার শেষ নেই। সেই অবস্থায় তার পেছন-পেছন মাঠে নেমে পড়লাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, রাউল সুয়ারেজ আহত অবস্থায় বসে আছে। তার হাতের বুড়ো আঙুল উড়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। সুয়ারেজ একটা কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার আঙুলে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে।

তখনও মাথার ওপর দিয়ে বিমান উড়ছে। আমাদের ঘিরে গোলাকারে ঘুরছে।

আমাদের সঙ্গী সংখ্যা কমে গেছে। আমার সঙ্গে রয়েছে য়্যালমেইদা, ভালদেস, চাও, বেনিতেজ। আমরা শিক্ষিত সৈন্যের মত দলবদ্ধ হয়ে সামনের জঙ্গলে আশ্রয় পাবার আশায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকি। সেদিনের পরাজয় কত গুরুতর হয়েছিল, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না লোয়োলা। সেই ক্ষতির পরও আমরা গড়ে তুলেছিলাম মুক্তিফৌজ। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আমরা মুক্ত করেছিলাম ওরিয়েন্ট প্রদেশ। সে সব ঘটনা তো শোননি। স্বপ্নের মত মনে হবে।

শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এল কয়েকজন। সাদা পতাকা উড়িয়ে ট্রাকে করে মুয়ুপম্পা থেকে ওরা এসেছিল।

এদিকে মুয়ুপম্পায় যাদের পাঠান হয়েছিল, তাদের তিন জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শান্তি চাই—চিৎকার শোনা গেলেও কয়েক ঘণ্টা পর যে বাড়িতে চে তার সঙ্গীদের নিয়ে রান্না করছিল, সে বাড়ি আক্রমণ করল বারিয়েনতোসের সৈন্যরা। এই আক্রমণে রিকার্ডো আহত হল। চে বুঝতে পারল শান্তির কথা মিথ্যা। বন্দুকের মুখে এই ভাবেই শান্তি স্থাপন করতে চায় বলিভিয়ার সরকার। চে তার সঙ্গীদের নিয়ে বনে আত্মগোপন করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে বিশ্রাম করতে থাকে।

চে-র গোপন স্থানের সন্ধান দিয়েছিল স্থানীয় দুজন চাষী। তারা জানে চে-র গোপন স্থানের খোঁজ দিলে সরকার তাদের একহাজার ডলার পুরস্কার দেবে। এদের মধ্যে রোডা পরিবারের একজন ছেলে এই গুপ্তচরের কাজ করেছে। ফলে তার একটা ঘোড়া বাজেয়াপ্ত করে নিল মুক্তিফৌজের জন্য।

মুয়ুপম্পা থেকে নাটো এসে খবর দিল, শহরের লোকেরা সতর্ক হয়েছে। যে কোন সময় শহর আক্রান্ত হতে পারে—এই আশঙ্কায় সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত। এত ব্যবস্থা করে শুধু ভাঁওতা দিয়ে শান্তি স্থাপনের মিথ্যা অজুহাতে এসেছিল কয়েকজন। আর শান্তির লক্ষণ দেখা গেল গোপন স্থান থেকে মেসিনগান চালিয়ে রিকার্ডোকে আহত করায়। চে সতর্ক হল। লক্ষ্য করল শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব-বোধের অভাবে এই সব ঘটছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হল চে। ডাকল সঙ্গীদের। আবার বুঝিয়ে বলল মুক্তিযোদ্ধাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব কি।

রাত কাটল।

সরকারী গোয়েন্দারা তৎপর।

গ্রামের লোকদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহে তারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করছে।

একজন চাষী তাদের রাতের বাসস্থান দেখিয়ে দিল নিরাপদে বাস করতে। এদিকে সরকারী ফৌজ ট্রাক ভর্তি হয়ে এসেছে সবাইকে গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা নিয়ে। যে সব পথ দিয়ে মুক্তি-ফৌজ যাতায়াত করে, সেই সব পথ আটক করতে সরকারী ফৌজ তৎপর।

চে স্থির করল, দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতে হবে, রাতের বেলায় আক্রমণ করে সরকারী ফৌজের রসদ আটক করতে হবে, দরকার হলে ফৌজের সঙ্গে লড়াই করতেও হবে।

সে রাতে একটা ট্রাক থেকে খাবার সংগ্রহ করে তারা অপেক্ষা করতে লাগল রুটির গাড়ির জন্য। একটা ছোট ট্রাকে খাবার ভর্তি করে চে তার ঘাঁটিতে হাজির হবার আশায় অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় একটা বিমান দেখা গেল আকাশে। চে বনের দিকে এগিয়ে চলছিল কিন্তু গ্রামের কুকুর চিৎকার করে তাদের উপস্থিতি জানিয়ে দিচ্ছিল গ্রামের লোকদের। মুক্তিফৌজের

উপস্থিতি জানাজানি হয়ে গেছে, সরকারী ফৌজ এগিয়ে এসেছে তাদের গ্রেপ্তার করতে। উভয়পক্ষে গুলিগোলা চলা আরম্ভ হল। অপর দিকে আত্মসমর্পণ করার জন্য নির্দেশও দিচ্ছিল। চে ও তার সঙ্গীরা তখন বে-পরোয়া। কি যে ঘটছে অথবা ঘটতে পারে, তাও বুঝতে পারছিল না। তার পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার উপক্রম। চে সমগ্র শক্তি দিয়ে বাধা দিতে লাগল।

সাময়িক গুলি বিনিময় অচিরেই বন্ধ হল। সরকারী ফৌজ পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। ট্রাক বোঝাই মাল ও ছয়টি ঘোড়ার পিঠে মাল চাপিয়ে চে তার দলবল নিয়ে প্রবেশ করল গভীর বনে। তাদের নিরাপদ ঘাঁটি তিকুচা পৌঁছে তবেই বিশ্রাম পেল।

সেদিনের এই যুদ্ধের ছোটখাটো ব্যাপার কোন দলেরই পক্ষে সুবিধাজনক বলে মনে হল না। চে-র ক্ষতি হল বেশি। যে সব রসদ আনার কথা, তা পুরোপুরি আনতে পারেনি। তার সঙ্গী পোসকের ব্যাগ থেকে কয়েক হাজার ডলার কোথায় পড়ে গেছে। যুদ্ধ ও পলায়ন একই সঙ্গে করতে হয়। তখন নিজের প্রাণের মায়াটা থাকে বেশি, ডলারের মায়া না থাকাই স্বাভাবিক। অথচ এইজন্য আর্থিক ক্ষতিটাও কম নয়।

মুক্তিফৌজের মনোবল পরীক্ষা করতে চে সবার সঙ্গে কথা বলে দেখল।

কেউ-ই ভয় পায়নি।

সবাই আগ্রহী যুদ্ধ করতে। মৃত্যু জেনেও কেউ পেছ-পা নয়। রাতের বেলায় আবার বসল চে। পাশে তানিয়া আর লোয়োলা। তানিয়া খুবই অসুস্থ। কদিন থেকে ম্যালেরিয়াতে ভুগছে। কোন ক্রমেই শরীর ভাল হচ্ছে না।

তোমাকেই দরকার ছিল তানিয়া। তোমার শরীর ভাল নয়, আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় ওষুধও নেই। কুইনিন না হলে তোমার জ্বর বন্ধ হবে না। কুইনিন সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি।

তানিয়ার মুখে শুকনো হাসি। বলল, চিন্তা কর না মেজর, ঠিক আরাম হয়ে যাব। আজকের পরাজয় কেন ঘটল তাই বল।

দুটো কারণ। একটা হল শৃঙ্খলা ও দায়িত্বহীনতা, অপরটি হল বিশ্বাসঘাতকতা।

এর প্রতিকার কি ?

প্রতিকার আছে, তবে কঠিন সে কাজ। বিপ্লবের সুযোগ নিতে কেউ কম নয়। অনেক সময় বিপ্লবের নাম নিয়ে দুষ্টলোক সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে, এমন ঘটনা হামেসাই ঘটে। অনেকে মনে করে বিপ্লবকে কিছু কিছু সাহায্য করব। আবার সরকারকেও খুশী করব। ভবিষ্যতে যাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে, তাদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করব। কোন মার্কসবাদী সংস্থা এদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার আগে যাচাই করবে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা হয়ত সম্ভব হয় না। কিউবাতে এরকম বহুলোকের সাহচর্যে যেতে হয়েছে। এরকম একজন বিশ্বাসঘাতক ছিল ইউটিমিও গুয়েরা। আমরা যখন বিপন্ন, তখন সে সাহায্য করেছিল। কিন্তু একবার সে বাড়ির কাজের অজুহাতে পালিয়ে গিয়ে কয়েকদিন বাইরে ছিল। ফিরে আসার পর সে আরও বেশি আগ্রহ সহকারে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে। তখন আমরা বুঝতে পারিনি তার অভিপ্রায়। ধীরে ধীরে তাকে চিনতে পারলাম।

এক রাতে ইউটিমিও বলল, তার গায়ে দেবার কম্বল নেই। খুবই শীত। সে ফিদেলকে বলল, আমাকে একটা কম্বল দাও।

ফিদেল বলল, যদি কম্বল তোমাকে একটা দিতে হয় তা হলে তুমিও কষ্ট পাবে, আমিও কষ্ট পাব। তার চেয়ে আমার কম্বলের মধ্যে তুমিও ঢুকে পড়। আমার দুটো গরম কোট আছে, তাও গায়ে দিতে পারব দু জনেই।

ইউটিমিও ফিদেলের পাশে শুয়ে পড়ল। তার কাছে লুকানো ছিল একটা পিস্তল আর একটা হাতবোমা। উদ্দেশ্য ছিল পিস্তল

দিয়ে ফিদেলকে হত্যা করে রাতের বেলায় বোমা ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যাবে।

ফিদেলের কেমন সন্দেহ হয়েছিল। বলল, আমাদের রক্ষীরা সতর্ক থাকে যেন।

আমি বললাম, তিন জন সব সময় সতর্কভাবে পাহারা দেবে। তাছাড়া আমি নিজেই দায়িত্ব নিলাম তোমাকে নিরাপদ রাখতে। তুমি নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক।

রাত কেটে গেল। ইউটিমিও রাত জেগে কাটাল। সুযোগ খুঁজছিল। কিন্তু হত্যা করার সুযোগ সে পেল না।

সত্যই যখন প্রমাণ পাওয়া গেল, প্রচুর অর্থ ও সম্পদের লোভে ইউটিমিও ফিদেলকে হত্যার চেষ্টায় ছিল, তখন তার বিচার হল। বিচারের সময় সে স্বীকার করল তার অপরাধ এবং মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা করল।

বিশ্বাসঘাতকের দণ্ড মৃত্যু।

তাকে বলা হল, মৃত্যুর পূর্বে তোমার কোন বাসনা পূর্ণ করতে চাও কি?

বাসনা? হাঁ। আমার সন্তানদের দায়িত্ব তোমরা যদি নাও, তা হলেই আমি খুশী।

বেশ। দেশ মুক্ত হলে তোমার সন্তানদের সব দায়িত্ব আমাদের। আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। তাদের সুশিক্ষিত করে সু-নাগরিক গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের। ইউটিমিও মরেছে। কিন্তু তার সন্তানপ্রীতি আমাদের মনে রেখাপাত করেছে। বিশ্বাস-ঘাতকের দণ্ড মৃত্যু। কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা বিশ্বাসঘাতকতা করছে, বিশ্বাসঘাতকতা করছে কয়েকজন গ্রামের লোক।

তানিয়া বলল, তাদের শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করছ না কেন?

এখনও সে পর্যায়ে আমরা পৌছাতে পারিনি। তা করতে হলে সময় দরকার। কিউবাতে আমরা যখন কিছুটা এলাকা মুক্ত

করেছিলাম, তখন নানা রকম অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আমরা যাদের সহযোগিতা চাই, তাদের শাস্তি দিলে তারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবেই। এদের বুঝিয়ে স্বমতে আনাই আমার কাজ। ওরা যদি মনে করে আমরা ত্রাস সৃষ্টি করছি, তা হলে মোটেই সহযোগিতা পাব না। একবার কিউবায় আমাদের মুক্ত এলাকায় কয়েকজন অশান্তি আরম্ভ করল। তাদের নেতার নাম চ্যাং। এই মুক্ত এলাকায় বিপ্লবীর নাম নিয়ে চ্যাং কৃষকদের ওপর অত্যাচার করত, এমন কি হত্যা করত। এইভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল সমগ্র এলাকায়। আমাদের তখন যুদ্ধ করতে হচ্ছে শত্রুর সঙ্গে, প্রশাসন-ব্যবস্থা তখনও চালু করা সম্ভব হয়নি—এমন সময় এই উপদ্রব। বিপ্লবের নাম নিয়ে আমাদের মুক্ত এলাকায় এই সন্ত্রাস সৃষ্টি তখন অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ফিদেল আদেশ দিল, দস্যুদের গ্রেপ্তার কর। দশ দিন নানাস্থানে হামলা করে অবশেষে গ্রেপ্তার করলাম চ্যাংকে তার সঙ্গীসহ। বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল চ্যাংকে। আরেকজন নিজেকে বিপ্লবী বলে প্রচার করত। এর সুযোগে একটি যুবতীকে জোর করে সম্ভ্রম নাশ করাতে তাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এরপর নিরাপদে শান্তিতে বাস করতে থাকে কৃষকরা। কিন্তু তানিয়া, সে অবস্থায় এখনও আমরা এখানে পৌঁছতে পারিনি। তা হলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করতে পারতাম। আরও সময় দরকার।

এরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেনি ?

আশ্চর্য! নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছিল সবাই। এদের দু'জনকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে গুলি করার আদেশ দিল বিচারক। চ্যাং-এর কোন পরিবর্তন হয়নি, মৃত্যুর আগে চিৎকার করে বলেছিল, বিপ্লবের জয় হোক।

আবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। আশা ছিল তারা তাদের স্বভাব-চরিত্র বদল করবে।

কিন্তু তাদের বলা হল, তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের চোখ বেঁধে আনা হল। একটা গাছের সঙ্গে বাঁধা হল, তারপর বন্দুক তুলে ধরল তাদের লক্ষ্য করে কিন্তু গুলি করা হল আকাশে। তাদের প্রাণদান করা হল। ভবিষ্যতে তারাই খুব কর্মঠ সহযোগী হয়েছিল।

আমাদের এই এলাকার যুদ্ধ সবে আরম্ভ। এখনও আমাদের মুক্ত করতে হবে অন্তত কিছুটা এলাকা, যেখানে আমাদের প্রশাসন থাকবে অপ্রতিহত। তারপর শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার পুরোপুরি ব্যবস্থা করতে পারব।

তানিয়া গভীর মনোযোগ সহকারে সব শুনে বলল, সেবার আমি তখনও তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি। এবার তো তোমাদের পাশে আছি।

আমি ভাবছি আমাদের এই সংযোগপূর্ণ কাজের পরিণতি।

জয় অথবা মৃত্যু।

চে চুরুট ধরিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে থাকে।

লোয়োলা তানিয়াকে বলল, আজকের বলিভিয়ার রেডিও-সংবাদ শুনেছ তানিয়া?

না। তুমি শুনেছ?

হাঁ। লা-পাজ থেকে সামরিক সংবাদে বলা হয়েছে, বলিভিয়ার সামরিক বাহিনীর একটা কুকুর ও কুকুরের প্রতিপালক মারা গেছে। আর আমাদের দুজন সহকর্মী মারা গেছে। তারা বলছে, এই মৃত মুক্তিযোদ্ধাদের একজন কিউবার লোক। তার নাম রুবিও। আরেক জন বলিভিয়ার লোক।

চে গম্ভীর ভাবে শুনছিল লোয়োলার আলোচনা। লোয়োলা থামতেই চে বলল, তা হলে ওরাই স্বীকার করেছে ওদের একজনের মৃত্যু। আমাদের অতি প্রিয় রোলাণ্ডো মারা গেছে, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি মারা যায়নি। ডাতন কামিরিতে গিয়েছিল, মনে হচ্ছে সে

বন্দী হয়েছে। অথবা সবাই বেঁচে আছে আশা করছি। নইলে লা-পাজ বেতারে নিশ্চয়ই খবর দিত।

রোলাণ্ডোকে হারানো আমাদের পক্ষে অতীব দুঃখের।

শুধু দুঃখের নয়, আমাদের শক্তিহানি ঘটল। মনে করেছিলাম দ্বিতীয় রণাঙ্গণ খুলব আর তার দায়িত্ব দেব রোলাণ্ডোকে। দুঃখ ও ক্ষতি কোনটাই কম নয়। আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে নিরাপদ এলাকায়। পাহাড় পেরিয়ে নাকাহুয়াসুতে পৌছতে চেষ্টা করতে হবে।

তানিয়া বলল, খাবারের অভাব দেখা দিয়েছে। টেনেটুনে চারদিন চলতে পারে।

ভয় পেও না তানিয়া। আমাদের খাবার ফুরিয়ে যাবে, আবার আমাদের অনাহারেও থাকতে হবে। আবার এইভাবে কখনও পেয়ে যাব খাবার। আমাদের বিঘ্ন ও বিপদ নিয়ে চলাই হল ধর্ম।

যাত্রা স্থরু হল সকালে ঘুম থেকে উঠেই।

সমগ্র বাহিনী নিরাপদ এলাকার সন্ধানে রওনা হল ভোর না হতেই।

সারা দিন পথ চলে রাতের বেলায় পাহাড়ের মাথায় আশ্রয় নিল সবাই। রাত কাটাল সেখানে। এদিন হাভানা রেডিও-র সংবাদে তারা জানতে পারল আরও ঘটনা।

হাভানা বেতার চিলি বেতারের সংবাদ উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধারা অত্যধিক শক্তিশালী, তারা শহর আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। কয়েকদিন আগে মুক্তিযোদ্ধারা দুটো সামরিক ট্রাক দখল করেছে। ট্রাকগুলো খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। খাবারগুলো পেয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা।

বারিয়েনতোস স্বীকার করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবিলা করতে মার্কিন উপদেষ্টারা তাকে সাহায্য করছে। আরও স্বীকার করেছে, এই যে গৃহযুদ্ধ, এর পেছনে রয়েছে সামাজিক অসাম্য।

বলিভিয়ার মানুষ শ্রেণীস্বার্থের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছে। যুদ্ধের গতি যে বারিয়েনতোসের অনুকূলে, তাও বলেছে। তবে জয়-পরাজয় সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেনি।

পাহাড়ের ওপর খোলা আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে চে গুয়েভারা। মাঝে মাঝে চুরুট টানছে, মাঝে মাঝে কাশছে।

লোয়োলা ধীরে ধীরে উঠে এসে বসল চে-র পাশে। বলল, মেজর কি ঘুমিয়েছ?

না। কি দরকার ম্যাদাম লোয়োলা?

ভাবছিলাম, জনসমর্থন না পেলে আমরা এভাবে কতটা এগোতে পারব। আমি মনে করছি শহরে ফিরে যাব। সেখান থেকে তোমাদের খাবার ও সঙ্গে সঙ্গে কিছু অস্ত্রের ব্যবস্থা করব। আর যতটা পারি জনসংযোগ করার দিকে নজর দেব।

উদ্দেশ্য মহত কিন্তু তোমাকে ধরতে পারলে ছাড়বে না।

আমাকে কেউ-ই চেনে না। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ ছাত্রী বলেই জানে। তানিয়াকে যেমন সবাই চেনে, তার এক অংশও আমাকে চেনে না। বলতে গেলে মোটেই চেনে না। আমার পক্ষে কাজ করার বেশি সুবিধা।

আজকে আমাকে ভাবতে দাও ম্যাদাম কমরেড। কালকে তোমাকে আমার অভিমত জানাব। তুমি তো জান দ্যবরে ও বুস্তসকে গ্রেপ্তার করেছে। ইংরেজ ফটোগ্রাফার রথকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাকে ছেড়ে দিয়েছে। দ্যবরেকে নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে।

শুনেছি।

তোমাকে গ্রেপ্তার করলে তোমার ওপরও নির্মম অমানুষিক অত্যাচার করতে পারে। দ্যবরে পুরুষ মানুষ, তার পক্ষে যা সহ্য করা সম্ভব, তোমার পক্ষে তা নয়। নারীর অবমাননা যেভাবে করে থাকে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়ারা, তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে কি? এই অত্যাচার ওরা করেছে চীনে, আলজেরিয়াতে এমন কি

কিউবাতেও। সেজন্য তোমার পক্ষে যাওয়া উচিত হবে কিনা সেটা ভেবে ও পরামর্শ করে দেখতে হবে। তুমি গিয়ে দেখ তো তানিয়া ঘুমিয়েছে কিনা। যদি জেগে থাকে, তা হলে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস।

লোয়োলা উঠে গেল তানিয়ার খোঁজে।

চে-র চোখে ঘুম নেই। চুরুট টানছে আর ভাবছে। সব চেয়ে বড় ভাবনা স্থানীয় চাষী-মহলে তাদের প্রভাব বিস্তার কেন হয়নি, কেন তারা ব্যর্থ হয়েছে! আরও ভাবছে এই সব নিগৃহীত চাষীরা তাদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে কেনই বা বারিয়েনতোসের গোয়েন্দার কাজ করছে!

তানিয়া এসে তার চিন্তায় বাধা দিল।

তুমি কি ঘুমিয়েছিলে তানিয়া?

ঠিক ঘুমোইনি, ঝিমুনি এসেছিল। যাক্ গে, তোমার নির্দেশ শুনতে এসেছি।

তুমি জ্যাকুইনের সঙ্গে দ্বিতীয় ফ্রণ্টে যেতে পারবে?

নিশ্চয় পারব।

তা হলে কাল প্রস্তুত হয়ে নিও। এখান থেকে আমরা দুটো কম্যাণ্ডে বিভক্ত হয়েই কাজ করব। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র বিশেষ নেই, জনবলও বিশেষ নেই। তোমাকে এ দুটোর দিকে নজর দিতে বলেছি, সেটা যেন ভুল না। স্থানীয় চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করাটাই বড় কাজ। আমরা অনেক পেছিয়ে গেছি জন-সংযোগের ক্ষেত্রে।

এখানে গ্রাম তো খুবই কম, জন-সংখ্যাও কম। কয়েক বছর আগে এই এলাকায় প্লেগরোগ হয়েছিল ব্যাপকভাবে। সেজন্য গ্রামের মানুষরা পালিয়ে গেছে নীচে সমতল শহরে।

আমি জানি কিন্তু এর চেয়ে নিরাপদ স্থান তো আর নেই। অবশ্য জন-সংযোগ না হলে আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। সেজন্য

তোমাকে পাঠাচ্ছি। তুমি ইন্‌ফা ভাষা জান। আদিবাসীদের আচার-আচরণ জান। এই সব জানার জন্য তোমার পক্ষে জন-সংযোগ সৃষ্টি করা যত সহজ হবে, অন্য কারও পক্ষে তা হবে না।

আমি রাজি। এখুনি যেতে হলেও যাব।

বেশ। যাও শুয়ে পড়।

তানিয়া চলে যেতেই লোয়োলা বলল, আমাকে কোন কাজ দিলে না সিনর গুয়েভারা।

তোমার কথাই ভাবছি। তবে শেষপর্যন্ত তোমাকে রাজধানীতেই হয়তো পাঠাতে হবে অস্ত্র সংগ্রহ ও জন-সংযোগ সৃষ্টি করতে। কালকে তোমাকে প্রোগ্রাম দেব।

লোয়োলা ফিরল তার শোবার জায়গায়।

জ্যাকুইন কোথায়? তার সঙ্গে এর কোন যোগাযোগ নেই কয়েক মাস যাবত। যারাই সংবাদ সংগ্রহে গেছে তারাই ফিরে এসে কোন খবর দেয়নি। তাদের খুঁজে বের করে যোগাযোগ করার দায়িত্ব তানিয়ার। তানিয়া একাই গিয়েছে তাদের খোঁজে। লোয়োলা গেছে শহরে, সেখান থেকে লা-পাজ যাবার অভিপ্রায়। ওরা কামিরিতে এসেই শুনতে পেল বুস্তস আর ছবরের কথা। বুস্তসের স্ত্রী পেলাও তার স্বামীর মুক্তির জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেছে। তার স্বামী যে নিরপরাধ তা নানাভাবে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টাও করেছে। চতুর সামরিক গোয়েন্দাদের জেরায় বলতে বাধ্য হয়েছে তার সঙ্গে চে গুয়েভারার কি সম্পর্ক। তাদের সঙ্গে চে-র যে সাক্ষাত হয়েছিল, তাও বলেছে। তবে সেটা আকস্মিক ঘটনা। চে এসেছে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে আর বুস্তস এসেছে তার বৃত্তির জন্য। তার উদ্দেশ্য সন্ত্রাস সৃষ্টি নয়, কোন চক্রান্তেও সে নেই।

কামিরিতেই বন্দী হয়ে আছে ছবরে। তার বিরুদ্ধে পেনাল

কোডের সব রকম অভিযোগ আছে, একমাত্র নারীধর্ষণ বাদে। এই অভিযোগ থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। অবশ্য তখনও তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি। কেবল মাত্র তদন্ত হচ্ছে। হুবরের বিচার হবে সব দলিল-পত্র সাক্ষ্য প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে সরকারের হেপাজতে এলে।

খবরগুলো যাচাই করে লোয়োলা আবার ফিরে গেল মুক্তি-ফৌজের দুর্গম শিবিরে। সংবাদ পরিবেশন করে লোয়োলা যেন হতাশবোধ করছিল। চে তাকে উৎসাহিত করতে বলল, এর চেয়ে কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের কিউবার বিপ্লবে। এখানকার আর ওখানকার পার্থক্য শুধু জন-সংযোগের। আর সব কিছুই এইভাবে ঘটেছে উভয় ক্ষেত্রেই। সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে বহুবার আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই পরাজয়ের পরই সহকর্মীদের মধ্যে কোন রকম হতাশা দেখা যায়নি। বরং তারা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নেমে পড়েছিল। আমাদের পরাজয়ের পরই সন্দেহক্রমে সিয়েরা (পাহাড়া) ময়েস্ত্রার চাষীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করে বাতিস্তার ফৌজ। সেজন্য আমাদের সম্বন্ধে উৎপীড়িত চাষীদের কোন আগ্রহ ছিলই না। এমন কি আমাদের উপস্থিতি তারা সহ্য করতে পারত না। অনেক সময় ভয়েই তাদের পালিয়ে থাকতে হত। অনেকে সাহস করে এগিয়ে এসে আমাদের কাজের সমালোচনা করত, আমরা যে ভাল কাজ করছি না, সে কথাও বলত। যদি বাতিস্তার ফৌজ জানতে পারে যে আমাদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে অথচ তাদের খবর দেয়নি, তা হলে তাদের উৎপীড়ন করবে—এমন শঙ্কাও প্রকাশ করত। বাস্তবত এ পাশবিক উৎপীড়ন করত তারা। আমরা যে তাদের বিপদের মধ্যে টেনে নিতে চাই এই বিশ্বাস জন্মেছিল তাদের মনে। সেজন্য তারা আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকত। এখানেও অবস্থা অনেকটা সেই রকমই। তবে আমরা যে ভাবে সেখানে ধীরে ধীরে

জনমনে স্থান করেছিলাম, সে রকম এখানে পারিনি। তার কারণ এখানে জন-সংখ্যা কম এবং যারা আছে তারা কায়েমীস্বার্থেরই লোক। তাদের স্বার্থহানির ভয়ে কোনক্রমেই আমাদের সঙ্গে সহায়তা করছে না।

চে থেমে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বলল, অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হবে। আমাদের সাফল্য ওদের ডেকে আনবে আমাদের কাছে। আমরা যদি এই পার্বত্য বন এলাকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারি, তা হলে এই এলাকার কৃষকরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। আমাদের হাতিয়ার হল আমাদের নৈতিক চরিত্র ও শৃঙ্খলা, "Our basic weapons are our moral and our discipline." কিন্তু এটারই কিছু অভাব ঘটছে লোয়োলা। আমি সেটাই ঠিক করতে চেষ্টা করছি।

তবে নৈতিক চরিত্র বলতে যা আমরা বুঝতাম, তা এখন আর নেই। সমাজ-ব্যবস্থার গতির ওপর নির্ভর করে কোনটা নৈতিক চরিত্র নয়। সাম্রাজ্যবাদী বিজেতারা বিজিত দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে, বিশেষ করে নারীদের অবমাননা করে, ধর্ষণ করে। অথচ এই কাজকে তারা নীতিহীনতা মনে করে না। তারা মনে করে, "The women of the conquered became part of the partimony of the conquerors"—এ চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে। এই সব নীতিহীন অত্যাচার করেছিল জার্মান বাহিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জার্মান বাহিনী ফ্রান্সে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ফরাসীরা তবুও মাথা নত করেনি, তারা লড়াই করেছে দূর দেশে আশ্রয় নিয়েও। এই যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসিক ক্ষমতা এটাই হল মুক্তিযোদ্ধাদের নৈতিক চরিত্র। যুগোশ্লাভরা তাদের শতগুণ বেশি শক্তিশালী জার্মানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। কারণ তাদের ছিল দৃঢ় নৈতিক চরিত্র। স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধে রুশীয় সাধারণ মানুষ এই নৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিল। জার্মান বাহিনীর

নৈতিক শক্তি ছিল না, ছিল মারণাস্ত্র। তাই তাদের পরাজয় ঘটেছে। আমাদের এখানে যারা যুদ্ধ করছে, তাদের নৈতিক চরিত্র গঠন হল বড় কাজ। মৃত্যু অথবা মুক্তি। তার বাইরে চিন্তা করার মত অবসর থাকবে না কারও। সম্পদ লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ যারা করে, তাদের পক্ষে দৃঢ় মনোবল কোন সময়ই থাকতে পারে না, তাদের পরাজয় নিশ্চিত।

তোমার কি মনে হয় আমাদের এই বাহিনীতে এই চরিত্রগঠন সম্ভব হয়নি ?

তাও বলতে পারি না। হয়েছে, কিন্তু not upto the standard, ঠিক ট্রেনিং সম্পূর্ণ হয়নি। চরিত্র দৃঢ় হলে শৃঙ্খলাবোধ জাগে। শৃঙ্খলাবোধ জন্মালে মুক্তিফৌজ হবে অজেয়। এই রকম অজেয় মুক্তিফৌজ গঠিত হয়েছিল কিউবাতে। আমাদের মধ্যে যাদের মনে করেছি দুর্বল অথবা অযোগ্য অথবা বিপ্লবের স্বার্থ-হানিকর, তাদের বাছাই করে বিদায় দিয়েছিলাম। এখানেও সে চেষ্টা করছি। তবে বর্তমানে আমার সহকর্মী যারা রয়েছে, তাদের মনোবল সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ নেই।

আমি ঠিক জয়ের আশা পোষণ করতে পারছি না।

কেন ?

জন-সংখ্যার অপ্রতুলতা।

আমিও সেজন্য চিন্তিত। শৃঙ্খলা আনতে পারলে আনুগত্য বোধ জাগবে। আনুগত্য থাকলে এদের দিয়ে মহত কাজ করান যাবে, তখন জন-সংখ্যার স্বল্পতা হ্রাস হবে। জনতার মনে বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারলে তারা হাত বাড়িয়ে দেবে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। আমি দেখছি কাজ করতে অনেকেই গরিমসি করে, কিন্তু সামরিক জীবনে সৈনিক must obey orders at once—আদেশ পাওয়া মাত্র তা পালন করবে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তাকে মনে রাখতে হবে সে একটি সামাজিক জীব এবং শ্রেণী-

হীন সমাজ গঠনের জন্যই সে ত্যাগধর্মী, সেজন্য সমাজ সচেতনতা ও তার সঙ্গে বিচার-বুদ্ধি থাকাও তার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে যদি পবিত্র না হওয়া যায়, তা হলে বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধা সে হতে পারে না।

দ্যবরে বর্তমানে একটা বিরাট সংবাদ।

তার বিচার হবে।

চে-র সঙ্গে দ্যবরের সম্পর্ক সম্বন্ধে বারিয়েনতোস নিঃসন্দেহ।

কিন্তু!

দ্যবরে চে-র সঙ্গে দেখা করলেও মোটেই চে-র এই বৈপ্লবিক কাজের সঙ্গে কোন রকমেই যুক্ত ছিল না। যখন দ্যবরে আর বুস্তসকে গ্রেপ্তার করা হল, তখন জেরার উত্তরে বুস্তস জানিয়েছিল দ্যবরের সঙ্গে বলিভিয়ার এই বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই। বুস্তস নিজেও চে-র অনুগামী নয়। সে এসেছিল বিপ্লবীদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করে গোরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে।

বাস্তবত এদের কেউ-ই বলিভিয়ার মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। তাদের বিচার চললে অবিচারই বুঝায়। বলিভিয়া কেন, পৃথিবীর তাবৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশে দ্যবরের বিচার নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে আর অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। কারও সঙ্গে কারও জানা-শোনা থাকা কোন অপরাধ নয়। আইন একথা স্বীকার করে না বলেই জানাশোনাকে চক্রান্ত মনে করে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে আইনকে ফাঁকি দিতে।

আগস্ট মাস কেটে গেল।

জ্যাকুইনের খবর আর নেই। তবে মুক্তিযোদ্ধারা যে বেশ

সক্রিয়, সে বিষয়ে চে-র কোন সন্দেহ ছিল না। মাঝে মাঝে বলিভিয়া বেতার-সংবাদে, কখনও আরজেনটিনার বেতার-সংবাদে, কখনও ভয়েস অব আমেরিকার বেতার-সংবাদে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাদের খবর ভেসে আসে কানে। সংবাদ পেয়েছে জ্যাকুইনের অনুগামীদের কেউ কেউ বন্দী হয়েছে শত্রুদের হাতে। বন্দীদের জবানবন্দী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। এতে দলের অন্যান্য সহকর্মীদের ওপর কিছু প্রভাব বিস্তারও করেছে।

হাঁপানীর টানে কষ্ট পাচ্ছে চে। তবুও বিশ্রাম নেই।

ওষুধ ফুরিয়ে গেছে। মাত্র কয়েকটা বড়ি সম্বল। ওষুধ না আনলে কাজের ক্ষতি হতে পারে। হাঁপানীর টানে আটকে পড়লে অগ্রসর হতে পারবে না। চিন্তায় চিন্তায় আশঙ্কা জাগে, অবশ্য নিজেকে নিয়ে। আবার জলের অভাব। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে হচ্ছে। জল নেই। তৃষ্ণায় সবাই ছটফট করছে, ছুটছে এদিক-ওদিক একবিন্দু জলের আশায়।

চে ডাকল মিগুয়েলকে।

কৃষকরা আমাদের সহযোগিতা করছে না, তা জানো ?

জানি।

কেন ? তোমরা তাদের বুঝিয়ে দিতে পারনি নিশ্চয়ই। আমাদের উদ্দেশ্য, কাজের ধারা কিছুই জানে না তারা।

জানে মেজর সাহেব। কিন্তু তারা আমাদের সম্বন্ধে কোন ভাল অভিমত পোষণ করে না।

কেন ?

কারণ ওরা আমাদের দস্যু মনে করে। বলিভিয়া সরকার ও মনজের কম্যুনিষ্ট পার্টি অনবরত প্রচারকার্য চালিয়ে জনমনে ভীতির সঞ্চার করেছে। তাই বাইরে আমাদের সঙ্গে কোন অসদ্ভাব সৃষ্টি করতে না চাইলেও ওরা আমাদের ক্ষুদে শত্রু। আমাদের বিদ্রূপ করে। আমাদের ঘৃণা করে এবং সুযোগ পেলে আমাদের শত্রুর

হাতে তুলে দিতেও পেছ-পা নয়। আমাদের এই পাহাড়ের নীচে যে গ্রাম তার মোড়ল হল ফিলিপ। অনেক গরু ঘোড়া আছে, বেশ কয়েক হেক্তর জমির মালিক। তার স্ত্রী ম্যাদাম ফিলিপের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম ওদের মনের কথা।

কি বলল ম্যাদাম ফিলিপ?

ম্যাদাম ফিলিপ বলল, তোমরা এদিকে এস না বাপু। সরকারী ফৌজ জানতে পারলে আমাদের তছনছ করে দেবে।

চে বলল, ওরা ভয় পেয়েছে। ভয় ভাঙানো আমাদের উচিত।

ভয় নয়, মেজর সাহেব। ওরা আমাদের অপছন্দ করে। বুড়ী বলল, তোমরা লোকের ঘর থেকে খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছ।

চে আশ্চর্য হয়ে বলল, এমন ঘটনা তো কখনও হয়নি।

হয়েছে। তবে ছিনিয়ে নেওয়া নয়। আমাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছিল যে স্কুল-মাষ্টার, তার ঘোড়াটা বাজেয়াপ্ত করেছিলাম। সেইটেই বুড়ী বলল। অথচ বুড়ীর একটা জোয়ান মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে গেছে ফৌজের একজন অফিসার।

তার সম্বন্ধে বুড়ী কি বলল?

বলল, ভালই হয়েছে। মেয়েটা সুখেই আছে। এখান থেকে তাকে কামিরিতে চালান করে দিয়েছে, তাতেও বুড়ী দুঃখিত নয়। মনে হয়, কিছু নগদ টাকা পেয়েছে বুড়ী।

আমাদের সহকর্মীদের মনোভাব কি?

কিছুটা হতাশা দেখা দিয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, এ মাসের যুদ্ধে সরকারী সৈন্য নিপাত করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। এখন দেখছি মাত্র একজন সরকারী সৈন্য জখম হয়েছে। আমাদের ক্ষতিও কম হয়নি। তাই কিছু হতাশা দেখা দিয়েছে। তবে আমার মনে হয় তা সাময়িক। আবার তারা মনোবল ফিরে পাবে। আবার তারা পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধে নামবে।

চে বলল, আমিও এটা লক্ষ্য করেছি। আমাদের আদর্শ

ও মনোবল যেন পেছিয়ে পড়ছে। আমাদের কাজ হবে সব সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। যারা দূরে আছে, অনেক কাল অজ্ঞাত রয়েছে, তাদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করতে হবে। আমাদের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র ও ওষুধের অভাব ঘটেছে, এই ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা কর। প্রত্যেক যোদ্ধাকে উৎসাহ দিয়ে তাদের মনোবল অটুট রাখার ব্যবস্থা কর। এ বিষয়ে সব সহকর্মীদের সজাগ হতে বল।

মিগুয়েল মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিল।

হোনোরাতো মুক্তিযোদ্ধাদের কিছু-কিছু সাহায্য করত। একদিন সরকারী ফৌজ এসে তার বাড়ি দখল করল। তার বাড়িতে যা কিছু ভক্ষদ্রব্য ছিল, তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আর হোনোরাতোকে গুরুতরভাবে প্রহার করল তার স্ত্রীর সামনে। এই সৈন্যদের সঙ্গে মুখোমুখী হল মুক্তিযোদ্ধারা। তারা খবর পেল একজন কৃষক একজন সৈনিককে নিয়ে হোনোরাতোর বাড়ির দিকে আসছে। এস্তাকিউও তাদের দেখতে পাওয়া মাত্র গুলি করল। কিন্তু গুলিতে তারা কেউই আঘাত পেল না। তারাও গুলি করে পালাতে থাকে। তাদের ঘোড়াটাকে গুলি করে হত্যা করল এস্তাকিউও।

রেডিও-র সংবাদ শুনে আশ্চর্য হয়েছে সবাই। কামিরিতে জ্যাকুইনের পরিচালিত মুক্তিযোদ্ধাদের দশজনকে হত্যা করেছে শত্রুরা। জ্যাকুইনের এই পরাজয়ের সংবাদ শুনে সবাই একটু চমকে উঠল। জ্যাকুইনের বিপর্যয় ছিল কল্পনাতীত।

সংবাদ পেল ভয়েস অব আমেরিকা থেকে, স্থানীয় বেতারকেন্দ্র সব নিস্তব্ধ। তারা কোনই মন্তব্য করেনি গোরিলা যুদ্ধ সম্বন্ধে।

আবার এক উৎপাত।

জঙ্গলে বাঘের উৎপাত। বাঘকে বধ করতে হলে বন্দুকের আওয়াজ হবে। শত্রুরা জানতে পারবে অবস্থান। লাঠি দিয়েই বাঘ তাড়াতে হবে। নেহাত দরকার না হলে গুলি ছোঁড়া নিষেধ।

খবর এল হোনোরাতোকে বাঘে কামড়েছে।

ভ্যালে গ্রাঁদেতে হোনোরাতো শয্যাশায়ী। ক্ষতগুলো তখনও শুকোয়নি। ধীরে ধীরে আরাম হচ্ছে। একে সরকারী ফৌজের অত্যাচার, তার ওপর বাঘের অত্যাচার! তবুও শক্ত মন নিয়ে রয়েছে হোনোরাতো।

ম্যাদাম হোনোরাতো স্বামীর সেবা করছে। মাঝে মাঝে মুক্তি-যোদ্ধাদের জন্যও ব্যবস্থা করছে।

দুটি সন্তানকে নিয়ে ম্যাদাম হোনোরাতো তার বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়ি গিয়ে দেখল চল্লিশজন সরকারী ফৌজ তার বাড়ি দখল করে রেখেছে। সঞ্চিত খাবার নিয়ে যাবার চেষ্টায় ছিল তারা।

ম্যাদাম হোনোরাতো বাধা দিতেই বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে এল শত্রুরা। ম্যাদামের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে এসে বলল, এই শালী হল ডাকাতের সাকরেদ। পেটাও শালীকে।

ম্যাদাম হোনোরাতোও আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করছিল, এই সময় মুক্তিযোদ্ধারা হাজির হল সেখানে।

দুপক্ষেই গুলিবর্ষণ চলল। সরকারী ফৌজের একজন সৈন্য নিপাত হতেই তারা চেষ্টা করল চারিদিক থেকে মুক্তিফৌজকে ঘিরে ফেলতে। অবশেষে মুক্তিফৌজের গুলির সামনে দাঁড়াতে না পেরে পালাতে সুরু করল। যাবার সময় একদানা খাবারও তারা নিয়ে যেতে পারেনি।

খবর পেয়ে বিমানবাহিনীও আক্রমণ করল। আকাশ থেকে ছোট ছোট রকেট ছুঁড়ে হোনোরাতোর বাড়ির চারপাশে আগুন লাগিয়ে দিল।

তারপরই সব শান্ত। শত্রু পালিয়ে গেছে।

বিশ্বাসঘাতকদের নিয়েই বেশি চিন্তিত হল চে স্বয়ং। জোস ক্যারিলো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। শত্রুকে মুক্তিযুদ্ধ ও যোদ্ধাদের সম্পর্কে বহু সংবাদ দিয়েছে জোস। এই সংবাদের ভিত্তিতে শত্রুরা

মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান, কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে কাজে নেমেছে।

হুবরের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করেছে জোস। হুবরে যে মুক্তিযোদ্ধা, তা প্রমাণ করতে জোস অনেক আজগুবি কাহিনী জুড়ে দিয়েছে। হুবরে যে বন্দুক নিয়ে শিকারে গিয়েছিল, সেই ঘটনাকে গোরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা বলেই বর্ণনা করেছে। হুবরের বিরুদ্ধে যে মামলা তাতে তার সাক্ষ্য বেশ মূল্যবান বলেই মনে করছে সরকারী পক্ষ। অথচ সবটাই মিথ্যা।

জোসের বিশ্বাসঘাতকতা, জ্যাকুইনের কামিরি জোনে পরাজয় ও মৃত্যুর সংবাদের পর রেডিওতে খবর এল রিও গ্রাঁদেতে তানিয়া শত্রু-হস্তে নিহত হয়েছে। তানিয়ার মৃতদেহ সান্তাক্রুজে নিয়ে গেছে শত্রুপক্ষ।

বলিভিয়ান মুখপাত্র জানাল, কামিরি জোনে কিউবান মুক্তি-যোদ্ধা ও বলিভিয়ান মুক্তিযোদ্ধাদের নেতা জ্যাকুইন সদলে নিহত হয়েছে বলিভিয়ান রেনজার ডিভিশানের হাতে। আরও প্রকাশ, এই যুদ্ধে গোরিলাদের সেরা যোদ্ধারা নির্মূল হয়েছে। এই যুদ্ধেই গোরিলা দলের নেত্রী তানিয়াও নিহত হয়েছে।

চে গুয়েভারাও যুদ্ধে মারা গেছে, এই সংবাদ ও গুজব শোনা গেল। এই সংবাদ ও গুজব প্রচার হয়েছে লা-পাজ বেতার থেকে।

সংবাদ শুনে বিশ্বাস করতে পারছিল না চে।

ভয়েস অব আমেরিকার জ্যাকুইন ও তানিয়ার মৃত্যু সংবাদকে সমর্থন করেনি স্থানীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠান।

নিজের মৃত্যু সংবাদ শুনেও চে আশ্চর্য হয়নি।

যোগাযোগ ব্যবস্থা মোটেই রক্ষিত হয়নি। সংবাদ যাচাই করার ক্ষেত্রে তার বাহিনী অক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, তা বুঝেও কিছু করতে পারছিল না।

অবশেষে সংবাদ পেল চে।

জ্যাকুইন তার সঙ্গীদের নিয়ে য়্যামবুশ করেছিল (অতর্কিত আক্রমণের ব্যবস্থা)। কিন্তু তারই দলচ্যুত গণজালেস আর পাপীও কিছুকাল আগে বন্দী হওয়াতে ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। বলিভিয়ান বেতারে আত্মসমর্পণকারী গোরিলাদের প্রাণভিক্ষা দেওয়া হবে—এই প্রচার শুনেছিল তারা দুজনেই। বন্দী অবস্থায় গণজালেস বলল, আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছি। আমাকে দয়া প্রদর্শন করা হোক।

দয়া প্রদর্শন তাকে করেছিল সামরিক কর্তারা কিন্তু জেরায় জেরায় তার কাছ থেকে কামিরি ও সন্নিহিত অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধা কোথায় কোথায় আছে আর কি ভাবে তারা আক্রমণ করবে, তাদের পথঘাট সব কিছুর হদিস করে সরকারী রেনজার বাহিনী অগ্রসর হল। অনেকটা জায়গা নিয়ে তারা ঘেরাও করল মুক্তিফৌজের পালাবার পথ বন্ধ করতে। তারপর শক্তিশালী একটা দল নানা অংশে বিভক্ত হয়ে গোপনীয় স্থানের দিকে এগোতে লাগল। সরকারী ফৌজের উদ্দেশ্য ও সংগঠন বুঝতে না পেরে গোরিলারা আক্রমণ করল। তারা যে ফাঁদে পড়েছে তা যখন বুঝতে পারল তখন পালাবার রাস্তা বন্ধ। মুখোমুখী যুদ্ধে দশজন মুক্তিযোদ্ধা ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। সেই মুক্তিযুদ্ধের সেনাদের অন্যতম জ্যাকুইন আর তানিয়া। কামিরি জোনের অগ্রগতি রুদ্ধ হল এই ভাবে।

তানিয়ার হাতে তখনও সাব-মেশিনগান, কার্তুজ আর ছিল না। অস্ত্রের অভাবেই তাকে শত্রুর গুলি বুকে পেতে নিতে হয়েছে। যদি তার কার্তুজ ফুরিয়ে না যেত, তাহলে পথ করে বেরিয়ে যেতে পারত বোধহয়। অন্যান্য যোদ্ধারাও না লড়ে মরেনি। সরকার পক্ষের এর চেয়েও অধিক পরিমাণ সেনার মৃত্যু হয়েছে হাতবোমায় আর সাব-মেশিনগানের গুলিতে।

এই মৃত্যু যে শহীদের মৃত্যু!

চে গভীরভাবে চিন্তা করছিল এই মর্মান্তিক পরাজয় ও লোকসানের কথা।

রিও গ্রাঁদের গোরিলা যুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভের পতন ঘটল, যা ছিল অকল্পনীয়।

সংবাদ পেল বারিয়েনতোস চুপ করে নেই। জন-সংযোগের জন্য অবিরত প্রচারকার্য করে চলেছে বারিয়েনতোস। নিয়মিত প্রচার-পত্র, পোস্টার ছেপে গোরিলাদের সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে অনুরোধ জানিয়েছে জনসাধারণকে। প্রত্যেক গ্রামেই প্রচারকারীরা যাচ্ছে, গোরিলাদের বিরুদ্ধে সতর্ক করছে। অপরিচিত লোককে দেখলেই যাতে নিকটবর্তী সামরিক ঘাঁটিতে সংবাদ দেয়, তার জন্যও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে পুরস্কারের প্রলোভন। পাঁচ থেকে এক হাজার ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে গোরিলাদের সম্বন্ধে সংবাদ দিলে।

এ পর্যন্ত এই পুরস্কারের ফাঁদে কেউ পা দেয়নি। একজন মাত্র কিছু তথ্য ফাঁস করে দেওয়াতেই কামিরিতে সরকারী এই সাফল্য।

আবার সরকারের যে সব এলাকায় প্রশাসন ব্যবস্থা চালু রয়েছে সে সব এলাকায় যথেষ্ট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যে। বিশেষ করে খনি অঞ্চলে এই অসন্তোষ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারী বাহিনীর সাফল্য ঘটলেও গোরিলাদের শক্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞান ছিল না সরকার পক্ষের। তাই আশঙ্কা ছিল খুবই বেশি। কখন যে কি হয়, সে সম্বন্ধে সবাই অনিশ্চিত।

তানিয়ার মৃত্যুতেই তানিয়া যদি শেষ হত, তা হলে মুক্তিযুদ্ধের গতি কোন পথ ধরত, তা বলা কঠিন। তবে তানিয়ার ডায়েরী ও অন্যান্য দলিলপত্র সরকার পক্ষের হস্তগত হওয়াতে অনেকটা সুবিধা পেল। তানিয়া তখন আলোচ্য বিষয়। তার ডায়েরী, অন্যান্য দলিলপত্র পড়ে গোয়েন্দাদের চোখ কপালে উঠল। তারা যে বিরাট সাফল্যলাভ করেছে এ বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। চে সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পেল এই সব দলিলে, বিশেষ করে গোরিলা সংগঠন সম্বন্ধে সরকার পক্ষ সতর্ক হবার সুযোগ পেল।

সংবাদ পৌঁছল চে-র কাছে।

চে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আরও কঠিন অবস্থার জন্য প্রস্তুত হল চে।

ইনতি এসে সব সংবাদ পরিবেশন করতেই চে বলল, ভয় পাওয়ার কিছু নেই ইনতি। আমরা যেদিন হাভানা দখল করি সেদিনকার একটা যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি। উনত্রিশে ডিসেম্বর আমাদের শেষ যুদ্ধ আরম্ভ হল। আমাদের প্রধান কর্ম-কেন্দ্র ছিল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। আমরা সেই কেন্দ্রকে সরিয়ে আনলাম শহরের মধ্যস্থলে। আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ করতে হচ্ছে এমন এক দল শিক্ষিত সৈন্যের বিরুদ্ধে, যাদের সঙ্গে আছে মার্কিন প্রদত্ত ট্যাঙ্ক আর বিমান। আমরা ওই ট্যাঙ্কবাহিনীকে পরাজিত করেছিলাম। তার জন্য আমাদের বহু বীর সহকর্মীকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মৃত আর আহতের দেহ আমরা কবরখানায় আর হাসপাতালে পাঠাতে থাকি। কবরখানায় কবর দেবার স্থান ছিল না। হাসপাতালে একটা বিছানার চাদর দেবার মত চাদরও কম পড়ে গেল। এত আহত আর মৃতের সংখ্যা! কিন্তু জয়লাভ করেছিলাম আমরা। এই দিনের যুদ্ধের সময় একজন সৈনিকের বীরত্ব কাহিনী আজও মনে আছে। তখন গুরুতর যুদ্ধ চলছে। সবাই শত্রুকে তাড়াতে ব্যস্ত আর একজন সৈনিক তখন ঘুমিয়ে আছে তার ব্যারাকে। তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করলাম, এখন কামান-বন্দুকের লড়াই চলছে, কানে তালা লাগার উপক্রম আর তুমি ঘুমচ্ছ কেন?

চোখ ডলতে ডলতে সৈনিকটি বলল, আমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে আমার কাছ থেকে আমার ওপরওলা বন্দুক কেড়ে নিয়েছে। যুদ্ধ করার মত অস্ত্র তো আমার নেই।

আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম, নেই তো কি হয়েছে। ছুটে গিয়ে শত্রুর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নাও, শত্রুর অস্ত্র দিয়ে শত্রু বধ কর।

খালি হাতে যাও আর অস্ত্র হাতে ফিরে এস। তবেই তো তোমার বীরত্ব প্রমাণিত হবে। যদি মানুষের মত যোগ্যতা থাকে, তার প্রমাণ দাও।

আমার কথা শোনামাত্র সৈনিক যুবকটি লাফিয়ে উঠে বেরিয়ে গেল ব্যারাক থেকে।

রাতের বেলায় হাসপাতালে আমাদের আহত সৈন্যদের দেখতে গিয়েছিলাম। আমার হাত স্পর্শ করে একজন মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিক বলল, দাঁড়াও মেজর সাহেব।

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

আমাকে চিনতে পার?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম। মাথা নেড়ে বললাম, হাঁ।

তুমি আমাকে বন্দুক আনতে বলেছিলে। খালি হাতে যুদ্ধ করে বন্দুক আনতে বলেছিলে।

বললাম, হাঁ।

এই দেখ এনেছি। শত্রু মেরেছি, বন্দুক এনেছি, এবার অপার শান্তিতে মরতে পারব।

আমি তাকিয়ে দেখলাম। হয় তো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু হবে কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হল "he was pleased to have proved his courage"—সে তার বীরত্ব প্রমাণ করে খুশী হয়েছিল। মৃত্যুর জন্য তার ক্ষোভ ছিল না। আমাদের বিপ্লবী সেনার এই একটি উদাহরণ। আজ বলিভিয়াতেও এই বীরত্ব প্রদর্শন করতে হবে তোমাদের। এর জন্য প্রস্তুত হও ইনতি।

বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কি করে পেরে উঠবে মেজর সাহেব? প্রশ্ন করল ইনতি।

আমরা এতে অভ্যস্ত। প্রাথমিক অবস্থায় আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, সেগুলো সামলে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।

বিঘ্ন ও বিপদ—এই তো আমাদের বন্ধু। কেন ভাবছ ইনতি! আমাদের কিউবার শেষ যুদ্ধের দিনে আমরা একটা ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকের পাল্লায় পড়েছিলাম। তা থেকে যখন বেঁচেছি, তখন এগুলো থেকেও বাঁচব। তিরিশে ডিসেম্বর তারিখে বাতিস্তার সঙ্গে শেষ যুদ্ধ। বাতিস্তা তখন পালিয়েছে। বাতিস্তার বাহিনী আত্ম-সমর্পণ করতে চাইছে। আমরা আমাদের সেনাধ্যক্ষ কানটিলোকে এই বাতিস্তা বাহিনীর আত্মসমর্পণকারীদের আটক করার নির্দেশ দিলাম, কিন্তু কানটিলো তা করল না। সে বলে পাঠাল, আমি ফিদেল কাস্ত্রের নির্দেশে যুদ্ধ করছি। তার আদেশ ভিন্ন অন্যের আদেশ অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সামরিক বিভাগের আদেশ শুনতে রাজি নই। আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফিদেলকে সংবাদ দিলাম। বললাম, কানটিলোর আচরণ সন্দেহজনক। ফিদেল বলল, কানটিলো বিশ্বাসঘাতক। তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে বাতিস্তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পালিয়ে যাবার সুযোগ পেয়েছে। কানটিলোকে বন্দী করা হয়। সৈন্য-বাহিনীর দায়িত্ব দেওয়া হল জেনারেল বারকিনকে। এত বড় পদাধিকারী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তাহলে যাদের কোন রাজনৈতিক শিক্ষা নেই, যারা দারিদ্রের পীড়নে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে, সামান্য প্রলোভনকে যারা জয় করতে পারেনি, তারা যদি টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে বলতে পার। এ তো নতুন কিছু নয়। এই তো সব চেয়ে স্বাভাবিক বাস্তব ঘটনা। আমরা শুধু প্রস্তুত থাকব।

আমাদের খাবারের অভাব ঘটেছে মেজর সাহেব।

আমাদের সঙ্গে একটা মাদী ঘোড়া আছে।

ওই ঘোড়াটা আমাদের অনেক সেবা করেছে। বড় বড় খাল-খন্দ ওর সাহায্যেই পার হয়েছি। আর আমাদের ভারবাহী সঙ্গী এখন ঐ একটি মাত্র। অপর ঘোড়া এখনও এসে পৌঁছয়নি। কবে আসবে তার ঠিক নেই।

চে বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমাদের একজন সহকর্মীর জীবনের যা মূল্য তার সমান মূল্য ওরকম একহাজার মাদী ঘোড়ারও নয়। আমরা যদি না বাঁচতে পারি তা হলে ওকে রেখে লাভ কি। যে আমাদের ভারবাহী ছিল তার ভার বহনই আমাদের পক্ষে কষ্টকর হবে। আজ যদি জীবন দিতে হয় অনাহারে, তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কি থাকতে পারে বল। ওটাই আমাদের কয়েক দিনের আহার্য হবে। আমি চাই না ওকে হত্যা করে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটুক। আমরা চাই শুধু বাঁচতে, কেন না লড়াই আমাদের করতে হবে। আমাদের মৃত্যু হোক যুদ্ধক্ষেত্রে, ক্ষুধার বলি হতে চাই না আমরা। এ রকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাদের বহুবার। একবার কিছুই খাবার নেই। অনাহারে প্রাণ যায় যায়। গ্রামের চাষীদের ঘরে আহার্য চেয়ে আমরা নিরাশ হয়েছি। আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্যামিলো তো ক্ষিধের জ্বালায় পাগল হবার উপক্রম। অবশেষে একটা কৃষক বাড়িতে খাবার পেলাম। সবাই খেলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা অসুস্থ হয়ে পড়লাম। খাবারে কোন বিষাক্ত পদার্থ পড়েছিল নিশ্চয়ই। ক্যামিলো হয়েছিল সবচেয়ে বেশি অসুস্থ।

আমি ডাক্তার। আমি অসুস্থ, তবুও আমাকেই চিকিৎসার দায়িত্ব নিতে হল। ক্যামিলোকে আলাদা থাকার ও খাবার ব্যবস্থা করে আমি তার তত্ত্বাবধান করতাম। সেদিন যদি ক্যামিলোকে আলাদা করে না রাখতাম তা হলে আমাদের একজন প্রিয় নেতা ও বীরকে হারাতে হত। ক্যামিলো আরোগ্যলাভ করল, ক্ষুধার যে কি জ্বালা তা ক্যামিলো ভাল করে বুঝল। সুস্থ ক্যামিলো ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামল। আমাদের আজ যে ক্ষুধা, এই ক্ষুধার জ্বালা আমাদের প্রেরণা দেবে মানবজাতির ক্ষুধা মোচনে। ভয় পেও না ইনতি। ইতিহাসের গতি আমরা রোধ করতে পারব না।

দারিও দল ছেড়ে যেতে চায়।

আমার কোন আপত্তি নেই। তবে দল ছেড়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে যেমন বিপদজনক, তেমনি বিপদজনক তার পক্ষেও। আমাদের এটা উদ্বাস্তুর আশ্রয় শিবির নয়। যে থাকবে তাকে চিরকালের মতই থাকতে হবে। এটা যদি সে মেনে নিতে পারে তা হলে থাকুক, নইলে তাকে পথ দেখিয়ে দাও ফিরে যাবার। আমরা এখানে এসেছি আদর্শের পূর্ণতা আনতে। আমরা হঠকারিতা করতে আসিনি।

ইনতি ইতস্তত করে বলল, আজকের সংবাদ শুনেছ মেজর-সাহেব?

কোন সংবাদ?

ছ্যবরের বাবাকে গুলি করে মারা হয়েছে।

চমকে উঠল চে।

বলল, সত্যি!

হাঁ। ছ্যবরের কাছে তার নির্দোষিতা প্রমাণের যত কাগজপত্র ছিল সব বাজেয়াপ্ত করেছে বারিয়েনতোস সরকার। উদ্দেশ্য সে যাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে না পারে।

স্বাভাবিক। ছ্যবরেকে শাস্তি দেবার অজুহাত। অন্য কোন খবর আছে কি?

না।

তুমি গিয়ে দারিওকে বুঝিয়ে বল। আশাকরি সে একটাই পথ বেছে নেবে।

আমারও বিশ্বাস তাই। আজ রাতে তা হলে বিশ্রাম। সবাইকে তা হলে বলে দি।

রাত তখন শেষ হয়েছে। সকালের আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত গোরিলাদের মুখে। চে তখন ঘুম থেকে উঠে পুরানো

কাগজপত্র খুলে দেখছিল। প্রথমেই নজরে পড়ল তার লেখা কতকগুলো পত্রের নকল। প্রথমখানা লিখেছিল তার বন্ধু জোস্-ই· মাত্রি লেয়ভাকে সাতান্ন সালের পাঁচই ফেব্রুয়ারী। চে তখন লা কাবানার সামরিক বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ। চে লিখেছিল: সানতো ডোমানিগোর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করার তোমার যে উদারতাপূর্ণ আগ্রহ তার জন্য আমি অতিশয় আনন্দিত। যখন সুযোগ আসবে, তখন তোমার এই উৎসাহ কাজের হবে। সেই ভবিষ্যৎ সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে তোমাকে। তোমার মহত্বপূর্ণ ও স্বার্থহীন এই আগ্রহকে আমি মূল্য দিয়েই এই কথা বলছি। তুমি এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তোমার শিক্ষাকে স্বার্থক করাই তোমার কাজ। তারপর তুমি নিজেকে সমাজের উপযোগী মানুষ করে গড়ে তোল। কারণ এই রকম উপযোগী মানুষের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে আমাদের এই কিউবাতে। আশা করছি তুমি সেই উপযোগী মানুষের একজন হবে।

ঝাপসা স্মৃতি !

স্কুলের জোয়ান ছেলে মুক্তিযুদ্ধে আসতে চেয়েছিল। চে তাকে উৎসাহ দেয়নি। চে তাকে মানুষ হতে উপদেশ দিয়েছিল। মুক্ত দেশের জন্য সেবাব্রতী মানুষের দরকার। তা না হলে দেশকে গড়বে কে? সেই ভয়ঙ্কর দিনে চে এই সত্য উপলব্ধি করেছিল। সন্ত্রাস অথবা সমাজ বিরোধ সৃষ্টি করা তাদের কাজ নয়। তাদের কাজ হল আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করা। তাই লেয়ভাকে পাঠ্যজীবন শেষ করার উপদেশ দিয়েছিল।

চে-কে সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কটু কথাও বলেছে অনেকে।

সাংবাদিক মনতেজ তাকে যেভাবে আক্রমণ করেছিল Carteles নামক পত্রিকায় তার প্রতিবাদ জানিয়ে চে পত্র দিয়েছিল কারলোস ফ্রানকি-কে।

মনতেজ বলেছে, মেজর গুয়েভারা তারারাতে তার বাড়িঘর করে বাস করছে। (অবশ্য বেশ সুখে ও সপরিবারে)।

চে লিখেছিল : আমি মনতেজের পরিচয় নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাই না। তার সম্বন্ধে আমার দপ্তরে যে সব সংবাদ আছে তাও বলতে চাই না। আমি অভিযোগ ও প্রত্যাভিযোগ করতে অভ্যস্ত নই, আমার স্বভাবও তা নয়। আমার ওপর যে জনসাধারণ বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে তাদের প্রতি আমার কর্তব্য রয়েছে। জন-মতকেই আমি শ্রদ্ধা করি বিপ্লবী হিসেবে।

তুমি Revolution কাগজের সম্পাদক। তোমার পাঠকদের অবগতির জন্য এই পত্র দিচ্ছি। আমি অসুস্থ। আমার এই রোগ জুয়াখেলার দরুণ অথবা ক্লাবে মদ্যপান অথবা নারী সঙ্গলাভে রাতের পর রাত কাটাতে সৃষ্টি হয়নি। আমি আজ যে শয্যাগত তা কেবল আমার বৈপ্লবিক কার্যের জন্য এবং আমার সামর্থমত আমি বিপ্লবকে রূপায়িত করেছি।

চিকিৎসকরা বলেছে, হাভানা থেকে কিছুদূরে দর্শকদের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য কোন বাসস্থানে থাকতে হবে। সম্পদ বিভাগের মন্ত্রী আমাকে এই বাড়িতে থাকতে অনুমতি দিয়েছে। আমার রোগমুক্তি পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতে বলেছে। আমি একটা নিম্ন মধ্যবিত্ত বাতিস্তাপন্থীর বাড়ীতে বাস করতাম। কারণ আমার বেতন মাত্র একশত পঁচিশ স্টারলিং। আমার পক্ষে এই বেতনে এর চেয়ে ভাল বাড়িতে বসবাস করা সম্ভব নয়।

আমি সিনর মনতেজকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি নীরোগ হবার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাসস্থান পরিত্যাগ করব। আমার এই পত্র জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করলে খুবই বাধিত হব।

পড়া আর এগোল না।

গুলির শব্দে সবাই লাফিয়ে উঠল ভূমিশয্যা থেকে। শত্রু যে অতি নিকটে সে বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ ছিল না।

চে কাগজপত্র গুছিয়ে ন্যাপস্যাকে ভর্তি করে তার অস্ত্র সাব-মেসিনগান হাতে করে তাকিয়ে দেখতে থাকে। যে দিক থেকে গুলির আওয়াজ এসেছে সেদিকে ও উল্টোদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গোরিলা বাহিনী আরও নিরাপদ এলাকার দিকে এগোতে থাকে।

সবাই ক্লান্ত।

অগ্রগামী সৈন্যদের নিয়ে মিগুয়েল এগিয়ে গেল।

য়্যাণ্টোনিও পেছনের বাহিনী নিয়ে অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হল।

ঘোড়ার পিঠে চেপে সবাই এগিয়ে যাচ্ছিল। চে-র হাঁপানীর টান উঠতেই ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হেঁটে চলতে থাকে। কাঁপতে কাঁপতে মাঝে মাঝে থামতে থাকে, আবার পথ ধরে চলতে থাকে।

খাবার চাই মেজর। খাবার ফুরিয়ে গেছে।

চে শুধু হাসল।

অনেকক্ষণ ধরে হাঁপাতে হাঁপাতে থামল, বলল, খাবার চাই! আমরা তো চাষী নই এখন, আমরা তো গোলদারী ব্যবসা করছি না। আমাদের খাবার সংগ্রহ করতে হবে। মূল্য দাও। খাবার পেতে অসুবিধা হবে না। আমার কিছু ওষুধের দরকার ছিল কমরেড। হাঁপানীর টান বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনজেকসন ফুরিয়ে গেছে। কটা বড়ি আছে, তাও খরচ করতে সাহস পাচ্ছি না। নতুন স্টক না পেলে যা আছে তা খরচ করলে কঠিন টান আরম্ভ হলে তখন ঠেকা দেবার কোন উপায় থাকবে না। তোমরা চেষ্টা কর খাবারের। মূল্য দিয়ে খাবার খরিদ কর যেমন করেই হোক।

কাম্বা এসে বলল, আরতুয়ো আর চ্যাপাকোর ঝগড়া আরম্ভ হয়েছে।

উত্তেজিতভাবে চে বলল, কেন? কেন?

চ্যাপাকো বলছে, আরতুয়ো তার বন্দুকের পনরটা গুলি চুরি করেছে।

আচ্ছা, আমি দেখছি।

বেতারের সংবাদ শুনেছ মেজর ?

কি সংবাদ ?

লোয়োলা বন্দী অবস্থায় দুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

বোধহয় বারিয়েনতোসের গেস্টাপো খুবই অত্যাচার করেছে, তার মর্যাদাহানি করেছে। তার মুখ থেকে মুক্তিসেনাদের খবর নিতে দানবীয় অত্যাচার না করলে দু-দুবার কেন আত্মহত্যা করার চেষ্টা করবে।

লোয়োলার বাড়ি তল্লাসী করে যা কিছু পেয়েছে তা নিয়ে গেছে। এসব থেকে আমাদের সন্ধান করতে চায় অথবা আমাদের ফটো পাওয়ার আশা করছে।

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। য়্যানাডিলোর খবর কি ?

বেনিগনো তাকে, তার স্ত্রীকে ও আরেকজনকে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছে।

তারপর ?

বেনিগনো কোথায় আছে, অর্থাৎ আমরা কোথায় আছি তা য়্যানাডিলো দেখে গেছে।

য়্যানাডিলোকে কেন যেতে দিল বেনিগনো ? কেন গুলী করে তাকে হত্যা করল না ! ওরা আমাদের গমনাগমনের পথ ও অবস্থান জানিয়ে দেবে শত্রুকে। বেনিগনো বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্থানীয় কৃষকদের জানিয়ে দাও, তাদের যেতে হবে জিটানোতে আমাদের সঙ্গে। ওদের পেছনে রেখে গেলে শত্রুর সুবিধা হবে। য়্যানাডিলো আর তার স্ত্রী খুবই সুচতুর। তাদের সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। আমাকে মৃত অথবা জীবিত অবস্থায় ধরে দিতে পারলে বহু টাকা পুরস্কার পাবে, সে খবর সে জানে। সেজন্য এই সুচতুর দুর্জন সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে।

কাম্বা ফিরে গেল কাজে।

চে তার হ্যাপস্যাক থেকে অতীত দিনের চিঠিপত্র বের করে পড়তে থাকে। হাভানা থেকে উনষাট সালের জুন মাসের সাত তারিখে সিনর জোস রিকার্ডো গোমেজকে পত্র দিয়েছিল। গোমেজ আরজেনটিনার এজুইজোতে থাকত তখন। চে লিখেছিল, তোমাকে চিঠি দিতে বিলম্ব হল। তুমি জানো আমাকে অনেক কাজ করতে হয় এবং কাউকে চিঠি লিখতে হলে বিশেষ চেষ্টা করে লিখতে হয়। তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি ঃ যে আশীজন বিপ্লবী এখানে এসেছিল তারা সাবমেসিনগান ও মেসিনগান পেয়েছিল মেক্সিকোতে, আর বোমাগুলো মার্কিনমুলুকে তৈরী। আমাদের মধ্যে অতি কম সংখ্যক লোকই জীবিত ছিল, তখন আমাদের লক্ষ্য ছিল আত্মরক্ষার জন্য পালানো। আমরা চাষীদের ভাঙা ঘরে আশ্রয় পেয়েছিলাম, রাতের বেলায় মাইলের পর মাইল আমরা হাঁটতাম নিরাপদ এলাকায় পৌঁছতে। আমরা বড় বড় দল নিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করতাম না, ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুর কতকগুলো বিশিষ্ট ঘাঁটি আক্রমণ করতাম। আশাকরি তুমি সুস্থ আছ। আমার আন্তরিক অভিনন্দন নিও।

অপর চিঠিখানা চে লিখেছিল সেনর টিকোয়েতকে। টিকোয়েত মেক্সিকোর অধিবাসী। হাভানা থেকে মে মাসের সতের তারিখে লেখা চিঠিতে চে তার চিঠির উত্তর দিতে বিলম্ব কেন হয়েছে তা জানিয়ে অবশেষে লিখেছে, তুমি কিউবা আসতে চাও। তোমার কিউবা আসার ভাড়া আমি দিতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নেই। বিপ্লবী সৈন্যবাহিনীর মেজরকে আমাদের নিয়ম অনুসারে বেশ কষ্টকর জীবনযাপন করতে হয়। আমার বর্তমান বেতন কোন রকমে ভদ্রভাবে বাস করার মত। সেজন্য আমার সামর্থ্য নেই। তোমার চিঠি পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি, মোটেই বিরক্ত হইনি।

আকাশে ঘর্ঘর শব্দ। একটা বিমান সন্দেহজনকভাবে ঘোরা-

ফেরা করছে। চে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার মন-যোগ দিল তার পুরানো চিঠিতে।

হাঙ্গেরীর উজপেস্তে বাস করত ডাক্তার ফারনানডো বড়াল। একষট্টি সালের ফেব্রুয়ারীতে চে পত্র লিখেছিল তাকে। ডাক্তার ফারনানডো ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ অথচ তার সঙ্গে কয়েক মিনিটের জন্যও সাক্ষাত করার সময় পেত না। সময়ের অভাব, কাজের চাপ। এই কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাকে চিঠি লিখেছিল। ডাক্তার ফারনানডো ও তার স্ত্রীর ইচ্ছা হাভানায় এসে কাজ করে। চে তাদের সাদর আহ্বান জানিয়ে পত্র দিয়েছিল। সেই সঙ্গে জানিয়েছিল, এখানে কাজ করার অসুবিধা নেই। তবে বিলাসবহুল জীবনযাত্রার মত বেতন আমাদের এই বিপ্লবী সরকার দিতে অক্ষম। তোমার মা ও স্ত্রীকে নিয়ে আসতে পার, তোমাকে সব রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ঢেলে সেজেছি এবং সেখানে তোমার উপযুক্ত স্থান পাবে কাজ করার। এখানে গঠন-কাজ চলছে। বিপ্লবের পর বহু জিনিস ওলটপালট হয়ে গেছে। সেজন্য এখানে অনেক কিছু তোমার অযৌক্তিক মনে হবে। ধীরে ধীরে যে যে-কাজের উপযুক্ত সেই কাজ দেওয়া হবে। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন হল কারও কোন কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি না করা। এখানেই তোমার বাড়ি রয়েছে, তোমাকে অভ্যর্থনা জানাতে। তুমি যদি আসতে চাও তাহলে কি ভাবে আসবে তা জানাবে। তোমার স্ত্রীকে সঙ্গে আনার জন্য কি ব্যবস্থা করেছ তাও জানাবে। আমার ব্যক্তি-গত সংবাদ হল, আমি বিবাহিত এবং আমি দুইটি কন্যার পিতা।

চে-র মনে পড়ল তার সন্তানদের কথা। কিউবাতে তার স্ত্রী য়্যালাইদা সন্তানদের প্রতিপালন করছে। তারা হয়ত তাকিয়ে আছে তার বাবার ফেরার পথের দিকে। য়্যালাইদার অশ্রুসজল মুখখানা মনে পড়ল চে-র। সাময়িক কেমন অন্যমনস্কতা দেখা গেল। কাগজপত্র গুটিয়ে তার ন্যাপস্যাককে ভর্তি করে চে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন বেতার-সংবাদে লোয়োলার বিচারের ঘটনা জানা গেল। জানা গেল তার ব্যক্তিগত অনাসক্তি বিচারে অংশগ্রহণ করার। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ধর্মঘট করেছে বলিভিয়ার সর্বত্র, পেট্রোলিয়াম কর্মীরা ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। চারিদিকেই বিক্ষোভ। হিগুয়ারাস বিদ্যালয়ের শিক্ষককে গ্রেপ্তার করায় ছাত্ররাও ধর্মঘট করেছে। চে মনে করল, লক্ষণ খুবই ভাল। বিপ্লবের সহায়ক হবে এই সব ঘটনা।

আলটো সেকোর মেয়র ভারগাস।

তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে গিয়ে দেখা গেল টেলিফোন অচল।

চে তার বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে আলটো সেকোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। পথের ধারে যে সব লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছিল তারা মোটেই বিপ্লব সম্বন্ধে আগ্রহী নয়। তারা পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। এইভাবে চলতে চলতে বাইশে সেপটেমবর চে আলটো সেকোতে পৌঁছল তার মধ্য বাহিনী নিয়ে। আলটো সেকো ছোট্ট গ্রাম। পঞ্চাশ ঘর বাসিন্দা। এসেই চে দেখতে পেল, মেয়র ভারগাস গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। সে আগেই সংবাদ পেয়েছে তাদের অগ্রগতির। আগের দিনই সে বলে গেছে সরকারী ফৌজকে খবর দিতে। গ্রামের লোক এগিয়ে এসে মোটেই তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করল না, ভয়মিশ্রিত বিস্ময় নিয়ে তারা দূরে সরে গেল। একটা পরিত্যক্ত গৃহে তারা স্থান করে নিল। খাবারের সন্ধানে বের হল ক'জন। শীগগিরই খাবারও পেল। একটা ছোট গাড়ি রিও গ্রাঁদে থেকে আসার কথা ছিল, তা না আসাতে চে বুঝতে পারল মেয়র ভারগাস তাদের সংবাদ সরকারী ফৌজকে জানিয়ে দেওয়াতে ট্রাক আসা বন্ধ হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারগাসের স্ত্রী ও সন্তানেরা খাবারের আংশিক দামের জন্য চীৎকার করতে থাকায় চে বিরক্ত হল। সে জানে, এই

মহিলার স্বামী তাদের ফৌজের হাতে তুলে দেবার জন্যই শহরে গেছে। সে জন্য তাকে একটি পয়সা দেবার ইচ্ছা ছিল না তার।

সে রাতে গ্রামের বিদ্যালয়ে একটা সভা হল। সভায় জোয়ান কৃষক সন্তানদের সামনে ইনতি বিপ্লবের কারণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দিল। বক্তৃতাতে মাঝে মাঝে বাধা দিচ্ছিল বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। একজন যুবক পথ-প্রদর্শকের কাজ করতে রাজি হল। সে ফিসফিস করে চে-কে বলল, ঐ মাষ্টারকে বিশ্বাস কর না। লোকটা শেয়ালের মত ধূর্ত ও হিংস্র। এই যুবক এই মুক্তিযোদ্ধাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল সান্তা এলেমার দিকে।

সে রাতেই বেতার-সংবাদ শোনা গেল লা-পাজ থেকে। বারিয়েনতোস ও ওভানদো সাংবাদিকদের ডেকে খবর দিল, যে সব দলিল-পত্র পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেছে জ্যাকুইন সদলে নিহত হয়েছে।

রিও গ্রাঁদেতে জ্যাকুইন ও তার দল সরকারী ফৌজের সঙ্গে লড়াই করেছে। এই লড়াইতে মারা গেছে জ্যাকুইন ও তানিয়া। এতদিন সরকার পক্ষ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। বর্তমানে নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘোষণা করছে, এই দলটি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

কমলালেবুর ক্ষেত।

চে তার দলবল নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে এই কমলালেবুর বাগানে।

খোলা আকাশ চাঁদের আলোতে ঝলমল করছে। আলোর দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে কমলালেবুর বাগানে। ন্যাপসাকে মাথা রেখে শুয়েছিল চে। ভাবছিল পরবর্তী কার্যক্রম। সঙ্গীরা তখন খাওয়া-দাওয়া করে শুয়েছে। চে উঠে বসল। ন্যাপসাক থেকে পুরানো চিঠিপত্র আবার বের করল।

চে নিজের লেখা পত্রের নকলগুলো দেখছে। আনা লুই ষ্ট্রংকে হাভানা থেকে বাষট্টি সালের নভেমবরে যে পত্র লিখেছিল, সেই পত্র পড়তে থাকে। আনা তখন পিকিংবাসী। আনার উত্তরে

লিখেছে চেঃ আনাকে কিউবা আসতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিপ্লবোত্তর কিউবাকে দেখতে। আমাদের এই কিউবার কি ভাবে বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করেছি সে বিষয়ে তোমাকে কিছু লিখতে হবে না। তোমাকে আসার জন্য আমার স্থায়ী নেমন্তন্ন করা রইল, যতদিন ইচ্ছা তুমি এখানে থাকতে পার, যেভাবে ইচ্ছা এখানে তুমি বাস করতে পার।

কাগজ বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল চে। আনা লুই ষ্ট্রং সমাজতন্ত্রের সমর্থক। তাকে আসতে লিখেও যেন পরিতৃপ্তি পায়নি চে, তাকে কাছে পেলেই বেশি খুশী হত।

চে-কে জানার জন্য চিঠি দিয়েছিল লরেণ্টজেন। চে কিউবার মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। তাকে জানার ইচ্ছা অনেকেরই, অনেকেরই ইচ্ছা তার ব্যক্তিগত জীবন জানার। চে লরেণ্টজেনকে লিখল: জন্ম আমার আরজেনটিনায়, যুদ্ধ করেছি কিউবায় আর বিপ্লবে দীক্ষা নিয়েছি গুয়েতেমালায়।

কানাডা থেকে মিষ্টার মারুসি পত্র দিয়েছিল চে-কে। মারুসি Daily Mercury পত্রিকার সম্পাদক। তাকে আমন্ত্রণ জানাল চে কিউবা পরিদর্শন করতে। লিখল, আমাদের দেশে আমলাতন্ত্র অত্যধিক শক্তিশালী। আমলাতন্ত্র আমাদের কাজের অন্তরায়। কিউবা হল সমাজতান্ত্রিক দেশ। সভ্যতা বর্জিত বলতে পার কিন্তু আনন্দমুখর। আমাদের এই সমাজতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করলে কোনমতেই ঠকবে না। আমি আশা করছি তুমি আমাদের দেশে আসবে। আর যখন তোমার ইচ্ছা তখনই আসতে পার।

ন্যাপসাকে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল চে গুয়েভারা।

পরের দিন লোমা লারগা গ্রামে পৌঁছে দেখল, গ্রামে একজন মাত্র অধিবাসী বাদে সবাই পালিয়ে গেছে। মুক্তিফৌজদের দেখেই ভয়ে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে।

চে দুশ্চিন্তায় পড়ল।

জনতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করে উঠতে পারছে না। দেশের মুক্তিযুদ্ধে তারা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করতে চায় না। শুধু তাদের অনিচ্ছা নয়, তাদের অসহযোগিতা ও বিরুদ্ধাচরণও যথেষ্ট। গ্রামের একটিমাত্র অধিবাসীর কাছ থেকে একটা শূকর কিনে তারই মাংস আর কিছু বিন সেদ্ধ করে খেয়ে কাটাল সেই দিনটা। পরের দিন চে পৌঁছাল পুজিও গ্রামে।

গ্রামের লোকেরা তাদের দেখে পালিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে তারা ধীরে ধীরে কাছে এল, তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করল, তাদের খাবার সংগ্রহ করে দিল। কৃষকদের কাছে সংবাদ নিয়ে জানতে পারল, এই গ্রামের আশেপাশে কোথাও কোন ফৌজ নেই। পুজিও গ্রামের লোকেরা সদ্ব্যবহার করলেও মেয়রের মনোভাব ছিল প্রতিকূল। চে তাকে গ্রেপ্তার করে রাখতে নির্দেশ দিল।

পিকাডো ছোট্ট গ্রাম।

আশেপাশে যত কৃষক ছিল তারা মোটামুটি সহযোগিতা করেছে মুক্তিফৌজরা সেখানে আসার পর। চে এগিয়ে চলল হিগুয়েরার দিকে।

কাম্বা বলল, ওভানদো বেতারে ঘোষণা করেছে যে কোন সময় তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। ওভানদো জিরো আওয়ারের অপেক্ষা করছে।

চে হেসে বলল, ওভানদো নিজের শক্তিতে বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। মানুষের অহমিকা তার পরিচয় নয়, কাজ দিয়ে পরিচয় দিতে হয়।

কিন্তু আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

আমরা কি অসতর্ক হয়েছি কখনও?

হয়ত হইনি, কিন্তু আমরা পরিবেশের প্রকৃত সংবাদ বোধহয় সংগ্রহ করতে পারছি না। গ্রামের চাষীরা যে সংবাদ দিচ্ছে তার ওপর নির্ভর করা উচিত হবে কিনা, তা ভেবে দেখা উচিত মনে করি।

চে হেসে বলল, ওরা ভয়ে মিথ্যে কথা বলছে। ওরা বিশ্বাস করতে পারেনি যে আমরা সত্যিই বলিভিয়াকে মুক্ত করতে পারব মার্কিন তাঁবেদার শোষকদের হাত থেকে। তাই ওরা সহযোগিতা করতে চাইছে না। আমাদের পরাজয় ঘটলে সরকারী ফৌজ আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবার অপরাধে ওদের ওপর অত্যাচার করবে, এ ভয় আছে ওদের। তাই সত্য কথা মোটেই বলছে না।

হিগুয়েরা শহরে এসে অবাক হয়ে গেল চে গুয়েভারা। শহরে কোন বয়স্ক পুরুষ মানুষ নেই। রয়েছে কতকগুলো মহিলা আর শিশু। কোকোকে পাঠাল টেলিগ্রাফ অফিসে। কোকো ফিরে এসে সংবাদ দিল, এখান থেকে টেলিফোন করে সরকারী ফৌজকে জানিয়ে দিয়েছে বিবপ্লীরা শহরে এসে গেছে। যে লোকটি সংবাদ দিয়েছে, সে পালিয়েছে। তার স্ত্রী বলল, না, এ কথা সত্য নয়।

চে গম্ভীরভাবে বলল, তারপর ?

লোকটির স্ত্রী বলল, জাগুয়ে শহরে আজ একটা উৎসব আছে, সেখানে গেছে তার স্বামী। সে সংবাদ দিতেই পারে না।

এগিয়ে চল জাগুয়ের দিকে। আদেশ দিল চে।

শহরের দিকে এগিয়ে চলল গোটা বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে।

পাহাড় পেরিয়ে ওপারে শহর।

পাহাড়ের মাথায় ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে গুলীর আওয়াজ শোনা গেল। চে বুঝতে পারল তাদের ঠেলে দিয়েছে অতর্কিত আক্রমণের মুখে। অগ্রগামী দলের ওপর নিশ্চয়ই ঝাঁপিয়ে পড়েছে সরকারী সৈন্য। পূর্ব ব্যবস্থা .অনুযায়ী লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে শহরে পৌঁছবার পথের ধারে ওঁত পেতে বসেছিল। সুযোগ বুঝে আক্রমণ করেছে। চে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হল। রিও গ্রাঁদের পথে এগিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হল চে।

লোয়োলাকে গ্রেপ্তার করেছিল সন্দেহে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যার ওপর সন্দেহ হয়েছে তাকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। লোয়োলা গুজম্যান লায়াকেও। সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। যাদের গ্রেপ্তার করেছিল, পুলিশ তাদের বাড়ি তন্নতন্ন করে তল্লাসও করেছিল। তেমন কিছু আপত্তিজনক পাওয়া যায়নি কারও বাড়িতে একমাত্র লোয়োলার বাড়ি ছাড়া।

যেসব কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল লোয়োলার বাড়িতে তা পরীক্ষা করে যারা দেখছিল তাদের চোখ কপালে উঠল এই বুদ্ধিমতী ছাত্রীর কার্যকলাপ জানতে পেরে।

অবিশ্বাস্য পুলিশের অভিযোগ। এমন সুন্দরী শিশুর মুখাবয়ব-সম্পন্ন একটি যুবতী কি করে যে বিপ্লবীদলের নেত্রী হতে পারে তা কেউ বিশ্বাস করতে পারছিল না। রাতের বেতারে লোয়োলার গ্রেপ্তার সংবাদ জানতে পেরেছিল চে নিজেও। কোন মন্তব্য করেনি। তার বিশ্বাস লোয়োলাকে ধরিয়ে দেবার পেছনে কোন ষড়যন্ত্র থেকে গেছে। সেই ষড়যন্ত্রের নায়ক বা নায়িকা যে কে, তা জানতে পারেনি চে।

পুলিশ জেরার পর জেরা করে চলেছে। জেরার মুখে লোয়োলা যে ভেঙে পড়বে—এই বিশ্বাস ছিল তাদের, কিন্তু লোয়োলার মুখ খোলাতে পারল না। লোয়োলা বসে বসে গল্প করল, আলোচনা করল সাহিত্য, আলোচনা করল চারুকলা কিন্তু বিপ্লবের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ আছে—এ কথা একবারও স্বীকার করল না।

তোমার বাড়ি থেকে যেসব কাগজপত্র পাওয়া গেছে তা থেকে জানা গেছে তুমি বিপ্লবীদের সঙ্গী।

আমি স্বীকার করি না। আমার বাড়িতে এমন কোন কাগজ তোমরা পেতেই পার না। যে কাল্পনিক অভিযোগ আনছ তা অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলে প্রচার করতে তোমরা কতকগুলো কাগজ ও দলিল তৈরী করেছ নিজেদের অক্ষমতা গোপন করতে।

পুলিশ অফিসার বুঝল মেয়েটি খুবই শক্ত। তবুও বলল, তুমি এই দস্যুদের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ রক্ষা করতে। এর প্রমাণ আছে।

অবাক হয়ে লোয়োলা বলল, বহির্বিশ্ব! আমি নিজের ঘরের খবরই জানি না, আমি জানব বাইরের কথা! আশ্চর্য লোক তোমরা। ভদ্রঘরের মেয়েকে ধরে এনে এভাবে লাঞ্ছনা করা তোমাদের উচিত হয়নি। তোমরা কেন যে লজ্জিত হচ্ছ না, তা ভেবে পাচ্ছি না।

তোমার সামনে কতকগুলো বৈদেশিক মুদ্রা তোমার ঘর থেকে পেয়েছি, তা বোধহয় অস্বীকার করতে পার না?

আমার কিউরিওতে অনেক দেশের কিছু কিছু মুদ্রা ছিল। দেশ-বিদেশের টাকা সংগ্রহ করা আমার হবি। তার সঙ্গে বিপ্লবের আর দস্যুর কি সম্বন্ধ থাকতে পারে, তা বুঝতে পারছি না।

বুঝলাম তুমি সহজে সত্যি কথা বলবে না।

আমিও বুঝলাম তোমাদের বিপ্লবের আতঙ্কে পেয়ে বসেছে জলাতঙ্কের মত। তোমরা রজ্জু দেখে সর্প ভ্রম করছ। বেশ সহজে যা হবে না মনে করছ, তা কঠিন করেও দেখতে পার।

লোয়োলাকে হাজতে রাখল পুলিশ।

প্রতি রাতে তাকে ডেকে তুলে জেরার পর জেরা করে অস্থির করে তুলল।

লোয়োলা আর বুঝি সহ্য করতে পারে না। অবশেষে গাউনের কাপড় ছিঁড়ে গলায় জড়িয়ে আত্মহত্যার উদ্যোগ করল। সামনের সেনট্রি দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে তাকে নামাল ফাঁসি থেকে। সে যাত্রায় লোয়োলা বেঁচে গেল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ল।

পুলিশের নিপীড়ন এতেও থামল না। অসুস্থ লোয়োলার মুখ থেকে স্বীকারোক্তি পাবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর অত্যাচার আরম্ভ করল।

আরেকজনের ওপরও নিষ্ঠুর অত্যাচার চলছে তখন।

হুবরেকে বলিভিয়ার শত্রু এবং চে-র অন্তরঙ্গ মনে করে তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চলছে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য। অথচ হুবরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সাজানো।

এদিকে মনজে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বিপথে পরিচালনা করছে। প্রগতিশীল বুর্জোয়াদের সঙ্গে মিতালি করে সুবিধা আদায়ের সুযোগ খুঁজছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিপ্লবে বিশ্বাসী। তারা সংগ্রাম করে সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, অথচ পৃথিবীর কয়েকটি দেশের বিপথগামী কম্যুনিষ্ট পার্টির মত পার্টির নাম ভাঙিয়ে সুযোগ সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করছে মনজে। বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচার কার্যও চালাচ্ছে মনজে। সরকারকে সাহায্য করতে বিপ্লবীদের নামের তালিকা তৈরী করে দিয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সিয়ার অর্থ আসছে গোপনে তার পকেটে, বিনিময়ে সে জনস্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

লোয়োলা চে-র সান্নিধ্যলাভ করেছে। সে মনজের চরিত্র ভাল করে জেনে এসেছে। তার বিশ্বাস, মনজে তার নাম দিয়েছে পুলিশের কাছে। মনজেই পুলিশকে পাঠিয়েছে বামপন্থী চিন্তাধারায় দীক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রেপ্তার করতে। লোয়োলা জানে, বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির সাইনবোর্ড ভিন্ন কোথাও কম্যুনিজমের নামগন্ধ নেই। সেজন্য মনজে ও তার পার্টির ভূমিকা হল প্রতিবিপ্লবীদের সাহায্য করা। মনজে যেভাবে গদীতে বসেছে এবং মার্কিন তাঁবেদার বারিয়েনতোসের পদলেহন করছে, তাতে বলিভিয়ার মুক্তি আনতে অনেক বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

হুবরেও বুঝতে পেরেছিল, এই চক্রান্তের পশ্চাতে মনজের হাত আছে। মনজে নেতৃত্ব চেয়েছিল, চে-কে ডিঙিয়ে নিজের হাতে সব ক্ষমতা নেবার জন্য। প্রস্তাবও করেছিল কিন্তু তাকে বিমুখ করেছিল বিপ্লবীরা। তাকে নেতৃত্ব করতে দিতে চায়নি কেউ-ই। কম্যুনিজমের

সর্বনাশ করে অথচ কম্যুনিজমের মুখোস পরে মনজে প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনকে রক্ষা করছে। তারই ফলে অনেক নিরপরাধ এবং মনজের বিরুদ্ধমতাবলম্বীকে জেলে পাঠিয়েছে মনজে পুলিশের সাহায্যে।

হ্যবরের বিচার হবে।

লোয়োলার বিচার হবে।

উভয়েই বিচারের অপেক্ষা করছে।

হ্যবরের প্রতি যে অত্যাচার চলছিল তার বিরাম নেই।

লোয়োলা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দ্বিতীয়বার আত্ম-হত্যার চেষ্টা করতেই তাকে নিভৃত সেলে আটক করে রাখল পুলিশ।

বার বার আত্মহত্যার এই যে চেষ্টা তাতে জনমত বিক্ষুব্ধ। সবাই বিশ্বাস করল, নারীত্বের অমর্যাদা সহ্য করতে না পেরে লোয়োলা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। সরকার পক্ষ নীরব থেকেছে এ বিষয়ে। তাদের বক্তব্য নেতিবাচক এবং বিচারের নামে অবিচারকে কায়েম করাই তাদের নীতি।

চে বেতারেই সংবাদ পেয়েছে, লোয়োলার আত্মহত্যার চেষ্টার বিষয়। হ্যবরের প্রতি যে অবিচার চলছে, তাও জানতে পেরেছে। মনজের সুবিধাবাদী নীতির কথাও জেনেছে।

মনজের ভূমিকা যে অতিশয় নোংরা হবে তা চে, তানিয়া, জ্যাকুইন, লোয়োলা সবাই বুঝতে পেরেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল ঘটনার গতি পরিবর্তনের। মনজে ফতোয়া দিয়েছিল, এই যে গোরিলাদস্যু, এদের সঙ্গে বলিভিয়ান কম্যুনিষ্ট পার্টির তথা বলিভিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। যারা এই দস্যুতা করছে তারা সবাই বাইরের লোক—বিদেশী, আমাদের দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে এসেছে। ডাকাতি লুঠপাট এদের কাজ। ডাকাতির পয়সায় নিজেদের পেট ভরাতে চায়। অতএব জনসাধারণ সাবধান। বিদেশী দস্যুরা বলিভিয়ার স্বাধীনতা বিপন্ন করতে চায়। তাদের

দেখলেই সরকারী কোন ক্যাম্পে খবর পৌঁছে দিতে আহ্বান জানাল মনজে।

তার প্রচারের ধারা দেখে সরকার পক্ষও অবাক। সরকারী প্রচার-যন্ত্র বোধহয় এত বেশি নিন্দাসূচক প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার করতে সাহসী হত না, কিন্তু মনজে তা পেরেছে।

বলিভিয়া থেকে একদল যুবককে আমেরিকায় পাঠিয়েছিল বারিয়েনতোস। তারা য়্যান্টি-গোরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে মার্কিনমুলুক থেকে। তারা 'য়্যামবুস' করতে জানে, তারা গোরিলাদের ঘেরাও করতে শিখে এসেছে। সব চেয়ে বেশি শিখে এসেছে জনসাধারণকে গোরিলাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। যে সব এলাকায় গোরিলা তৎপরতা বেশি, সে সব এলাকার যুবকদের জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে নিরাপদ সরকারী এলাকায়। যাতে গোরিলারা প্রভাব বিস্তার করতে না পারে জনসাধারণের ওপর, তার জন্যই এই বিশেষ ব্যবস্থা।

জন-সংযোগের ক্ষেত্রে চে-র অসাফল্য এই একই কারণে। চে যদি বিদ্যুৎগতিতে অগ্রসর হতে পারত আর যদি মনজে বিশ্বাসঘাতকতা না করত, তা হলে চে-কে বার বার বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হত না।

যে এলাকা দিয়ে চে অগ্রসর হচ্ছিল, সে এলাকার পশ্চাদ্‌ভাগ সম্পূর্ণরূপ মুক্ত হলেও সেখানে তাকে সমর্থন জানাবার মত জনসংখ্যা ছিল না। কোন একসময়ে এই এলাকায় প্লেগ হওয়াতে জনবসতি বিরল হয় এবং তার অভিযানের সংবাদ জানার পর সামনের গ্রাম থেকে লোকজনকে সরিয়ে নেবার ব্যসস্থা করেছে বারিয়েনতোস সরকার। পোড়ামাটির নীতি কার্যকরী করতে সরকারী ফৌজ খুবই চেষ্টা করেছে।

ওভানদো তার য়্যান্টি-গোরিলা বাহিনীকে গিরিপথগুলো বন্ধ করতে নির্দেশ দিল। গোরিলাদের চলাচলের পথ বন্ধ করে তাদের ফাঁদে ফেলার জন্য আটাশ শত সৈন্য নিযুক্ত করল পাহাড়ী

এলাকায়। গ্রামের ও শহরের মেয়রদের অর্থ দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে বশীভূত করল, গোরিলাদের পৌছান সংবাদ পাওয়া মাত্র তারা যাতে গ্রাম থেকে সব লোক সরিয়ে দেয় এবং সংবাদ পৌছে দেয়।

চে তার অভিযানের পথে যে সব গ্রাম অতিক্রম করে শহরের দিকে এগিয়ে চলছিল, সে সব গ্রামে পুরুষ মানুষের অনুপস্থিতি এই একই কারণে হয়েছে। কোন কোন গ্রামে হয়ত কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে, কিন্তু তাদের মনোবল অতিশয় শোচনীয়। সেজন্য তাদের সহযোগিতার মূল্য খুব বেশি নয়। বারিয়েনতোসের ভয়ে তারা সত্য কথা বলত না। মিথ্যা সংবাদ দিয়ে গোরিলা বাহিনীকে বিভ্রান্তও করেছে মাঝে মাঝে।

যেদিন বারিয়েনতোস জানতে পারল, এই গোরিলা বাহিনীকে পরিচালনা করছে ডাক্তার চে গুয়েভারা, সেদিন থেকে বারিয়েন-তোসের চোখে আর ঘুম নেই। বারিয়েনতোস জানে, কিউবার বিপ্লব সাফল্যলাভ করেছে অসীম সাহসী ও বুদ্ধিমান সমরনেতা চে গুয়েভারার দক্ষতায়। কাস্ত্রো যদিও সর্বোচ্চ নেতা, কাস্ত্রো জনমন হরণ করতে বক্তৃতায় পারদর্শী, কিন্তু আসল শক্তির উৎস চে গুয়েভারা। তার সঙ্গে লড়াই করা কোন ক্রমেই সহজসাধ্য নয়। বারিয়েনতোস অনেক সময়ই ভারসাম্য হারিয়ে সভ্যজগতে নিন্দিত কাজও করছিল। তাকে সাহায্য করছিল তার সামরিক উপদেষ্টা ও মার্কিন গুপ্তচরেরা।

বারিয়েনতোস প্রথমে মার্কিনদের সংবাদ বিশ্বাস করেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে গোরিলাদের কার্যকলাপ দেখে এবং কিছু দলিলপত্র হস্তগত হওয়াতে নিশ্চিন্তভাবে বারিয়েনতোস জানতে পারল, সত্যিই চে গুয়েভারা এই গোরিলাদের দলপতি। আরও নিশ্চিত হল, যখন বলিভিয়ার কম্যুনিষ্ট নেতা মনজে স্বচক্ষে চে-কে দেখে এসে সংবাদ পৌছে দিল বারিয়েনতোসকে।

মনজে বলিভিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত

করেই ক্ষান্ত হয়নি, তার চেষ্টা ছিল গোটা লাতিন আমেরিকা থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পশ্চাতে ছুরিকাঘাত করে চিরদিনের মত তার কর্তৃত্ব বজায় রাখা। সেই পথ ধরেই সে অগ্রসর হচ্ছিল।

পঞ্চাশ হাজার বলিভিয়ান ডলার।

লোভটা কম নয়।

যে ব্যক্তি চে গুয়েভারাকে জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তার করতে পারবে অথবা গ্রেপ্তারে সাহায্য করে সংবাদ দেবে, তাকে পঞ্চাশ হাজার বলিভিয়ান ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপনে, হ্যাণ্ডবিলে ছেপে এই সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া হল সারা দেশে। লা-পাজ থেকে বেতারে প্রত্যহ এই ঘোষণা শোনা যেত। চে-ও শুনেছে, চে-ও পেয়েছে এই হ্যাণ্ডবিল।

হঠাৎ একদিন লা-পাজ থেকে ঘোষণা করা হল, যুদ্ধে চে নিহত হয়েছে।

বেতারের সংবাদ শুনে চে হাসল।

জীবিত মানুষের মৃত্যু সংবাদ নাকি আয়ু বৃদ্ধি করে। যদি বারিয়েনতোস এই সংবাদ ছড়িয়ে খুশী হয় তাতেই বা আপত্তি কি।

য়্যান্টি-গোরিলা বাহিনীর আক্রমণে চে-র জনশক্তি হ্রাস পেল। সাতাশ ও আটাশ সেপটেম্বর যে যুদ্ধ হল তা মোটেই চে-র অনুকূল হয়নি। ক্ষতির পরিমাণ যথেষ্ট। তার দলে বিদেশী সাহসী এবং কিউবা যুদ্ধের পাকাপোক্ত যারা, তাদের অনেকেই প্রাণ হারাল দুদিনের যুদ্ধে। বলিভিয়ান কমরেডরা তবুও মনোবল হারায়নি।

চে স্থির করল যে কোন উপায়ে নিরাপদ এলাকায় আশ্রয় নিতে হবে। তার বাহিনী যে শত্রু পরিবৃত হয়েছে এবং গ্রামের লোকেরা যে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। বর্তমানে একমাত্র কাজ হল আত্মরক্ষা আর লা-পাজের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করা। তার দুটো বড় বড় সমর্থক ও যোগাযোগ রক্ষাকারীদের একজন তানিয়া—সে রিও গ্রাঁদের যুদ্ধে নিহত, অপর

জন লোয়োলা এখন কারাগারে। মনজে যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে তাতে সহজে অপর কমরেডদের সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টি করা সুকঠিন এবং তার জন্য হয়ত অনেক মূল্য দিতে হতে পারে। লা-পাজের ধর্মঘট, তৈল কোম্পানীর ধর্মঘট ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্র শিক্ষকরা যেন ভয় পেয়ে গেছে।

দলের কোন যোদ্ধার মনোবল কিন্তু এখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি। একমাত্র উইনি যেন সুযোগ খুঁজছে পালিয়ে যাবার। চে স্থির করল তার সঙ্গে কথা বলে মনের ভাব জেনে নেবে।

চিলি বেতারে সংবাদ শুনল চে গুয়েভারা। বেতার সংবাদে জানান হয়েছে, সরকারী ফৌজ চে-গুয়েভারাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে গভীর জঙ্গলে। কিন্তু লা-পাজ বেতার থেকে তাদের কোন সংবাদ জানান হয়নি।

উইলি এসে খবর দিল, রিও গ্রাঁদে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে।

আর দেরী করা নয়। আজ রাতেই এগিয়ে যেতে হবে। কোথাও কোন নিরাপদ জায়গায় শিবির স্থাপন করে রাত কাটাতে হবে। যাতে কেউ দেখতে না পায় এমনিভাবে রাত কাটাতে হবে। কোন গ্রামবাসী যেন আমাদের সন্ধান না পায়।

তখনই যাত্রা শুরু হল।

গভীর অন্ধকারে রুগ্ন দুর্বল ও আহত সৈন্যদের নিয়ে চে এগিয়ে চলল। সামনে রিও গ্রাঁদে। দখল করতে হবে রিও গ্রাঁদে। দখল করতে পারলে তাদের চলাচলের পথ নিরাপদ হবে।

ওদিকে গরু খুঁজতে বেরিয়েছে চাষী ভিকটর। সারাদিন তার গরুটা পাহাড়ের গায়ে গায়ে ঘাস খেয়েছে, অথচ ঘরে ফিরে আসেনি। রোজই গরু ফিরে আসে, আজ কেন এল না!

ভিকটর চিন্তিত।

ভিকটর তার গৃহিণীকে পাঠাল গ্রামে খোঁজ করতে। কেউ যদি দেখে থাকে তার গরু—এই আশায় বের হল ম্যাদাম ভিকটর।

এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে কোথাও খুঁজে পেল না, কেউ কোন সংবাদও দিতে পারল না।

মাথায় হাত দিয়ে বসল ভিকটর। অত আদরের বকনাটা হারিয়ে গেল। হায় রে! দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভিকটর। ম্যাদাম ভিকটর বলল, তুমি একবার যাও না।

কোথায় যাব? তুমি তো গোটা গ্রামটা চষে বেড়ালে।

পাহাড়ের ওপর ঐ বনটা দেখে এস।

এই রাতের বেলায় অন্ধকারে যাওয়া কি ভাল হবে। বাঘের উৎপাত হয়েছে।

তোমার শুধু ভয়। চল, দুজনেই যাব। দেখি বাঘ কি করতে পারে। নাও, ওঠ।

একটা আলো নিয়ে চল।

কেরোসিন বাতিটা সঙ্গে নাও। ও বাবা, আবার ঝড় উঠল দেখছি। নাও, চল। আলোটা নাও। উঃ, কি অন্ধকার!

দুজনে বের হল বকনা গরু খুঁজতে। হাতে তাদের কেরোসিনের বাতি। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। ক্রমেই তারা এসে পড়ল বনের কিনারায়। দমকা বাতাসে হঠাৎ নিভে গেল তাদের হাতের কেরোসিনের বাতিটা।

এবার হল তো! চল, ফিরে যাই।

না।

কেন?

যখন এসেছি, তখন না দেখে যাব না।

কিন্তু এই ঘন বনে সাপের উৎপাত, বাঘের উৎপাত।

তুমি কেমন মরদ তা তো বুঝছি না। চল, রাত বেশি হয়নি। এগারটা সবে বেজেছে।

এগোতে থাকে দুজনেই।

ম্যাদাম ভিকটর কান পেতে কি যেন শুনতে চেষ্টা করল।

বকনাটার আওয়াজ পেয়েছ ?

চুপ। মানুষের গলার শব্দ।

এই গভীর বনে মানুষ ! হতেই পারে না।

আরও একটু এগিয়ে চল। পায়ের শব্দ যেন না হয়। শুনেছি ডাকাতরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরছে। তারাও হতে পারে। টের পেলেই গুলি করে মারবে। একদম চুপ।

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারল বনের মধ্যে কতকগুলো লোক বসে কথা বলছে।

ম্যাদাম কামিজের হাত ধরে টেনে নিল ভিকটরকে। ইঙ্গিতে ফিরতি পথ ধরার নির্দেশ দিল। ভয়ে দুজনেই ঘেমে উঠেছে। কোন রকমে তারা বনের বাইরে এসে দাঁড়াল। নিঃশ্বাস ছেড়ে যেন বাঁচল।

হাঁ, ওরাই—মানে ডাকাতরা।

ভিকটর তখন অন্য কথা ভাবছে। ম্যাদাম ভিকটরকে বলল, একটা কথা গিন্নী।

কি কথা ?

পঞ্চাশ হাজার ডলার। হিগুয়ারে খবর দিতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার। দুটো পেসোর জন্য এত কষ্ট, আর পঞ্চাশ হাজার। আমি হিগুয়ারে যাব এখুনি।

এই রাতে, পাগল হয়েছ !

না, না, পাগল হইনি। পঞ্চাশ হাজার ! সেই নীল কাগজটা দাও। পঞ্চাশ হাজার ! ঐ বনে আর কেউ নেই, আছে ডাকাতরা। এখুনি খবর দিতে হবে।

নীল হ্যাণ্ডবিলখানা নিয়ে ভিকটর দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। ছুটল শহরের দিকে সেনাবাহিনীকে খবর দিতে।

সংবাদ পেয়েই সামরিক তৎপরতা আরম্ভ হল।

আমার ইনাম ? প্রার্থনা জানাল ভিকটর।

তোমার মত অনেকেই খবর দিয়েছে এর আগে কিন্তু কোন বারই ডাকাত ধরা পড়েনি। যদি ধরতে পারি তা হলে ইনাম পাবে। মোটা হাতে ইনাম দেবে সরকার।

কাজ শেষ হলে যদি তোমরা ইনাম না দাও •••।

তোমার বিশ্বাস না হলে তোমার খবর তুমি ফিরিয়ে নাও। আমরা তোমাকে গ্রেপ্তার করে রাখব। তুমি যে ওদের দলের একজন নও, তাই বা জানব কি করে।

ভিকটর গেঁয়ো চাষী হলেও বুঝতে পারল তাকে ইনাম এক কানাকড়িও দেবে না।

বেশ।

কোথায় যাচ্ছ ?

বাড়ি যাব।

না। আমাদের সঙ্গে তুমি যাবে। আগে গিয়ে তাদের খবর যদি দাও, তা হলে ওরা পালিয়ে যাবে। তোমাকে বিশ্বাস নেই।

চমৎকার ! আমার দেওয়া সংবাদ বিশ্বাস করলে আর আমাকে বিশ্বাস করছ না।

মাথা নাড়তে নাড়তে অফিসার বলল, আমরা আইন মেনে চলি।

খবর চারিদিকে ছড়িয়ে দিল বেতার-বার্তায়।

কামিরি থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে কুয়েব্রাদা দেল ওরোতে সন্ধান পাওয়া গেছে। তখনই এই বনাকীর্ণ পাহাড়ের পালাবার গিরিখাতগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা হল। কুয়েব্রাদা দেল ওরোর দিকে এগিয়ে চলল বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত দুই কোম্পানী সৈন্য। ক্যাপটেন গারে প্রাদো নিল নেতৃত্ব।

সকাল হতেই মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পারল তাদের ঘেরাও করেছে সরকারী ফৌজ। দলের অনেকেই আহত, অনেকেই ক্লান্ত। তবুও পালাতে হবে। বনের অন্তরাল থেকে তারা লক্ষ্য করল সৈন্যরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চুপিচুপি এগিয়ে আসছে।

সরকারী ফৌজ তখনও টের পায়নি গোরিলাদের অবস্থান। সরকারী ফৌজ এগোচ্ছে। গোরিলারাও পালাবার পথ খুঁজছে। তাদের মুখোমুখী দেখা হল দুজন সৈন্যের। গর্জন করে উঠল গোরিলাদের সাব মেসিনগান। দুজন সৈন্য তখনই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই বন্দুকের আওয়াজে সরকারী সৈন্যরা বুঝতে পারল তাদের অবস্থান, কিন্তু তখন তারা নিরুপায়। গুলী না করলে গোরিলাদের মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। আক্রমণ হল আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। একটুও ভুল করেনি তারা।

সারাদিন ধরে ইতস্তত গুলী চলছে। কোন পক্ষই এগোতে পারছে না। গোরিলারাও যে গিরিখাত ধরে পালাবার চেষ্টা করছে, সেখানেই তারা বাধা পাচ্ছে। শিলাবৃষ্টির মত গুলী ছুটছে চারিদিক থেকে। কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। সবাই বনের অন্তরালে। আন্দাজে গর্জে উঠছে উভয়পক্ষের বন্দুক। অদৃশ্য শত্রুকে লক্ষ্য করে উভয়পক্ষই সক্রিয় কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না কেউ-ই।

ক্যাপটেন প্রাদো ?দখতে পেল দুজন গোরিলা পাশ কাটিয়ে বনের মধ্যে ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে তার বন্দুক গর্জে উঠল। গোরিলারা প্রস্তুত হবার আগেই একজন আহত হয়ে পড়ে গেল। তার কাঁধ থেকে খসে পড়েছিল সাব মেসিনগান। অপরজন সেটা তুলে নেবার আগেই ক্যাপটেন প্রাদোর গুলী এসে লাগল তার উরুতে।

পাশাপাশি দুজন গোরিলা। দুজনেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। একজন উইলি, আরেকজন চে।

উইলি বলল, মেজর তুমি গড়াতে গড়াতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়। ওদের সামনে আমি থাকব। সব গুলী আমার দেহে লাগবে। তুমি হয়ত পালাবার অবসর পাবে। আমি মরব, কিন্তু তুমি বাঁচবে। তুমি বাঁচলে আমাদের রক্তদান সফল ও সার্থক হবে। তোমার অসময়ে মৃত্যু ঘটলে বলিভিয়ার মুক্তি বিলম্বিত হবে।

ইতিমধ্যে প্রাদো তার সহচরদের নিয়ে ঘিরে ফেলেছে তাদের। সাব মেসিনগান উদ্যত, মৃত্যু অবধারিত।

চে গম্ভীরভাবে বলল, থামো ক্যাপটেন। আমি চে গুয়েভারা। আমাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে পারলে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে তুমি। আমি এখন নিরস্ত্র ও আহত। এখন গুলী করে আমাকে হত্যা করলে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হবে না।

প্রাদো অর্থ ও গৌরব দুটোই চায়।

গ্রেপ্তার করল চে আর উইলিকে।

সেই রাতেই বেতারে সংবাদ পেল বিশ্ববাসী, বলিভিয়ার গোরিলাযুদ্ধের নেতা ডাক্তার চে গুয়েভারা আহত অবস্থায় বন্দী হয়েছে। গোরিলা যুদ্ধের অবসান ঘটতে আর দেরী নেই।

বেতারে আরও ঘোষণা করল, মুষ্টিমেয় গোরিলারা বিপুল সংখ্যক সরকারী বাহিনীর সঙ্গে জীবনপণ যুদ্ধ করেছে চে-কে মুক্ত করতে, সরকারী বাহিনী বীরের মত যুদ্ধ করে এই গোরিলা দস্যুদের হত্যা ও আহত করেছে, যারা জীবিত ছিল তারা পালিয়েছে জঙ্গলে। তাদের বন্দী করতে সরকারী ফৌজ তল্লাস করছে ও পিছু ধাওয়া করছে। দলের নেতা চে গুয়েভারা বন্দী হয়েছে।

উইলি আর চে-কে সংঘর্ষ এলাকা থেকে কিছুদূর এনে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখল ক্যাপটেন প্রাদো। সেনট্রি রইল পাহারায়। সংবাদ পাঠান হল ফৌজী দপ্তরে।

রক্তপাতের দরুণ ঝিমিয়ে এসেছে তাদের দেহ।

প্রাদোকে ডেকে বলল চে, আমাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর ক্যাপটেন।

চিকিৎসা! দস্যুদের চিকিৎসার জন্য আমাদের হাসপাতাল তৈরী করতে হবে দেখছি।

তুমি ব্যঙ্গ করছ?

তোমার সঙ্গে আমার কোন কুটুম্বিতা আছে বলে তো জানি না।

বলিভিয়ার আইন তুমি নিশ্চয়ই জানো। এখানে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না, তাও জানো। আহত অবস্থায় রক্তক্ষরণের ফলে যদি তোমার মৃত্যু ঘটে তা হলে কেউ বলবে না আমরা বলিভিয়াতে কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। অথচ মৃত্যুই তোমার উপযুক্ত শাস্তি। যেমন আছ তেমনি থাক।

বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার যুদ্ধের রীতি।

ডাকাতের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি কোন সভ্য দেশ? তবুও তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছি, নইলে তোমাকে হত্যা করা হত বন্দী করার আগেই। এর বেশি দয়া আর কি আশা কর?

আমি কিন্তু তোমাদের যারা আহত হয়েছে তাদের চিকিৎসা করেছি নিজেই, যারা অক্ষতভাবে বন্দী হয়েছে তাদের ফিরে যেতে দিয়েছি নিরাপদে তাদের গৃহে। তোমাদের কাছেও আমরা আশা করব সভ্যজগতের ব্যবহার।

প্রাদো হেসে কোন উত্তর না দিয়ে ফিরে গেল তার কাজে।

হিগুয়েরার ফৌজী দপ্তরে এরপরই বৈঠক বসল সামরিক অফিসারদের। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিল কর্ণেল শেলিজ, লেফটন্যান্ট এগুলিয়ের, ক্যাপটেন প্রাদো এবং কয়েকজন গোরিলাযুদ্ধে দক্ষ নন-কমিশনড অফিসার।

হিগুয়েরার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বন্দী করে রেখেছিল চে ও উইলিকে পাশাপাশি ঘরে।

বৈঠকের পর প্রাদোকে পাঠান হয়েছিল চে-কে জেরা করে গোরিলাদের সম্বন্ধে তথ্য জানতে। প্রাদো চে-র সামনে চেয়ার টেনে বসল।

তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। বলল প্রাদো।

প্রাদোর পাশবিক আচরণ চে ভুলতে পারেনি। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করল চে।

তুমি এখানে কেন এসেছ?

চে কোন জবাব দিল না তার প্রশ্নের।

আমরা শুনেছি, তুমি কিউবা যুদ্ধের মহাবীর। কিউবাতে তুমি ছিলে ফিদেলের দক্ষিণ হস্ত। কিন্তু কেন তুমি এসেছ বলিভিয়াতে?

চে গম্ভীরভাবে বলল, তুমি মদ খেয়েছ। আমার মুখের কাছে মুখ এনে কথা বল না।

প্রাদো ক্রোধে ফেটে পড়ল। চীৎকার করে বলল, তোমাকে যথেষ্ট শিক্ষা দিতে পারি, তা জানো।

চে-র বাঁ হাত খোলা ছিল।

চে গম্ভীরভাবে বলল, জানি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন একটা চপেটাঘাত করল প্রাদোর মুখের ওপর। চড়ের আঘাতে প্রাদো ছিটকে পড়ল চেয়ার থেকে।

সেনট্রি দৌড়ে এসে প্রাদোকে মেঝে থেকে টেনে তুলল, চে-কে আরও শক্ত করে বেঁধে রাখল চেয়ারে।

প্রাদো বৈঠকে ফিরে গেল। রিপোর্ট দিল, চে কথা বলছে না।

কেন?

বোধহয় রক্তপাতের দরুণ কথা বলার ক্ষমতা নেই।

প্রাদো চপেটাঘাতের কথা বেমালুম গোপন করলেও সেনট্রিরা জেনেছিল ঘটনা। তারাই লোক মুখে ছড়িয়ে দিয়েছিল প্রাদোর এই দুর্ভোগের কাহিনী।

কর্ণেল শেলিজ বলল, চে-কে কামিরিতে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। কোর্ট মার্শালে বিচার হোক।

অনেক হাঙ্গামা। তার চেয়ে এখানেই বিচার করে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

কর্ণেল শেলিজ বলল, তুমি যা বললে লেফটন্যান্ট এগুলিয়ের তাতে আর বিচারের কোন প্রয়োজনই নেই। যাকে মৃত্যুদণ্ড দেবে স্থির করেছ তাকে আর কেন বিচারালয়ে নিয়ে যাওয়া। আমি

কিন্তু মৃত্যুদণ্ড দেবার পক্ষপাতী নই। কারণ মৃত্যুদণ্ড বলিভিয়ার আইন বিরুদ্ধ।

কিন্তু সাপকে হত্যা না করলে ভবিষ্যতে বিপদ ঘটতে পারে। চে-কে বন্দী করে রাখার মত বন্দীশালা বলিভিয়াতে আছে কিনা সন্দেহ। তুমি কি বল ক্যাপটেন প্রাদো ?

তখনও চড়ের জ্বালা রয়েছে প্রাদোর মুখে ও মনে। সে সমর্থন জানাল এগুলিয়েরকে। দুজনেই জোর দিয়ে বলল, চে-কে গোপনে হত্যা করা হোক।

কিন্তু বন্দীকে হত্যা করলে বিশ্বের সামনে কি জবাব দেব আমরা !

বলব, অতিরিক্ত রক্তপাতের জন্য আহত বন্দী চে মারা গেছে।

লোকে বিশ্বাস করবে কি ? হাসপাতালের রিপোর্ট চাই। কোন ডাক্তারই আমাদের নির্দেশে কোন মিথ্যা সার্টিফিকেট দেবে না।

হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে—এ কথা বলতে পারব। চে-র মৃতদেহটা শুধু পৌঁছে দেব পোষ্ট মর্টম করতে।

কিন্তু ! চিন্তিতভাবে বলল কর্ণেল।

আর কিন্তু নেই। আমাদের দুজনের পরামর্শ ই যুক্তিযুক্ত। চে মরলে বলিভিয়া ঠাণ্ডা হবে।

তা হবে না বন্ধু। চে-র মৃত্যুর পর গোরিলারা কিছুটা থমকে যাবে, কিন্তু যুদ্ধ থামবে না (after the death of Che, the guerrillas will take a pause, but the fight will continue) পৃথিবীতে একটা চে জন্মায়নি। শত শত চে জন্মায়। একটি চে মরলে তার স্থানে আরও কয়েক শ' চে এসে স্থান করে নেবে—এই আমার বিশ্বাস। (There are many Ches and they will continue to appear, still others will come, perhaps even tomorrow more Ches will appear).

তোমার ধারণা ভুল ক্যাপটেন। কোন মানুষকে তার আদর্শ দিয়ে বিচার করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা যায় না। তার আদর্শকে সে কি ভাবে কাজে লাগিয়েছে তা লক্ষ্য করতে হবে। তার জীবনযাত্রা, ব্যক্তিগত জীবন এবং তার ফলাফল সব বিচার করে দেখতে হয়। আমি যোদ্ধা। যোদ্ধাকে সম্মান করতে আমি জানি। চে-র পবিত্রতা, তার জন্ম, তার আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাকে বড় করেছে। বন্দী চে-কে হত্যা করা মহা অপরাধ। বিশ্ববাসী কোনদিন বলিভিয়ার বর্তমান শাসক সম্প্রদায়কে মার্জনা করবে না।

তুমি যত বড মনে করছ চে অত বড় নয় কর্ণেল।

আমার সঙ্গে চে-র ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও তার কার্য-কলাপ সম্বন্ধে আমি যা জেনেছি তা থেকে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, যদি কোনদিন পৃথিবীর সত্য ইতিহাস লেখা হয় তা হলে জনদরদী বীর যোদ্ধাদের তালিকায় চে-র নাম লেখা হবে স্বর্ণাক্ষরে।

তোমার মানসিক বিপর্যয় ঘটেছে কর্ণেল। দস্যু সম্বন্ধে তোমার দুর্বলতা রয়েছে দেখছি।

না। চে-র চরিত্র নানা গুণে ভূষিত। সর্বাধিক মারাত্মক ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ চে করেছে চিরকাল। সে যুদ্ধ করেছে নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য। দেশের গণ্ডী, ধর্মের গণ্ডী, সম্প্রদায়ের গণ্ডী বর্ণের গণ্ডী চে-কে আটকে রাখতে পারেনি। সমগ্র বিশ্বের চিন্তা করেছে চে। ত্যাগী, কর্মী, ব্যক্তিস্বার্থহীন, সহকর্মীদের প্রতি সমভাবাপন্ন, শত্রুর প্রতি ক্ষেত্রে বিশেষ উদার অথচ উদাসীন এই মানুষটিকে ছোট করে দেখ না এগুলিয়ের।

এগুলিয়ের বাধা দিয়ে বলল, তুমি এই গোরিলাদের সমর্থন করতে চাও?

না। তোমার মন্তব্য ঠিক নয়। তা বলে আমি কি শ্রদ্ধার পাত্রকে শ্রদ্ধা করব না? আমার সঙ্গে বিরোধ আছে বলেই সে ছোট অথবা ঘৃণ্য—এ কথা মনে করা অন্যায়। চে হল ইতিহাসের

সৃষ্টি। তাকে বন্দী করেছি এটা গৌরবের কিন্তু তাতে তার মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়নি এগুলিয়ের। সকল গুণের সমাহারে যে মানুষের সৃষ্টি, তাকে মহামানব বললেও কম বলা হয়। চে যে আদর্শের সৃষ্টি করেছে, সে আদর্শ আর ক'জন সৃষ্টি করবে? চে অমর তার আদর্শে।

প্রাদো খুশী হল না কর্ণেলের কথায়। বলল, তোমার ইচ্ছা চে-কে মুক্ত করা হোক।

না, তার বিচার হবে। দেশের আইনকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। সেই আইনের দ্বারে তাকে নিয়ে যেতে চাই, যাতে সে তার বক্তব্য পেশ করতে পারে।

তাতে বলিভিয়ার ক্ষতি। চে-কে জীবিত থাকতে দেবার অর্থ দেশের সর্বনাশ ডেকে আনা।

আমি তোমাদের কথা সমর্থন করতে পারছি না ক্যাপটেন প্রাদো। চে-র ব্যক্তিত্ব, নৈতিক উৎকর্ষতা, দূরদর্শিতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, সংস্কৃতিজ্ঞান ও মননশীলতা সবার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। তার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি অশোভন মন্তব্য করে তাকে ছোট করা যাবে না প্রাদো এবং তাকে উচিত মর্য্যাদা দিলেই আমাদের গৌরব বৃদ্ধি হবে। তোমরা ভেবে দেখ। তাকে শত্রু বলেই আমরা জেনেছি কিন্তু তার মধ্যে যে মানবিকতাবোধ, যে দরদ আমরা দেখেছি এবং আমাদের যে সব সৈন্য তার হাতে বন্দী হয়েও মুক্তি পেয়ে এসে বলেছে তা অস্বীকার করতে পারি কি? তোমরা আবার ভাব। আজকের এই বৈঠকে তোমাদের মতের সমর্থন বেশি পাবে। আমার মত তোমরা অগ্রাহ্য করতে পার কিন্তু সব কিছু করার আগে আরও কয়েকবার ভেবে দেখ।

আমরা তার ন্যাপস্যাক থেকে অনেক দলিলপত্র পেয়েছি, তা থেকে প্রমাণ হয়েছে তার অপরাধ।

বলিভিয়ান হিসেবে, বিশেষ করে বর্তমান সরকারের নীতি

হিসেবে তাকে অপরাধী বলতে আমার দ্বিধা নেই, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমরা নিষ্ঠুর হব, বন্দীকে হত্যা করে পশুত্বকে প্রাধান্য দেব। আমরা তো অর্থের দাস। আমরা যা ভাবি তা করতে পারি না। কিন্তু চে যা ভেবেছে তা হাতে কলমে করে তার চিন্তার ও আদর্শের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে। এমন মানুষটাকে বিশেষ করে নিরস্ত্র বন্দী অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড দেবার আমি পক্ষপাতী নই।

কর্ণলে অসম্মত হলেও এই আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত রোধ করতে প্রাদো, এগুলিয়ের এবং গোরিলাযুদ্ধে পারদর্শী নন-কমিশনড অফিসাররা চে-কে মৃত্যুদণ্ড দেবার প্রস্তাব সমর্থন করল।

খবর গেল লা-পাজে।

সেখানে মন্ত্রণাসভা বসল।

প্রেসিডেন্ট বারিয়েনতোস, জেনারেল ওভানদো ও অন্যান্য সামরিক অফিসাররা বসল চে-র ভাগ্য নির্ধারণ করতে।

বারিয়েনতোস প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারেনি। অবশেষে যখন নানা প্রমাণ দিয়ে অফিসাররা বলল, সত্যিই চে বন্দী হয়েছে, তখন বিশ্বাস করল।

কিন্তু !

অনেক 'কিন্তু' হাজির হয়েছে সবার সামনে।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, রেজি দ্যবরের গ্রেপ্তার ও মামলা নিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন চলছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে এই একই কারণে।

ওভানদো মাথা নেড়ে বলল, তোমার কথা ঠিক মঁ প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমাদের এটা ঘরোয়া ব্যাপার। কাউকে রাষ্ট্রদ্রোহ অথবা গুপ্তচর বৃত্তির জন্য বিচার করলে সেটা তো আমাদের অপরাধ নয়।

কিন্তু দ্যবরের বিরুদ্ধে এমন কোন প্রমাণ নেই। আমাদের

নির্ভর করতে হচ্ছে মার্কিন গোয়েন্দাদের রিপোর্টের ওপর। সেজন্য আমাদের অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছে।

মার্কিন গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য আমরা সাক্ষীও তৈরী করছি।

বারিয়েনতোস বলল, তোমরা ফৌজী লোক, তোমরা কাজ করেই খালাস। কিন্তু পৃথিবীর সামনে আমাকে বক্তব্য রাখতে হয়, তা তো জানো। অসুবিধা আমাদের অনেক বেশি। আবার যখন চে-র বিচার আরম্ভ হবে তখন চারিদিক থেকে হৈ-হুল্লোড় আরম্ভ হবে। চে তো সামান্য লোক নয়। চে কিউবার মুক্তি যোদ্ধাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর। কিউবার প্রাক্তন কৃষি ও অর্থমন্ত্রী, রাষ্ট্রসংঘে কিউবার প্রাক্তন প্রতিনিধি—তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করালে অনেক হাঙ্গামা। কিউবা তথা তার দেশের সরকার আরজেনটিনার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেবেই।

ওভানদো গম্ভীরভাবে বলল, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হোক।

বলিভিয়ার আইনে মৃত্যুদণ্ড নেই। পার্লামেন্ট থেকে মৃত্যুদণ্ড পাশ করানো সম্ভব নয়।

মৃত্যুদণ্ড নয়। তাকে গুলি করে মারতে নির্দেশ দিতে চাই।

কিন্তু আমরা তো বেতারে ঘোষণা করেছি, আহত অবস্থায় চে ধৃত হয়েছে।

এবার সেই সংবাদের সঙ্গে জুড়ে দেব, চে আহত অবস্থায় মারা গেছে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আনার পথেই তার মৃত্যু হয়েছে। এর জন্য কাউকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কিন্তু আইন অনুসারে তার দেহকে পোস্ট মর্টমে পাঠাতে হবে। ডাক্তাররা জানতে পারবে, তারা প্রকাশ করে দেবে।

তাদের মুখ বন্ধ করতে হবে।

সম্ভব নয়। ডাক্তার সত্য রিপোর্ট লিখবেই।

যে ডাক্তার সত্য রিপোর্ট লিখবে সে ডাক্তারকে আততায়ীর

হাতে মরতে হবে, আর সেই কাগজখানাকে আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হবে।

তাতেই কি শেষ হবে জেনারেল? আমি একা এই দায়িত্ব নিতে পারছি না। তোমাদের সাহায্য বিনা কিছুই করতে পারব না।

তা হলে তুমি চুপ করে থাক। আমরা গোপন নির্দেশ পাঠাচ্ছি।

বিদেশী সাংবাদিক রয়েছে এদেশে। তারা টের পাবেই পাবে।

সন্দেহজনক সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করব। এ কাজে সাহায্য করবে সিয়ার এজেন্টরা।

বারিয়েনতোস কোন নির্দিষ্ট মত দিতে না পারলেও চে-র মৃত্যু সেও মনে মনে চায়। চে-কে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে না পারলে বলিভিয়ায় তার শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে যে কোন সময়ে।

হিগুয়েরায় জমায়েত হয়েছে নানা দেশের সাংবাদিক। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরাও এসেছে। চে-র নিজ হাতে লেখা ডায়েরী পাওয়া গেছে। সে সংবাদ তারা শুনেছে। তারা চেষ্টা করছে এই ডায়েরীর ফটো তুলে নেবার। সরকার পক্ষ কিছুতেই তা দিতে রাজি নয়। শোনা যাচ্ছে, মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের সদর দপ্তরে তা পাঠানো হবে।

লা-পাজ থেকে নির্দেশ এসেছে ইতিমধ্যেই।

সৈন্য ব্যারাকে বেশ তৎপরতা লক্ষ্য করা গেল।

কোন লোককেই হিগুয়েরার সেই বিদ্যালয়ের পাঁচ শত গজের মধ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। একমাত্র সামরিক বিভাগের কয়েকজন বিশিষ্ট অফিসার ভিন্ন কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না বিদ্যালয়ের আশেপাশে।

প্রাদো ডেকে পাঠাল য়্যান্টি-গোরিলা ট্রেনিংপ্রাপ্ত মারিও তেরানকে।

লা-পাজ থেকে নির্দেশ এসেছে বন্দী দুজনকে গুলি করে হত্যা করার।

তেরানের চোখ দুটো জ্বলে উঠল।

আমার বিশ্বাস এ কাজের উপযুক্ত তুমি। ওদের হত্যা করার দায়িত্ব তোমাকে দিতে চাই।

তেরান ইতস্তত করে বলল, আমি সৈনিক, যুদ্ধ করতে পারি। নিরস্ত্র বন্দীকে হত্যা করা উচিত হবে কি ?

প্রাদো ঘাবড়ে গেল।

পাশেই যে সেনট্রি ছিল তাকে ডেকে ফিসফিস করে কি যেন বলল। সেনট্রি তেরানকে ডেকে নিয়ে গেল বাইরে। ঘণ্টাখানেক পরে তেরান ফিরে এল সেনট্রিকে নিয়ে।

প্রাদো জিজ্ঞেস করল, পারবে তেরান ?

উগ্র মদের নেশায় তেরান তখন আত্মবিস্মৃত।

বলল, ঠিক পারব স্যার। বন্দুকটা দিতে বলুন। আমি পারব। কত শালা ডাকাতকে মেরেছি। আর এ তো মাছি। একটা ছুরি দিন, তাতেই হবে।

প্রাদোর ইংগিতে সেনট্রি মেসিনগান তুলে দিল তেরানের হাতে।

সব চুপচাপ।

হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

টলতে টলতে বেরিয়ে এল তেরান। প্রাদোর সামনে এসে বলল, এক শালাকে শেষ করেছি। শালা নাকি বলিভিয়ান। শালা ছোট্ট ডাকাত। আরেক শালাকেও দেব সাবরে। আর দু পাত্তর দাও হে সেনট্রি মিউকাস।

আরেকটা শ্যাম্পেনের বোতল এনে দিল সেনট্রি। ঢক্‌ঢক্‌ করে অর্ধেকটা গলায় ঢেলে দিয়ে মেসিনগান নিয়ে তেরান এগিয়ে গেল বিদ্যালয়ের দিকে। ঘরে ঢুকে দেখল, চেয়ারে আষ্টেপিষ্টে বাঁধা রয়েছে চে গুয়েভারা।

তেরান জিজ্ঞেস করল, তোর নাম কি?

আমি ডাক্তার আরনেসতো চে গুয়েভারা।

তুমি শালা বদমাশের রাজা। দেব খতম করে।

চে হেসে বলল, তা তুমি পার কিন্তু আমি বন্দী, নিরস্ত্র, আহত। আমাকে তুমি হত্যা করতে পারবে কি? তুমি তো সৈনিক। তোমার ধর্ম লড়াই করা, জহ্লাদের কাজ করা তো তোমার ধর্ম নয়।

তেরান টলতে টলতে বলল, তাই তো! তুই ঠিকই বলেছিস। আচ্ছা; তোকে একটা বন্দুক এনে দিচ্ছি। তুইও গুলি মার, আমিও মারব।

তাই কর।

তেরান ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মারতে পারল না চে-কে।

প্রাদো তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, কি হল তেরান?

স্যার, ওই মরা মানুষটাকে আমি মারতে পারব না।

তুমি সৈনিক। আদেশ পালন তোমার ধর্ম।

আমি লড়াই করি, জবাই করি না।

প্রাদো সেনট্রিকে ডেকে আরেক বোতল শ্যাম্পেন আনতে বলল। বোতল তুলে দিল তেরানের হাতে। এবার বোতল খালি করে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তেরান সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

যাও তেরান, তোমার কাজ করে এস। আমাদের দুষমনকে খতম করা চাই।

তেরান মন্ত্রমুগ্ধের মত মেসিনগান হাতে করে ছুটে যাচ্ছিল।

সামনে দেখা হল কর্ণেল শেলিজ আর মেজর এয়োরায়ার সঙ্গে। সেলাম দিয়ে তেরান বলল, এবার হুকুম তামিল করব স্যার, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার ডলার ইনাম চাই।

কর্ণলে শেলিজ মুখ ঘুরিয়ে রইল। মেজর এয়োরায়ার হেসে বলল, ঠিক পাবে।

দাঁড়িয়ে রইল দুজনে মাঠের মধ্যে।

তেরান আবার প্রবেশ করল বিদ্যালয় ঘরে।

তারপরই চে-র কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপুলতা বেন—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

সঙ্গে সঙ্গে আট দশটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

বাইরে অনেক সাংবাদিক তখন দাঁড়িয়ে। তারা বুঝতে পারল না কি হয়েছে। দু দফায় বন্দুকের আওয়াজ শুধু শুনতে পেল তারা। দূর থেকে দেখতে পেল একজন সৈনিক মেসিনগান হাতে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে বিদ্যালয় গৃহ থেকে।

তারপর ?

তারপর লা-পাজ বেতারের ঘোষণা শুনতে পেল সারা বিশ্বের মানুষ।

ভীষণভাবে আহত অবস্থায় চে গুয়েভারাকে হিগুয়েরার স্কুলে আনা হয়েছিল। অতিরিক্ত রক্তপাতে তিনি মারা গেছেন। চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা করার সময় পায়নি। চে গুয়েভারার মৃত-দেহের প্রতি পূর্ণ সামরিক মর্যাদা দেখিয়ে সমাহিত করা হবে।

কিন্তু !

আবার কিন্তু। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা এই সামান্য অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি অত সহজে গ্রহণ করতে রাজি হল না। তারা ছুটল ভালে গ্রাঁদে শহরে। ছোট্ট এই শহরে তখন ভীড়

জমেছে চে-কে দেখতে। হেলিকেপটার করে চে-র মৃতদেহ আনা হয়েছে হিগুয়েরা থেকে ভালে গ্রাঁদেতে। সিনর দে মালতা হাসপাতালে মৃতদেহ আনা হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।

ডাক্তারদের অভিমত শুনে অবাক হয়ে গেল সাংবাদিকরা।

পাঁচ ঘণ্টারও বেশি আগে চে মারা গেছে।

তা হলে মৃত্যুস্থান হিগুয়েরা।

এখানে চল্লিশ ঘন্টা বন্দী অবস্থায় ছিল চে।

আর কি ?

ডাক্তার আব্রাহাম আর ডাক্তার মারতিলজ বলল, চে-র বুকে নয়টি মেসিনগানের গুলি লেগেছে। দুটো ফুসফুস ঝাঁঝরা হয়ে গেছে গুলিতে।

কোন সময়েই যুদ্ধে একটা নির্দিষ্টস্থানে এতগুলো গুলি লাগে না, অথবা লাগতে পারে না।

আর কি ?

চে-র উরুতে যে গুলি লেগেছিল, সেই গুলি লাগার সময় থেকে প্রায় দুদিন পরে গুলিগুলো লেগেছে। পাঁচ ছ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে।

তা হলে মৃত্যু হয়েছে হিগুয়েরাতে এবং বন্দী অবস্থায় মেসিন-গানের গুলিতে। মাতাল তেরান কটা গুলির প্রয়োজন বুঝতে না পেরেই বেপরোয়া অগুনতি গুলি মেরেছিল চে-র বুকে এবং অতি নিকট থেকে।

সাংবাদিকরা বুঝল, চে আহত হয়ে মরেনি। বন্দী অবস্থায় তাকে গুলি করে হত্যা করেছে বারিয়েনতোসের জহ্লাদ।

সাংবাদিকরাও দেখেছে চে-র মৃতদেহ। তারাও সমর্থন করল ডাক্তারের যুক্তি ও তথ্য।

চে বিদায় নিয়েছে চিরতরে।

হত্যা, গুপ্তহত্যা, নিষ্ঠুর হত্যা ভিন্ন আর কিছুই নয়।

আর কেউ গম্ভীর গলায় বলবে না, আমি চে গুয়েভারা। সব নীরব হয়ে গেছে।

কিউবার হাভানা শহরের উপকণ্ঠে একটি সামান্য গৃহের ছবি হয়ে উঠেছিল সর্বাধিক করুণ।

রেডিও কিউবা থেকে অতি দুঃখের সঙ্গে ঘোষণা করা হল, ডাক্তার মেজর আরনেসতো চে গুয়েভারার মৃত্যু সংবাদ। সে রাতে শুধু শোনা গেল শোক-সঙ্গীত। চে-র জীবন-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করল বড় বড় নেতারা। সবাই দুঃখ প্রকাশ করল, ঘৃণা জানাল এই নৃশংস হত্যার জন্য, শোক জানাল চে পরিবারকে।

আর সেই গৃহকোণে একটি মহিয়সী নারী সন্তানদের বুকের কাছে টেনে নিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সেই নারীর সারা জীবনের সাধনা বুঝি শেষ হয়ে গেল। দাসী দেখল গৃহকর্ত্রী অঝোরে কাঁদছে, তাকে সান্ত্বনা দেবার মত কেউ নেই।

ধীরে ধীরে দরজা খুলে প্রবেশ করল কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ডাকল, ম্যাদাম য়্যালাইদা।

কে? ওঃ, চিনেছি। সিনর ফিদেল। বলতে বলতে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল য়্যালাইদা।

তোমার দুঃখ সমুদ্রের মত গভীর। সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই আমার। তবে কিউবা কোনদিনই অকৃতজ্ঞ হবে না। চে গুয়েভারার কথা কোনদিন ভুলবে না। তোমার মঙ্গল হোক।

য়্যালাইদা আরও একবার মুখ তুলে দাঁড়িয়ে বলল, আমার নিজস্ব কিছু আর রইল না ফিদেল। আমার এই ক্ষতি পূরণের মত কি আর পেতে পারি বল। একমাত্র আমার সঙ্গী চোখের জল। আর বেঁচে থাকতে হবে এই সন্তানদের মুখের দিকে চেয়ে। আমার

সান্ত্বনা আমার স্বামী তার শেষ রক্তবিন্দু দান করে গেছে মানুষের মুক্তি সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। যতদিন পৃথিবীতে একজন বপ্লবীও বেঁচে থাকবে, তার মাঝেই বেঁচে রইবে আমার স্বামী চে গুয়েভারার স্মৃতি। তাদের চোখে থাকবে চে-র দৃষ্টি, মনে থাকবে চে-র মত আত্মবিশ্বাস, দেহে থাকবে চে-র মত কর্মক্ষমতা। সেও বলবে, আমি আরেকটি চে গুয়েভারা। চে গুয়েভারার মৃত্যু নেই।

